স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর

শ্রীতারাশংকর ভট্টাচার্য

ভূতপূর্ব রাজবন্দী গ্রন্থাগার
২ নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-১২

প্রকাশ করেছেন:
শ্রীসুমিতা দত্ত, বি. এস্. সি.
২, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
শ্রীপ্রভাতকুমার কর্মকার
২।৩ দে পাড়া লেন,
শিবপুর, হাওড়া।

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৭৩।

ছেপেছেন:
রুবী প্রিন্টিং হাউস
৪০/১বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-১২

গোমো, বালেশ্বর হয়ে পুরী, পূর্বে সোজা কলকাতা ও পশ্চিমে ঝাড়গ্রাম হয়ে জামসেদপুরের দিকে। এই পথগুলিতে নিয়মিত বহু-ট্রেন ও মালপত্রাদি যাতায়াত করে। জেলার মধ্যে প্রায় সকল স্থানেই বহু বাস সার্ভিস আছে। উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড, বোম্বাই রোড, রাণীগঞ্জ মেদিনীপুর (অহল্যাবাঈ) রোড প্রভৃতি বড় বড় সড়কগুলি বাইরের অঞ্চলের সঙ্গে জেলার যোগাযোগ রক্ষার প্রধান সহায়ক। এ ছাড়া বহু বিস্তৃত কাঁচা বা পাকা রাস্তা দিয়া জেলার সর্বত্র যাওয়া যায়। জলপথে যাতায়াতের সুবিধাও আছে। আর্মেনিয়ান ঘাট থেকে গেওঁখালি, তমলুক ও কোলাঘাট দিয়ে ঘাটাল পর্যন্ত স্টীমার যাতায়াত করে ও খালগুলিতে মালবোঝাই নৌকা চলে।

কৃষিপ্রধান এই জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান। এছাড়া পাট, আখ, তামাক, তিল, যব, সরিষা, ছোলা ও মুগ প্রভৃতিও বেশ উৎপন্ন হয়, পানও বেশ জন্মে ও জেলার বাইরে রপ্তানী হয়। জঙ্গলগুলিতে শাল, পিয়াশাল, অর্জুন প্রভৃতি কাঠ ও প্রচুর জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায়।

বস্ত্র ও ধাতুশিল্পে এক সময় এই জেলা বিশেষ বিখ্যাত ছিল। এখন সে গৌরব অনেকাংশে ম্লান হলেও আনন্দপুর, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, কেশিয়াড়ী, অমর্ষি প্রভৃতি স্থানের বস্ত্র শিল্পের এখনো বেশ নাম আছে। রাধামনী ও পাঁশকুড়ায় তৈরী কাপড় এখনো জেলার বাইরে রপ্তানী হয়। চন্দনপুর, রামজীবনপুর, খড়ার প্রভৃতি স্থানে প্রচুর কাঁসা পিতলের বাসনপত্র তৈরী হয়। কাঁথি, রঘুনাথবাড়ী ও সবঙ্গে ভালো মছলন্দ ও মাদুর তৈরী হয়। মেদিনীপুর শহরের সোনারূপার গয়না ও ঘাটালের মাটির বাসন বিখ্যাত। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বাঁশের ঝুড়ি, পাখা ও দাঁতনের তৈরী ঘাঁতির এখনো খ্যাতি আছে। জুখিয়া ও কাকরার খদ্দর শিল্পও উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষাদীক্ষায়ও এই জেলা বেশ অগ্রসর। প্রায় প্রতি গ্রামেই এক বা একাধিক সরকারী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং কয়েকটি গ্রামের মাঝে মাঝে মাধ্যমিক (নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ ইংরাজী) এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ডিগ্রী কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, শিল্প ও কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্রও অনেকগুলি আছে। খড়্গপুরের 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজী' সারা ভারতে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে।

সারা জেলায় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে। জেলা সদরে

হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল এবং থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সাধারণের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়। ডিগ্রী স্বাস্থ্যনিবাস পশ্চিমবঙ্গের যক্ষ্মা হাসপাতাল-গুলির মধ্যে অন্যতম। দীঘা বিখ্যাত স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

এই জেলার মহকুমা পাঁচটি—মেদিনীপুর (সদর), কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম। এগুলিতে একজন করে মহকুমা শাসক শাসন কার্য পরিচালনা করেন। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সমগ্র জেলার শাসন ভার ন্যস্ত।

'জেলা মেদিনীপুর
উষর, ধূসর, ধূলী কাঁকর
ধান ফলে প্রচুর
জেলা মেদিনীপুর'
—জেলা প্রশস্তি লোকসংগীত।

উৎসর্গ

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান"

মেদিনীপুরের সেই অমর শহীদবৃন্দের পুণ্য স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁদেরই অক্ষয় কীর্তিকাহিনী…আজকের সংগ্রামী জনসাধারণের হাতে দিলাম।

শ্রদ্ধাবনত
লেখক।

। এই পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত ।

[এক]

আপনার রচনাটির প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করেছি। রচনাটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ। বহু অপরিজ্ঞাত ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া গেল আপনার রচনা মারফৎ। মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়র প্রণয়নের কাজে আপনার রচনাটি অবশ্যই প্রভূত উপকারে আসবে। পত্রিকার ('স্বরাজ ও সংগঠন') সম্পাদক মহাশয়কেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন। নমস্কারান্তে,

নিবেদক
প্রণবরঞ্জন রায়
রিসার্চ অফিসার
পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়র্স।

[দুই]

'স্বরাজ ও সংগঠন' পত্রিকায় 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' প্রবন্ধ (ধারাবাহিক প্রকাশিত) পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। আমার অনুরোধ এই যে, উহা বই আকারে ছাপাইবার চেষ্টা করুন। প্রতি অধ্যায়ের শেষে প্রমাণপঞ্জী থাকিলে উহা একখানি প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস হইবে।

৪।১২।৬৫ অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
'চন্দ্রালয়' ইন্দা, খড়্গপুর।

[তিন]

শ্রদ্ধেয় শ্রীতারাশংকর ভট্টাচার্য মহাশয়ের ধারাবাহিক নিবন্ধটি পড়ে যথেষ্ট গৌরব অনুভব করছি। যখন দেশের সাধারণ মানুষ নানারূপ সমস্যায় জর্জরিত, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে বিভ্রান্ত, তখন মাতৃভূমি তথা জন্মভূমির ঐতিহ্য ইতিহাস নিয়ে সাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার যথেষ্ট মূল্য আছে বৈকি, এর জন্য লেখক যথার্থই ধন্যবাদার্হ।

শ্রীলক্ষ্মীপদ নন্দী
বিবিগঞ্জ, মেদিনীপুর
'স্বরাজ ও সংগঠন' পত্রিকা, ২য় পৃষ্ঠা, ২৮।১।৬৬

[চার]

'স্বরাজ ও সংগঠনে' আপনার 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' পড়ে খুশী হয়েছি। আশা করি, আপনি আমাদের 'নীহারে' মাঝে মাঝে কিছু লেখা প্রকাশের জন্য পাঠাবেন।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ জানা
সম্পাদক
'নীহার' পত্রিকা, কাঁথি।
২০।৮।৬৫

[পাঁচ]

…লেখক তারাশংকর বাবু প্রাচীন যুগ থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত এই জেলার এক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখেছেন।…লেখক বহু আয়াস স্বীকার করে নানাস্থান থেকে উপাদান সংগ্রহ পূর্বক এই ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। আশা করি, ইতিহাসটি পাঠকদের মোটামুটি ভালোই লাগবে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেন
সম্পাদক
'স্বরাজ ও সংগঠন' পত্রিকা।
আলোককেন্দ্র মেদিনীপুর
(২১শে মে, ১৯৬৫ সংখ্যা)

* * * * *

লেখকের কথা

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস এবং শহীদদের অমর জীবনকথা যতই শুনেছি বা পড়েছি ততই কান্নায় আমার দু'চোখ ভরে এসেছে। যে সব মহাত্মা রাজশক্তির হাতে পাশবিক নির্যাতন আর পাইকারী হারে জেল, দ্বীপান্তর ও ফাঁসির পরোয়ানা লাভ করলেন আজ তাঁদের জন্য কান্না ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অত্যাচারী বিদেশী শাসকদের শত ক্ষতি সাধনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে কয়টা উজ্জ্বল দীপ তারা নিভিয়ে দিয়ে গেছে, যে কয়টা মহীরুহের অঙ্কুর তারা নষ্ট করে দিয়ে গেছে, তা আর কোন দিনই পূরণ হবে না। যারা সহজাত সংগঠনী শক্তি ও দেশ আর দেশবাসীর জন্য অফুরন্ত দরদ নিয়েই জন্মেছিলেন, শত অত্যাচার ও লাঞ্ছনার বিষ নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করে যাঁরা দেশবাসীদের জন্য এনে দিয়েছেন স্বাধীনতার অমৃত, তাঁরা আজ কোথায়—কোন স্বর্গলোকে···!

সেদিন এক প্রখ্যাত বিপ্লবীর সামনে মুগ্ধ হয়ে বসেছিলাম, হাতে নোট নেবার খাতা, বোকার মত প্রশ্ন করেছিলাম, "আচ্ছা, আপনারা কি কি করতেন?" হেসে উঠলেন তিনি; সস্নেহে বললেন, "শোনো বাবা···" মুগ্ধ বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকি। "···আমরা কি না করেছি তা-ই বলো? তখন যদি কেউ বলত সাঁতরে বঙ্গোপসাগর পার হতে হবে—তাহ'লে আমরা তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়তাম···।" এমনি ছিল তাদের মনের জোর, লক্ষ্যে পৌঁছাবার এমনি দৃঢ় সংকল্প। তাই তাঁরা দেশের প্রত্যেকটি তরুণ হৃদয়ে জাগাতে পেরেছিলেন এমন উন্মাদনা আর এমনই সুমহান আদর্শের অনুপ্রেরণা।

বিদেশী লেখকদের লেখনীপ্রসূত, শাসকদের অনুগ্রহপুষ্ট ও অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত পক্ষপাতদুষ্ট ও বিকৃত ইতিহাস পাঠ করে আমরা বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করি, কিন্তু আমাদের কাছেই আমাদের ইতিহাসের যে উপাদান দিনের পর দিন নীরবে নিভৃতে কাঁদছে তার কোন খোঁজই আমরা রাখি না। তাই আজ অনেক স্বদেশীয় সত্য ইতিহাস লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়। বঙ্কিমচন্দ্র তো স্পষ্টই বলেছেন আমাদের প্রকৃত ইতিহাস একটিও নাই। অপর একজন প্রখ্যাত বিদেশী ঐতিহাসিকও একথা স্বীকার করেছেন এদেশের ইতিহাস

প্রকৃতপক্ষে বিজেতৃগণের শাসনের কাহিনী—এদেশের মানুষদের কথা তাতে নেই বললেই চলে।

এর প্রধান কারণ সম্বন্ধে এ কথাই সম্ভবতঃ বলা চলে যে, ইতিহাসের নিরপেক্ষ সমালোচনা বা তথ্যাদি সংগ্রহ করার ব্যাপারে আমাদের আছে অনেক অসুবিধা ও অনেকাংশে উদাসীনতা। বিশেষ করে পরাধীন দেশের বৈপ্লবিক ইতিহাসের ঘটনাবলী শাসকশ্রেণীর ভয়ে এতো গোপনে সংঘটিত হয়, তাদের প্রস্তুতি এতো অন্তর্মুখী যে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যাদি বিশেষ পাওয়া যেতে পারে না; কেননা ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ বিচারবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির ভয়ে ভীত হয়ে পড়তে বাধ্য। ফলে ইতিহাসের ঘটনাস্রোত ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হতে হতে কোন রকমে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র রক্ষা করবার চেষ্টা করে। আর একটি অসুবিধা বোধ হয় ঐতিহাসিক তথ্যাদি সমন্বিত দলিল, দস্তাবেজ, কাগজপত্র বা নিদর্শনাদি সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত বা চেষ্টার অভাব। এ প্রসঙ্গে আর একজন বিদেশী ঐতিহাসিকের আক্ষেপের কথা বলি, "The office of the Indian Records being unfortunately in damp situation, the ink is daily fading and the papers mouldering into dust."

(Preface to the Stewart's 'History of Bengal').

এর চেয়ে দুঃখ আর লজ্জার বিষয় আমাদের আর কি থাকতে পারে।

স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন লেখার মধ্যে অসামঞ্জস্য, সংবাদের অসম্পূর্ণতা, সত্যের বিকৃতিকরণ প্রভৃতি নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবুও প্রাচীনকালের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ ধারাবাহিক ভাবেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর নিরপেক্ষ আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ একটি তথ্যলিপি চিত্রিত করা আমার মত লেখকের দ্বারা সম্ভব নয়—সাধ্যায়ত্তও তো নয়ই—সবিনয়ে তা মেনে নিচ্ছি আগেই।

যে সমস্ত পূর্বসূরীয়ের লেখা থেকে সাহায্য পেয়েছি, সেই সব লেখা থেকে তথ্যাদি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছেন যে সব স্বত্বাধিকারী এবং যাঁরা নানা ভাবে আমায় সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম; আর যাদের উপহাস, নিন্দা আমায় এ যাবৎ উৎসাহিত করে এসেছে সবিনয়ে তাদের জানালাম আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আরো

কৃতজ্ঞতা জানাই 'স্বরাজ ও সংগঠন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়কে, যাঁর প্রচেষ্টায় 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' প্রথম লোকচক্ষুর সামনে পৌঁছেছে—তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। চন্দ্রকোণা নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধারমণ সিংহ মহাশয় তাঁর সংগ্রহ আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার ঋণকে ছোট করতে চাই না। পুস্তকাকারে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন ভূতপূর্ব রাজবন্দী গ্রন্থাগারেব সুমিতা দত্ত। পুস্তকটি প্রকাশের জন্য তিনি যে শ্রম, উদ্যম ও অর্থ ব্যয় করেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগের অধ্যাপক মাননীয় ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক আমার এই কর্মযজ্ঞের মঙ্গলাচরণ করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অক্ষয় স্বর্গলোক থেকে অমর শহীদদের আশীর্বাণী তাঁর উপর নিরন্তর বর্ষিত হোক।

এই পুস্তক মুদ্রণে রুবী প্রিন্টিং হাউসের অবদানও কম নহে। শিল্পী শ্রীপ্রভাতকুমার কর্মকার এই বই-এর প্রচ্ছদপট এঁকে তাঁর শিল্পীমনের সার্থক পরিচয় দিয়েছেন।

সর্বশেষে পাঠকপাঠিকাদের নিকট অনুরোধ, কোন অসংগতি বা ভুলপ্রমাদ দৃষ্ট হলে কেউ যেন নিরপেক্ষ মতামত জানাতে দ্বিধাবোধ না করেন। আমার এ প্রচেষ্টা দেখে বা পড়ে যদি একটি লোকের মনেও স্বদেশের সত্য ইতিহাস জানবার বা অমর শহীদদের জীবনকথা শোনবার আগ্রহ জাগে তাহ'লে সেটাই হবে আমার প্রত্যাশিত সবচেয়ে বড় পুরস্কার ও তৃপ্তি।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীবর্ষ
ফতেসিংপুর, আমলাগোড়া
মেদিনীপুর।

শ্রীতারাশংকর ভট্টাচার্য

॥ মঙ্গলাচরণ ॥

আমাদের দেশ বার বার বহু বহিরাগত গোষ্ঠী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু কালক্রমে সেই গোষ্ঠীগুলি বেগবান ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে হার মানে। তাই বিজেতা গোষ্ঠীগুলি ভারতভূমিতে বিজিত হিসাবে পরিগণিত হয়। সে সব গোষ্ঠী সম্পর্কে সাধারণ ভারতবাসীর আর এমন কোন অনুযোগ নেই। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্য পুঁজিবাদের সংগে অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক শিল্পজ্ঞান, ভারতের সনাতন অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক বুনিয়াদের ভিতকে যথেষ্ট নড়বড়ে করে দেয়। কেননা আমাদের সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থা, দর্শন ও সংস্কৃত চর্চা তদানীন্তন ব্যবহারিক জীবনকে উন্নত কবার প্রয়োজনীয় খোরাক দিতে পারেনি। এর ফলে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইংরেজ-অনুপ্রবেশ ভারত ভূখণ্ডে তাড়াতাড়ি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির রক্তচোষা শোষণ ও সংশ্লেষ, অচলায়তন গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থায় ও দিন-চর্যায় প্রচণ্ড আঘাত হানে। ফলে কৃষি ও গ্রামীন শিল্পকেন্দ্রিক নিরুপদ্রব সমাজে ফাটল ধরে—নিরীহ মানুষ নানা ভাবে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। যা ভারতের নানা স্থানে নানা ভাবে রূপ নেয়। সর্বভারতীয় দেব-দেবীর তীর্থমূল্যে, বিভিন্ন পূজা-পদ্ধতি বা পার্বণে, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ প্রভাবান্বিত রীতি-নীতি বা সামাজিক অনুশাসনে সর্বভারতীয় জীবন ছন্দিত হলেও জাতীয়তাবোধে সম্যক উন্মেষ সম্ভব হয়নি। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে নানা কারণে বৃহত্তর বঙ্গে জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধতে থাকে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের সাথে বৃটিশ পুঁজিবাদ ও শোষণ নতুন ভাবে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি স্থাপনা করেছিল। ইংরেজ কোম্পানি মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও বর্ধমান জেলা যৌতুক হিসাবে পেয়ে এর জনজীবনে নানা ভাবে শোষণের পথ প্রসারিত করতে থাকে। টাকার লোভে জমিদারী বণ্টন, সাধারণ মানুষের জন্মগত কৃষিজমির অধিকার বিলোপের মাধ্যমে মেদিনীপুর অঞ্চলে চুয়াড়, পাইক বা লায়েক হাঙ্গামা বা বিদ্রোহ বাঁধে; নিরীহ-শ্রমজীবী মানুষের মধ্য থেকে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে; মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায় হ'ল বৃটিশ ঔপনিবেশিকতা ও আমলাতন্ত্রের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমনি সব প্রতিবাদের ঘটনায় মুখর।

বিপ্লবের বহ্নিভূমি এই মেদিনীপুর। সারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের খতিয়ানে মেদিনীপুর বিরাট এক অংশ অধিকার করে বসে আছে। সুতরাং মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রকৃত পক্ষে শুধু বৃহত্তর বঙ্গের নয়, সারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। ইতিহাসের দীর্ঘপথ পরিক্রমায় কত বিচিত্র ঘটনারাজির রূপায়ণ হয়েছে তা বাস্তবিকই আশ্চর্যের। উপজাতি, কৃষক, মজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, জমিদার, ডাক্তার, শিক্ষক, আইনজীবী, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠী কত ভাবে পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কত অমূল্য-জীবন বিনষ্ট হয়েছ, কত মাতা তার সন্তান হারিয়ে, কত নারী সিঁথির সিন্দুর মুছে দিয়েছে, তার সম্যক বিবরণ সংগ্রহ অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবুও অতীতের আলো-ছায়া থেকে অনুজ-প্রতিম শ্রীতারাশংকর ভট্টাচার্য যা সংগ্রহ করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার দাবী রাখে। মানুষ তার অতীত ইতিহাসকে ভালবাসে, ভালবাসে তার ঐতিহ্যকে। কেননা মৃতকল্প জাতি বা সমাজ তার অতীত ইতিহাস থেকে জেগে ওঠার সঞ্জীবনী মন্ত্র পায়—যা বাঁচা বা চলার পথে নিত্য সহচর। দীর্ঘদিনেব বৃটিশ পরাধীনতার নাগপাশ কাটিয়ে আমাদের মানসিক দাসত্বের মুক্তি হয়েছে কিনা এবিষয় যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এখনও আমরা আমাদের দেশকে, এর মানুষকে এক কথায় আমাদের মৃন্ময়ী মাকে বাস্তবিকই কী আপন ভাবতে পেরেছি? পেরেছি কী দীর্ঘ পঁচিশ বছরের স্বাধীনতা লাভের পর বৈষম্যের ব্যবধানকে আরও সংকুচিত করে পরস্পরের পাশাপাশি দাঁড়াতে? পেরেছি কী আনন্দোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নকে রূপ দিতে? তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিদগ্ধ দেশবাসী আবার স্মৃতিগুঞ্জরিত অতীত ইতিহাসের কাহিনী জানতে চাইবে, জানতে চাইবে ব্যক্তি বা সমষ্টি মানুষের ত্যাগ ও দুঃখকষ্ট বরণের ঘটনাকে। শ্রীমান্ তারাশংকর ভট্টাচার্য তাঁর এই পুস্তকে সে সবের পরিবেশন করেছেন যার মাধ্যমে দেশ ও সমাজ বহু পরিমাণে উপকৃত হবে।

আমার ব্যক্তিজীবনেও একদা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অত্যাচার ও কারাগার বরণ কবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেদিন পাষাণকারার রুদ্ধদ্বারে আমি কত অসংখ্য বন্ধুকে অত্যন্ত আপনভাবে পেয়েছিলাম—জেনেছিলাম তাঁদের অসীম সাহসিকতা, উদ্দাম বীরত্ব। বর্তমানের এই গ্রন্থে এমনি অনেক মুক্তি-যোদ্ধার নাম হয়ত নেই—কিন্তু তাঁরা ইতিহাসের বিরাট পরিসরে অখণ্ডতাব

মাঝে অব্যয় মহাশক্তির প্রেরণা হিসেবে রয়েছেন। আশা করবো তাঁদের অনেকের সহযোগিতা পুস্তকের পরের সংস্করণকে আরও তথ্য-সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে।

শ্রীমান তারাশংকর ভট্টাচার্য মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা অঞ্চলের অধিবাসী। পেশায় শিক্ষক। তবুও এই পুস্তক প্রনয়ণে তিনি যে শ্রম ও নিষ্ঠা দেখিয়েছেন তা তথাকথিত ইতিহাসের ডিগ্রীধারী অনেক ছাত্র-ছাত্রীর কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে। বিশ্বমানবের কল্যাণ হোক। জয়জগৎ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বিজ্ঞান কলেজ
১০. ৭. ৭৩

প্রবোধকুমার ভৌমিক

জেলার সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর দ্বিতীয় বৃহত্তম। এর আয়তন ৫২৭৪ বর্গ মাইল। প্রায় ২১½° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩° উঃ অক্ষাংশ এবং প্রায় ৮৬½ পূর্ব থেকে কিঞ্চিদধিক ৮৮° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত এই জেলার বিস্তৃতি। তাই কলকাতার সময় থেকে মেদিনীপুরের স্থানীয় সময় ৪ মিঃ ৪ সেঃ কম, এবং ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম থেকে ১৯ মিঃ ২০ সেঃ বেশী।

এই জেলার উত্তরে বাঁকুড়া ও হুগলী জেলা, পূর্বে রূপনারায়ণ নদ, হুগলী নদী, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলা, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা এবং দক্ষিণে উড়িষ্যা ও বঙ্গোপসাগর। জেলার ভূ-প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ নয়। উত্তর পশ্চিমাংশ ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে ছোটনাগপুরের মালভূমির সঙ্গে মিশেছে। এই অঞ্চল পাহাড় ও বনজঙ্গলে পূর্ণ কঙ্করময় লালমাটি, আবহাওয়া শুষ্ক—শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই বেশী। দক্ষিণ-পূর্বাংশ নিম্ন সমতল ভূমি, কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী ও উর্বর—আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন নয়। দক্ষিণের সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলাঞ্চলের আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও মনোরম।

এই জেলার বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ। অধিবাসীদের অধিকাংশই হিন্দু। মুসলমান ও অন্যান্য জাতি শতকরা দশ ভাগের বেশী হয়ত হবে না। হিন্দু অধিবাসীদের অধিকাংশই আবার বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। জেলার সাধারণ ভাষা বাংলা। বিহার ও উড়িষ্যা সংলগ্ন স্থানগুলিতে একপ্রকার মিশ্র ভাষা ব্যবহৃত হয়। বহুসংখ্যক আদিবাসী নিজ নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করে।

কাঁসাই, শিলাই, সুবর্ণরেখা, রসুলপুর, কালীঘাই প্রভৃতি এই জেলার প্রধান নদনদী। বুড়িকোপা, পুরন্দর ও কুবাই প্রভৃতি বড় বড় খালগুলিও উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সেচের সুবিধার জন্য কয়েকটি কৃত্রিম খাল আছে যেমন, মেদিনীপুর খাল, হিজলী টাইডেল ক্যানাল, উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানাল ও বর্তমানের কংসাবতী (কাঁসাই) নদী প্রকল্পের ছোটবড় অনেকগুলি সেচখাল।

খড়্গপুর দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের একটি বড় জংশন—এই জেলার প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখান থেকে চারদিকে চারটি রেল লাইন গেছে বাঁকুড়া আদ্রা হয়ে

বিদ্যাসাগর

বীরেন্দ্রনাথ শাশমল
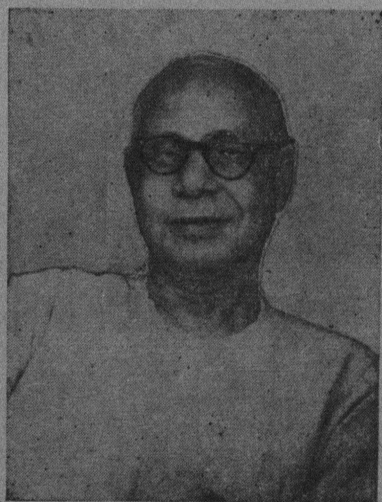
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ইতিহাস

প্রাচীনকালে এদেশের বিভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তৃত অঞ্চলের নাম ছিল সুহ্ম বা দক্ষিণরাঢ়। 'আচারাঙ্গসূত্র' নামক জৈনগ্রন্থেও বাংলাদেশের দু'টি নাম পাওয়া যায়, উত্তর-পূর্বাংশের নাম বজ্রভূমি, দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের নাম সুহ্মভূমি। তাম্রলিপ্ত ছিল সুহ্মভূমির রাজধানী। প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক জনপদগুলির অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্বন্ধে বিতর্কের শেষ নেই, তবে প্রাচীনকালের তাম্রলিপ্তই যে বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার তমলুক একথা এখন সর্বজন স্বীকৃত সত্য। পূর্বে এই নামে সীমানির্দিষ্ট কোন জেলা ছিল না; কাজেই প্রাচীন তাম্রলিপ্তের ইতিহাসই অনেকাংশে মেদিনীপুরের ইতিহাস।

তাম্রলিপ্তের প্রসিদ্ধি বহু প্রাচীনকালের। মহাভারতীয় যুগেও এই স্থান বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় তাম্রলিপ্তরাজ উপস্থিত ছিলেন। দিগ্বিজয় সময়ে ভীমসেন সুহ্ম-তাম্রলিপ্ত জয় করেছিলেন।

("সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য, চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তঞ্চরাজাণাং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ"—সভাপর্ব)।

বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে।

["...তাম্রলিপ্তিক কোশলকাবর্দ্ধমানাশ্চ।"—কূর্মবিভাগ, চতুর্দশ অধ্যায়]।

মহাভারতীয় যুগে মহারাজ কর্ণের অধীনে বর্তমানের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কতকাংশ নিয়ে এক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল অঙ্গদেশে। মেদিনীপুরের নিকটবর্তী কর্ণগড়ে ছিল এই রাজ্যের রাজধানী।

হিউ-এন-সাঙ-এর সময়ে বাংলাদেশ পাঁচটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল—তাম্রলিপ্ত, কজঙ্গল, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও পৌণ্ড্রবর্ধন। প্রস্তর যুগেও মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ী অঞ্চলে এক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তাছাড়া দন্তভুক্তি বা দাঁতন (দন্তপুর), কাঁসাই নদীর তীরে তিলদা ও কশিপা, শীলাই নদীর তীরে পান্না ও মায়তা (জৈনধর্মের কেন্দ্র ছিল ব'লে অনুমিত হয়) প্রভৃতি স্থানও প্রাচীন ঐতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন। উত্তর-পশ্চিমের বগড়ী অঞ্চলেও নূতন প্রস্তরযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে (৩০।৪।৫৭ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। ঝাড়গ্রামের নিকটবর্তী আস্তাজুড়ি অঞ্চলেও প্রস্তরযুগে বিখ্যাত জনপদ গড়ে উঠে।

অনেকের বিশ্বাস তাম্রধ্বজ নামে জনৈক রাজার নামানুসারে তাম্রলিপ্ত নামকরণ হয়েছে। কিন্তু রাজা তাম্রধ্বজের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সমস্যাই রয়ে গেছে।

"বিভিন্ন সময়ে তাম্রলিপ্ত ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়। যেমন, তাম্রলিপ্তি, তমালিনী, বেলাকূল, তাম্রলিপ্তক, তামোলিত্তি, তামলিকা, বিষ্ণুগৃহ, দামলিপ্ত ইত্যাদি। হেলেনীয় ঐতিহাসিক টলেমী এর নাম দিয়েছেন 'তামালিতিস' এবং রোমীয় ঐতিহাসিক প্লিনির মতে এর নাম 'তালুকতাই।' হিউ-এন-সাঙ এর নামকরণ করেন তান-মো-লি-তি। মুঘলযুগের নাম তম্বুলক এবং এ থেকেই হয়েছে বর্তমান তমলুক। রোমের অমর কবি ভার্জিল রচিত 'জর্জিকস্' কাব্যে অনুমিত হয়েছে যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গঙ্গাপ্লাবিত বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ শৌর্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এছাড়া প্লুটার্ক, ফ্যাক্কাস, কর্সিয়াস, ভ্যালেরিয়াস প্রমুখ ব্যক্তিগণও বলেছেন

প্রাচীনকালে বাঙ্গালীদের শৌর্য ও বীর্যের খ্যাতি সুদূর ইওরোপের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃহত্তর বঙ্গের সঙ্গে গ্রীস, রোম ও ইওরোপীয় অন্যান্য প্রদেশের যোগসূত্রের কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। অস্ট্রিকরাও এই বন্দর ব্যবহার করত। তমলুকের একটি পুকুরে যে মৃৎপাত্রের টুকরাগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি মিশর ও ক্রীটে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশ', জৈনগ্রন্থ 'উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনা' ও সংস্কৃত 'কথা-সরিৎসাগর', 'বৃহৎসংহিতা' ও দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে।

সিংহলরাজ দেবানংপিয় তিস্য রাজা অশোকের সভায় চার জন দূত পাঠান। তাঁরা তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করেন। রাজা অশোক স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়ে এখান থেকে বোধিবৃক্ষের একটি চারা সিংহলে পাঠান। হিউ-এন-সাঙ এই বন্দর থেকে যাত্রা করে চৌদ্দদিন ও চৌদ্দ রাত পরে সিংহলে পৌছান। কলিঙ্গ জয় সময়ে অশোক তাম্রলিপ্তও জয় করেছিলেন। তমলুক হ্যামিল্‌টন হাইস্কুলে যে স্তম্ভের একাংশ রক্ষিত আছে তা অশোকের নির্মিত। রাজা সমুদ্রগুপ্ত সিংহল প্রভৃতি সাগর দ্বীপের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাই এলাহাবাদ প্রশস্তি অনুশাসনে তাঁকে সমুদ্রদেব বরুণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ('ধনদ বরুণেন্দ্রান্তকসম') তাঁর বিরাট নৌবহরের প্রধান ঘাঁটি ছিল তাম্রলিপ্ত।"

('বিস্মৃত মহানগরী তাম্রলিপ্ত'—অধ্যাপক শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৫১)

প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থেও কয়েকটি স্থানে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। পুরাণ মতে এই স্থানই 'কপালমোচন তীর্থ।' তাম্রলিপ্ত ও অন্যান্য কয়েকটি জনপদের উল্লেখ করে মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে 'এতান্ জনপদান্ আর্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে সদা।' ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাম্রলিপ্তকে 'জাস্ত' জনপদ বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও এর উল্লেখ

আছে। 'বৃহৎকথা' গ্রন্থেও এর নাম দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ফো-কিউ-কি (Account of Foe-Keu-Ki) এইস্থানের নামোল্লেখ করেছেন। অনেকের মতে এই স্থানে সূর্যাস্ত সময়ে তাম্রবর্ণ সূর্যকে সমুদ্রে লিপ্ত হ'তে দেখে এবং ঐ সময়ে স্নান-দানাদি করে পরশুরাম পাপমুক্ত হয়েছিলেন বলে এইস্থান 'তাম্রলিপ্ত' নামে তীর্থে পরিণত হয়। কালক্রমে এখানে জনপদ গড়ে উঠে।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তে বাস করেছিলেন এবং এই বিখ্যাত সমুদ্র বন্দরটিতে তখন অন্ততঃ ২৪টি বৌদ্ধ সংঘারামের অস্তিত্ব ছিল। হিউ-এন-সাঙ এখানকার অধিবাসীদের বিপুল বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এখানে যে বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার দেখেছিলেন সেগুলি মহারাজ অশোকের নির্মিত।

জেলার অন্যান্য অংশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক খণ্ড খণ্ড তথ্য পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়রাজ শশাঙ্ক মেদিনীপুরের এক বিস্তৃত অংশ অধিকার করেছিলেন। দন্তভুক্তি (বর্তমান দাঁতন) পর্যন্ত ছিল তার অধিকারের সীমা। দাঁতনের 'শরঃশঙ্ক' নামে দীঘি অনেকের মতে শশাঙ্কের তৈরী। এটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম দীঘি। সর্ববাদীসম্মত কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকলেও অনেকের ধারণা দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিমাংশেও কতকগুলি সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠে। গড়বেতার উত্তরমুখী সর্বমঙ্গলার মন্দিরকে অনেকে বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির বলে মনে করেন। তবে তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। কিংবদন্তী আছে যে, এই মন্দিরটি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মন্দিরটি এতো প্রাচীন বলে মনে হয় না ;—এর সম্মুখাংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের।

যাই হোক একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কাঁকড় দেশের মাহিষ্য রাজা যখন এখানকার দক্ষিণাংশ অধিকারে ব্যস্ত তখন বিষ্ণুপুর

রাজ উত্তরাংশ জয় করেন। এই বংশেরই খড়্গামল্ল বেশ বিস্তৃততর অংশ অধিকার করেছিলেন এবং কথিত আছে ইনিই খড়্গাপুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। মতান্তরে বাংলায় যে খড়্গবংশীয় রাজারা এক সময় রাজত্ব করতেন তারাই খড়্গাপুর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে উড়িষ্যা রাজ মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করে নেন। একসময় কর্ণসুবর্ণরাজও উত্তর-পূর্ব দিকের কিছু অংশ দখল করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত মেদিনীপুর রাঢ় অঞ্চলের মধ্যবর্তী ছিল. এই সময় কাঞ্চীরাজ রাজেন্দ্র চোল কিছু অংশ দখল করেছিলেন; কিন্তু তার অধিকার স্থায়ী হয়নি। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে উড়িষ্যারাজ অনঙ্গভীমদেব উত্তর-পূর্বে দামোদর নদের তীর পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন—কাজেই বর্তমানের সমগ্র মেদিনীপুর অঞ্চল যে তখন উড়িষ্যারাজের অধিকারে ছিল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

মনে রাখতে হবে যে, তখন মেদিনীপুর নামে কোন সীমানির্দিষ্ট অঞ্চল ছিল না। রাজাদের অধিকারের বিস্তৃতিই তখন এক একটি রাজ্যের সীমা হিসেবে ধরা হ'ত। বিচ্ছিন্ন ভাবে এই অঞ্চলের কোন কোন অংশের নাম অনেক স্থানে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে এখানে উত্তর অংশের নাম আছে। উত্তরাংশের বগড়ী অঞ্চল বহু প্রাচীন। দক্ষিণ রাঢ়ের অরণ্যময় দক্ষিণাংশ একসময় ব্যাঘ্রতটী নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রতটী থেকেই বগড়ী বা বাগড়ী নামের উৎপত্তি। আবার বকাসুরের আবাসস্থল থাকার জন্য বগড়ীর প্রাচীন নাম বকদ্বীপ, তা থেকেও এই নাম হ'তে পারে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থেও এই অঞ্চলের নামোল্লেখ আছে।

তোডরমল্লের বিখ্যাত ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থায় উড়িষ্যা ও বাংলাকে ২৪টি চাকলা ও ৭৮৭টি পরগণায় বিভক্ত করা হয়। তখন ঐ ২৪টি চাকলার মোট বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ২৪৯৬১৪৮২৮৶/১৫। এর মধ্যে বাংলায় ১৯টি চাকলা ছিল—গৌড়, টাঁড়া, ফতেবাদ,

মহম্মদাবাদ, বাকলা, খলিফাতাবাদ, পূর্ণিয়া, তাজপুর, খোড়াঘাট, পিঁজরা, বাজুহা, সোনারগাঁ, সিলেট, চট্টগ্রাম, সরিফাবাদ, সুলেমানবাদ, সাতগাঁ, মন্দারণ এবং বর্ধমান। (এই লেখকের 'বগড়ীর ইতিহাস' পৃঃ ১৯ দ্রষ্টব্য)। এর মধ্যে মেদিনীপুর বা তার অন্য কোন অংশের নামোল্লেখ নেই। তবে উত্তর-পূর্বাংশের কিছু অংশ সম্ভবতঃ 'মন্দারণ' চাকলার অধীন ছিল। তাই মনে হয় এই অঞ্চলে তখন মুঘলদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়নি। পরে সেনাপতি মানসিংহ পাঠানদের হাত থেকে এক বিস্তৃত অংশ অধিকার করেন ও উড়িষ্যা রাজ্যের অধিকার থেকে তিনি সাহাপুর, মহিষাদল, হাবেলি ও চিতুয়া নামে পৃথক পৃথক মহলগুলি সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সময় হিজলী নামক ক্ষুদ্রতর রাজ্যের অর্ধ স্বাধীন রাজা ছিলেন তাজ খাঁ, মসনদ-ই-আলী।

ওদিকে এই অঞ্চলের অন্যান্য অংশে তখন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও কয়েকটি রাজবংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করতে আরম্ভ করেছে। এদের মধ্যে শিলদা ও ঝাড়গ্রামের রাজবংশের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। অতি প্রাচীন কালে শিলদা অঞ্চলে ডোম রাজাদের প্রাধান্য ছিল বলে কথিত আছে। পরে আদি রাজা হিসেবে বিজয়সিংহ নামে একজনের নাম পাওয়া যায়—তবে এঁর বিস্তারিত পরিচয় কিছু জানা যায়নি। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণের উড়িষ্যা থেকে মেদিনীমল্লরায় এসে বিজয়সিংহকে পরাজিত ক'রে অঞ্চলটি অধিকার করেন ও বিখ্যাত 'মেদিনী' বংশের পত্তন করেন। মেদিনীমল্লগণ মারাঠা ছিলেন। সময়ানুক্রমে এই বংশের শাসনকাল যা পাওয়া গেছে তা হ'ল—

১।	মেদিনী মল্লরায়—	খ্রীঃ	১৫২৪—১৫৬৬
২।	মঙ্গরাজ মেদিনীমল্লরায়	"	১৫৬৬—১৬২৩
৩।	গৌরচন্দ্র " "	"	১৬২৩—১৬৯১
৪।	বলরাম " "	"	১৬৯১—১৭১১

৫।	হরিশ্চন্দ্র মেদিনীমল্লরায়	খ্রীঃ	১৭১১—১৭২৪
৬।	মানগোবিন্দ " "	"	১৭২৪—১৭৮৭
৭।	রাণী কিশোরমনী "	"	১৭৮৭—১৮৪৮
৮।	ঐ পোষ্যপুত্র শ্রীনাথচন্দ্র মহাপাত্র	"	১৮৪৮—১৮৫৯
৯।	রাণী স্বুবর্ণমনী	"	১৮৫৯—১৮৬১

মেদিনীমল্লরাজের সময়ই মেদিনীপুরের স্থায়ী নামকরণ হয় বলে অনুমান করা হয়।‡ ষোড়শ শতাব্দীর সূচনাতেই ঝাড়গ্রামে একটি সংহত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার রাজবংশের পূর্বপুরুষ ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রি থেকে পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে আসেন। ফেরার পথেই হয়ত স্বুযোগ এসে যায়। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সর্বেশ্বর মল্লদেব ঝাড়গ্রাম রাজ্য অধিকার করেন। এই রাজবংশই দীর্ঘদিন এখানের অধিকার ভোগ করেন। পরবর্তী কালে বৃটিশ ক্ষমতা বিস্তারের যুগে এই অঞ্চল দীর্ঘ দিন ধরে এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এদেরই উপাধি উগালষণ্ড দেববাহাদুর।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা—এই তিনটি প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব বেশী থাকায় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই অঞ্চলে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। ষোড়শ শতাব্দীতে বিস্তৃততর অংশ পাঠান অধিকারভুক্ত হয়। প্রতাপাদিত্যও এই অঞ্চলের কোন কোন অংশ জয় করেছিলেন। এরপর মুঘল আধিপত্য ধীরে ধীরে স্বুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে।

পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গলকাব্য রচনার যুগ। এই কাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরে রচিত হয় সম্ভবতঃ ধর্মমঙ্গল কাব্য। এই কাব্যে যুদ্ধবর্ণনার যেরূপ বাহুল্য তাতে সে সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়ার চিত্র প্রতিফলিত। ধর্মপূজার প্রচলন বর্ধমান বিভাগের মধ্যেই অধিকতর। এই অঞ্চলের ছোট

---

‡ মতান্তরে প্রখ্যাত কোষগ্রন্থকার মেদিনীকর-এর নামানুসারে জেলার নামকরণ হয়েছে।

ছোট ভূস্বামীদের কাহিনীই ধর্মমঙ্গল কাব্যের ভিত্তি। ডোম সৈন্যদের বীরত্বকাহিনীও এতে বর্ণিত আছে। পাল বা সেন রাজাদের কাহিনীর ছায়াও এতে থাকতে পারে। মঙ্গলকাব্য রচনার যুগেও মেদিনীপুরের তমলুক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। গৌড়রাজ নিজ সামন্ত কর্ণসেনের সঙ্গে শ্যালিকার (রঞ্জাবতী) বিবাহ দিয়া ময়নাগড় তাদের বসবাসের জন্য উপহার দেন। এদেরই পুত্র ধর্মমঙ্গল বর্ণিত বিখ্যাত বীর লাউসেন। ময়নাগড়ে (তমলুকের নিকট) এখনো একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে দেখা যায়।

মুঘল যুগেও এই অঞ্চলে নানা ঘটনার সংঘাত দেখা যায়। যুবরাজ খুর্‌রম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'লে নারায়ণগড়রাজ তাঁকে সাহায্য করেন ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজাগণও যুবরাজকে সাহায্যের বিনিময়ে দেশকে মুঘলশাসন-মুক্ত করার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত যুবরাজ ব্যর্থ হওয়ায় সে আশা সফল হয়নি। এই সময় নরমপুরে একটি মসজিদ অর্ধনির্মিত হয়েছিল এবং নারায়ণগড়ের রাজা উপাধি পেয়েছিলেন 'মাড়ি সুলতান।'

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চিতুয়া মহলের শাসক ছিলেন দুর্ধর্ষ বীর শোভাসিং। এই অঞ্চলের বরদা পরগণায় বাগদি রাজাদের কর্তৃত্ব ছিল। শোভাসিং ও তার ভাই হেমায়েৎ সিং এই রাজাদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন ও খাদ্যে বিষ মিশিয়ে বাগদী রাজ-বংশকে নির্মূল করেন বলে প্রচলিত বিশ্বাস। সে যাই হোক শোভাসিং ঐ সময়ে উত্তর-পূর্বাংশে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন।

বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম একবার অতর্কিতে চিতুয়া লুণ্ঠন করতে এলে শোভাসিং-এর সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধে। শোভাসিং প্রতিশোধ নেবার জন্য গোপনে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বর্ধমান পৌছান ও হঠাৎ আক্রমণ শুরু করেন। কথিত আছে নিরুপায় কৃষ্ণরাম রাজপরিবারের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য পুরনারীদের নিজ হাতে হত্যা করেন কিন্তু তাঁর

এক কন্যা শোভাসিং-এর হাতে বন্দী হয়। পরাজয় নিশ্চিত জেনে কৃষ্ণরাম পুত্র জগৎরামকে পাঠালেন নদীয়ার দরবারে সাহায্যের আবেদন নিয়ে। রাজকুমার অতিকষ্টে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে দুর্গের বাইরে যেতে সমর্থ হন। কিন্তু এতো করেও শেষ রক্ষা হ'ল না. বর্ধমানের পতনের পর শোভাসিং আফগান সর্দার রহিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে হুগলী পর্যন্ত অগ্রসর হলেন, হুগলীর ফৌজদার নূরউল্লা পলায়ন করেন ও হুগলী লুণ্ঠিত হয়।

শোভাসিং-এর শেষ জীবন রহস্যাবৃত ; কেউ বলেন ঔরঙ্গজেবের পৌত্র (বাহাদুর শাহর ২য় পুত্র) আজিম ওস্মান বাংলার নবাব হয়ে এসে তাকে দমন করেন, আবার কেউ বলেন বর্ধমান রাজের অপহৃতা কন্যাই ছুরিকাঘাতে শোভাসিংকে হত্যা ক'রে নিজেও আত্মহত্যা করেন।

এ সম্বন্ধে পৃথক কাহিনী হচ্ছে এই সময় বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা ও নবাব ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ। শোভাসিংকে দমন করবার জন্য জগৎরাম নবাব দরবারে আবেদন জানান। ইব্রাহিম সেনাপতি নূরউল্লা খাঁকে পাঠালেন কিন্তু পাঠানদের সহায়তায় শক্তিশালী শোভাসিংকে নূরউল্লা দমন করতে পারলেন না। তখন ইব্রাহিম শাহজাদা জবরদস্ত খাঁকে পাঠালেন। এই সময়েই বাংলায় শান্তি স্থাপনার্থে আজিম ওসমানের আগমন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ তৃতীয় রঘুনাথ সিং এই সময় মুঘল পক্ষে যোগ দেন ও শোভাসিং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কথিত আছে পরাজিত শোভাসিং-এর কন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন ও শোভাসিং-এর প্রাসাদ থেকে লালবাঈ নামে রূপলাবণ্যবতী ও নৃত্যগীত পটিয়সী এক বাঈজীকে বিষ্ণুপুরে এনেছিলেন।

মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিমের বগড়ী অঞ্চলও অতি প্রাচীনকাল থেকে বিশেষ বিখ্যাত; এমনকি আদি মধ্যযুগ এবং অনেকের বিশ্বাস প্রস্তরযুগেও এই অঞ্চলে জনপদ ছিল।

মহাভারতীয় যুগে বকাসুরের (যাকে স্বয়ং ভীমসেন হত্যা করেছিলেন) বাসস্থান ছিল বলে এর প্রাচীন নাম বকদ্বীপ। এইস্থানে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের কিউরেটর বলেছেন—

"...The object seems to be a Neolithic implement bearing similar characteristics as found in other Neolithic finds from Bankura and other places of West Bengal."

এবং তিনি আরো আশা করেন যে, এই অঞ্চলের মাটির নীচে এখনো বহু প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক নিদর্শন লুকিয়ে রয়েছে। তাঁর ভাষায়—

"....I hope that the reign of Bogri Dihi may hide beneath its soil the relics of some ancient sites and if more explorations are carried out in this reign more archaeological finds may come out to reveal the existance of early habitations flourished in certain periods of the ancient History of Bengal."

Dated 13. 3. 1961

D. P. Ghosh
Curator
Asutosh Musium of Indian Art
University of Calcutta.

[মনে হয় বগড়ী ডিহির মাটির নীচে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। এতদঞ্চলে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকার্য চালানো হ'লে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যেতে পারে।]

অনেকের ধারণা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলে জৈন ধর্ম প্রসার লাভ করে। সেই সময় বগড়ীতে পুরন্দর ও শীলাবতী নদীর সংযোগ স্থলে এই ধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল। ঐস্থানে প্রাপ্ত

একটি মূর্তিকে তীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্তি বলে অনুমান করা হয়। অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের মতে ঐ মূর্তিটি এখানে জৈনধর্মের প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে প্রাপ্ত কয়েকটি মৃৎপাত্রের সহিতও নাকি আদি মধ্যযুগের স্মৃতি জড়িত আছে। (৩০।৪।১৯৫৭ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এর সমর্থনে তেমন প্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্য বেশী নেই, কেবল অনুমানসাপেক্ষ। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাধর পণ্ডিত উপেন্দ্র ভট্টের সহায়তায় রাজা গজগতি সিংহ এক সংহত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও দিল্লীর মামুদশাহ তুঘলকের নিকট থেকে জমিদারী সনদ লাভ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃটিশ ক্ষমতা বিস্তার

[পটভূমিকা]

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন আর শুধুমাত্র ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে মেতে নেই। সময় আর সুযোগ বুঝে তারা দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে। ব্যবসা-কুঠী ও মালপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু কিছু সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র তারা রাখত এবং সুযোগ বুঝে দেশের ছোট ছোট রাজন্যবর্গের গৃহবিবাদের সময় পর্যাপ্ত সৈন্যসামন্ত ও অর্থাদি দিয়ে সাহায্য করত। ফলে একপক্ষ তাদের শক্তি ও কৌশলে প্রভাবিত হয়ে কোম্পানীর হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়ত। কূট-কৌশলী বেনিয়া জাতি এইভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী অনেক আগেই এটা বুঝতে পেরেছিলেন—আর সেইজন্যই তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন কোম্পানীর কার্যকলাপের উপর। প্রথমে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানী একবার অল্পদিনের জন্য হিজলী দখল করে। কিন্তু সে অধিকার ছাড়তে তারা বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে আর এক গোলযোগ দেখা দিল, ইতিহাসে যাকে আমরা 'বর্গী হাঙ্গামা' বলি। নবাব আলিবর্দী যখন মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত তখন মহারাষ্ট্রীয়গণ একযোগে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা আক্রমণ করে। ইতিহাসের ভাষায়—"...সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী পঙ্গপালের মত বাংলাদেশের বুকের উপর ছুটে আসতে লাগল। বাদশাহ ঔরঙ্গজীব এতদিন যাদের পার্বত্য মূষিক বলে উপহাস

করতেন, তোষামোদপরায়ণ পারিষদগণ যাদের পিপীলিকাবৎ নখাগ্রে টিপে মারবেন বলে আস্ফালন করতেন, সেই মহারাষ্ট্রগণ কঙ্কন প্রদেশের গিরিগহ্বরে দীর্ঘ দিন আত্মগোপন করে থাকেনি। মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতনকাল নিকটবর্তী বুঝে বাহুবলে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবার আশায় তারা দলে দলে অসিহস্তে দেশ-বিদেশে ছুটে বেড়াতো। অচিরকাল মধ্যে দিল্লীর বাদশাহ তাদের হস্তে ক্রীড়াকন্দুক হয়ে উঠলেন। তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রাজকরের চতুর্থাংশ 'চৌথ' আদায়ের ফরমান পেয়ে বাহুবলে ন্যায্য পাওনা বুঝে নেবার জন্য বাংলাদেশেও পদার্পণ করল। বাংলার ইতিহাসে এর নাম বর্গীর হাঙ্গামা" (সিরাজদ্দৌল্লা—অক্ষয় কুমার, পৃঃ ২৪)।

এই অভিযানের নেতা ছিলেন সমরকুশল ও বিচক্ষণ নেতা ভাস্কর পণ্ডিত। উড়িষ্যায় তাদের সমর কোলাহল আরম্ভ হ'লে মুর্শিদাবাদ থেকে সব সময় ছুটে যাওয়া সম্ভব নয় বলে নবাব আলিবর্দী কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরেই রয়ে গেলেন। সিরাজ মাতামহের অনুমতি নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলেন। যাঁরা সিরাজকে অপদার্থ ও দুর্বল চরিত্রের তরুণ বলে মনে করেন তাঁদের নিশ্চয়ই জানা নেই যে, এই সময় তিনি যথেষ্ট রণকুশলতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কয়েকবার যুদ্ধ করার পর ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দী মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করেন ও উড়িষ্যায় মারাঠাদের অধিকার স্বীকার করে নেন। সুবর্ণরেখা নদী দুই পক্ষের অধিকৃত অঞ্চলের সীমা নির্দিষ্ট হ'ল। এক সময় মারাঠা শক্তি কলকাতা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল ও কলকাতাকে রক্ষা করতে 'মারাঠা খাল' খনন করতে হয়েছিল। মেদিনীপুরের ভূস্বামীরা এই যুদ্ধকে কোম্পানীর অধিকার বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা মনে করে মারাঠাদের সাহায্য করেছিলেন। এই জন্য অনেক স্থানে (যেমন, পটাশপুর পরগণা) মারাঠা প্রভুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

বর্গীর হাঙ্গামার সময় মেদিনীপুরের ফৌজদার রামরাম সিংহ বিশেষ প্রভুভক্তির পরিচয় দেন এবং তারই পুরস্কার স্বরূপ আলিবর্দী দক্ষিণের সমুদ্রতীরবর্তী এক বিস্তৃত অঞ্চল তাকে দান করেন। আলিবর্দী ও সিরাজ উভয়েই এই রামরাম সিংহকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন ও বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী হিসেবে অনেক সময় তার পরামর্শও শুনতেন। তাই কলকাতায় দুর্গ স্থাপন ব্যাপারে প্রেরিত সিরাজের দূত খোজা বাজিদকে কোম্পানীর লোকেরা যখন অপমান করে তাড়িয়ে দিল তখন কলকাতায় ইংরেজ দুর্গে অন্য দূত পাঠাবার জন্য রামরাম সিংহের উপরই ভার দেওয়া হ'ল। তিনি নিজের ভাইকে ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে ডিঙ্গি নৌকায় করে কলকাতায় পাঠালেন। কেউ কেউ বলেন তিনি নিজেই দূত হয়ে ইংরেজ দুর্গে গিয়েছিলেন।

কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানী তখন একটা চরম বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এদের প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হয়, সিরাজ অতি সহজেই কলকাতা যখন অধিকার করেন। কিন্তু সিরাজের এই অধিকার স্থায়ী হ'ল না। পরে পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সিরাজ ফরাসীদের সহায়তায় দেশকে ফিরিঙ্গী কবলমুক্ত করতে চেষ্টা করেন। এই সময় মেদিনীপুর থেকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের মাঝামাঝি ফরাসী সেনাপতি বুসীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

"...সুবার নায়েবগণ, মেদিনীপুরের ফৌজদার ও জমিদারদের আদেশ দিয়াছি আপনাকে অভ্যর্থিত করিতে এবং আপনার অগ্রগতিতে আপনাকে সাহায্য করিতে...।"

এই মাসেরই শেষের দিকে তিনি আর একটি পত্রে বুসীকে লেখেন—

"..আমার আন্তরিকতার প্রমাণ স্বরূপ আমি এক্ষণে দিদার আলি, রামজী পণ্ডিত ও রাজারাম সিং-এর নিকট এই পরোয়ানা

পাঠাইতেছি যে, তাঁহারা যেন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন এবং কোন অজুহাতে কটক, বালেশ্বর ও মেদিনীপুরে আপনার অভিযানে বাধা প্রদান না করেন…।”

তরুণ নবাব সিরাজের মতোই সেদিন মেদিনীপুরবাসীরাও কোম্পানীর ক্ষমতা বিস্তারের সূচনা দেখে অমঙ্গলের আশংকায় শংকিত হয়েছিলেন—হয়ত একেই বলে ইতিহাসের ইংগিত। এই ইংগিত বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দীও বুঝেছিলেন, তাই মৃত্যুশয্যায় প্রিয় দৌহিত্র সিরাজকে তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—

“…ইংরেজ কোম্পানীকে প্রশ্রয় দিও না, তাহ’লে তোমার রাজ্য আর তোমার থাকবে না…।”

দূরদর্শী নবাবের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে যখন গৃহবিবাদ আর বিশ্বাসঘাতকতার ছিদ্র ধরে এল চরম আঘাত। তরুণ নবাব সিরাজ ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস-ঘাতকতা আর শঠতার মধ্যে পড়ে বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র সৈন্য ও নগণ্য পরিমাণ রণসম্ভার নিয়ে এক যুদ্ধের প্রহসন দেখাল ক্লাইভ। আর সুবে বাংলার তরুণ স্বাধীন নবাবকে হটিয়ে দিল অতি সহজেই। তারপর আরম্ভ হ’ল বাংলার সিংহাসন নিয়ে বেনিয়া কোম্পানীর বেসাতি। চলতে লাগল শাসনের নামে স্বেচ্ছাচার। ছলে বলে কৌশলে বৃটিশ ক্ষমতা বিস্তারের এই হ’ল সূচনা।

বৃটিশ ক্ষমতা বিস্তার

[অগ্রগতি]

দেখতে দেখতে পলাশীর যুদ্ধের পর তিন বছর কেটে গেল। ইংরাজী ১৭৬০ সাল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন জলেশ্বর ও মেদিনীপুর চাকলার মালিক। মীরজাফরের পর মীরকাসিম আলি খাঁ নবাবী পেয়ে কোম্পানীকে উপহার দেন মেদিনীপুর চাকলার

মালিকানা। এই অংশের রাজস্ব আদায়ের ভার পেলেন মেজর জনস্টন সাহেব। তখন এই চাকলার রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪৪২০৩৬ সিক্কাটাকা। পরে এই রাজস্ব বেড়ে ৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল; এ থেকেই বোঝা যায় কি দারুণ শোষণনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি। তখন মেদিনীপুর ও জলেশ্বর চাকলা ২৮টি মহলে বিভক্ত ছিল। এই মহলগুলি হ'ল —বাঁশডিহা, বালিসাহী, পিপলি, বারিপদা, বালিকুটি, ভোগরাই, ঢেকাবাজার, বগড়ী, ব্রাহ্মণভূম, জলেশ্বর, তমলুক, তারুকা, শোরভূম, মালিহাটা, মেদিনীপুর, সবং, শিয়াড়ী, রামনা, রাইপুর, খড়্গপুর, কেদারকুণ্ড, করসি, করুই, নারায়ণগড়, গগনেশ্বর, কাশীজোড়া, কুতুবপুর ও খান্দার।

(*from Early History of Midnapore—Hunter*)

বৃটিশ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখা যায় কেমন করে একের পর এক করে বিভিন্ন ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্র মহলগুলিতে তাদের ক্ষমতা বিস্তৃত হ'তে লাগল দ্রুতগতিতে—

"... On the outer edge of the Company's Midnapore jurisdiction was Bhanjabhum on the north ; to the west Bahadurpur lower down to Dharinda, Balarampore, Narayangarh and Khandar, Potaspore which belonged to the Marathas, had to be skipped over. Then came Uttar Bihar ; lower down to Dantamutta (Danton) ; then came in succession Amarsi, Bajarpore, Bhumyamutta, Sabang. Mayanachar, Kashijore, Kutabpore and Narajole, as the eye travels on the map from west to south ; then east and finally rests on Bhanjabhum again....."

(*from Notes on the History of Midnapore— William Price. Page 28.*)

[কোম্পানী অধিকার মেদিনীপুরের উত্তরে ভঞ্জভূম, পশ্চিমে বাহাদুর-পুর থেকে আরম্ভ করে ধারিন্দা, বলরামপুর, নারায়ণগড় ও খান্দার, মারাঠা অধিকৃত পটাশপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হ'ল। তারপর উত্তর বিহার থেকে দাঁতন। পরে অমর্ষি, বাজারপুর, ভূম্যমূত্য, সবং, ময়নাচর, কাশীজোড়া, কুতুবপুর এবং নাড়াজোল, অঞ্চলের মানচিত্রে প্রথমে পশ্চিম থেকে দক্ষিণে ও তারপর পূর্বে এবং শেষে দৃষ্টি পড়ে পুনরায় ভঞ্জভূমের উপর।]

এই সকল স্থানগুলি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গমস্থলের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। দক্ষিণের মারাঠা শক্তি ও পশ্চিমের অন্যান্য শক্তিগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য এই অঞ্চলগুলিতে আধিপত্য সামরিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই মনে হয় যে কোন উপায়ে এই 'জঙ্গল মহলগুলিকে' আয়ত্তে রাখার জন্য কোম্পানীর জেদ চেপেছিল। তার উপর এখানকার স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন ছোট ছোট ভূস্বামীদের প্রথম থেকেই বিশেষ সুনজরে দেখেনি বৃটিশ, তাই তাদের দমন করতে অধিকতর মনোযোগ দিয়েছিল কোম্পানী ও পরবর্তিকালে বৃটিশ শাসকবর্গ। কিন্তু এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ কোনদিনই বিদেশীর অপ্রতিহত অভিযানকে নির্বিবাদে মেনে নেয়নি। এই সময় থেকেই মেদিনীপুর বৃটিশের সঙ্গে বিরুদ্ধতায় নামে। বারবার বহু আন্দোলন গড়ে তুলেছে এখানের অধিবাসীরা, পরাজিতও হয়েছে অনেকবার…। তাই বুঝি এই অঞ্চলের ছোট বড় প্রত্যেকটি ব্যক্তি বৃটিশের জাতশত্রুতে পরিণত হয়েছিল, হয়ে উঠেছিল একেবারে মরিয়া…।

পলাশীর যুদ্ধের পর এক দশকের মধ্যেই আরম্ভ হ'য় ছোটখাট নানা সংঘর্ষ। মারাঠাদের সহায়তায় সিউবৎ রাজারাম, কোশলসিং প্রমুখ জমিদারগণ এক বিরাট অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী (প্রায় ছয় হাজার) গড়ে তুলেন। ইংরেজ সেনাপতি জনস্টনকে তাঁরা আটক করে রাখেন প্রায় পক্ষকাল ধরে। বিপন্ন সেনাপতি তাঁর অবরুদ্ধ অবস্থার ও অসহায়তার কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখলেন—

"...সাহায্যকারী কোন বন্ধুর অভাবে অসংখ্য সৈন্যবেষ্টিত হ'য়ে আছি, যথাশীঘ্র মেজর ইয়র্ক বা হেয়াইটের নিকট থেকে কোনরূপ সাহায্য না পেলে আমাদের দলের পরিণামের কথা কল্পনা করে নিতে পারেন। আমাদের এখন মাথাপিছু দৈনিক ছয় ছটাক করে মাত্র চারদিনের খাদ্য আছে—গ্রামের লোক বা জমিদারদের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্যের আশা নাই...।"

কিন্তু বিপন্ন সেনাপতিকে সেদিন সাহায্য করেছিল কর্ণগড়ের মতিরাম খাঁন ছয় মণ চাল পাঠিয়ে। বিপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যগণ তখন বারবার বৃটিশের উপর আক্রমণ করেছে এবং তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। সিউরং বালেশ্বরের দিকে যাত্রা করেছিলেন, আর অবশিষ্ট দলের নেতৃত্ব করেছিলেন রাজারাম, কুশলসিং, ভৈরবপণ্ডিত আর ফতেসিং (ফেব্রুআরি, ১৭৬৪)।

মীরজাফরকে গদীচ্যুত করে (১৭৬০ খ্রীঃ) কোম্পানী মীরকাসিমকে মসনদে বসিয়ে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রামের জমিদারী উপহার পেল।` কিন্তু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে এসেই কোম্পানী দেখল কাজটি তত সোজা নয়, কেননা ঐ দশকেই মেদিনীপুরে বৃটিশকে যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হোলো। মেদিনীপুর ওআশপাশের অঞ্চলগুলির আধিবাসিগণ বিদেশীর কর্তৃত্ব সহজে মেনে নিতে চাইল না। জয়যাত্রার সূচনাতেই প্রবল ভাবে বাধা দিল তারা। কিন্তু নানা কারণে তাদের ব্যর্থ হতে হয়েছিল নববলদৃপ্ত বিদেশীর শক্তি ও কূটকৌশলের কাছে। ঐ সময়ের একটি চিঠি দেওয়া হোলো—

Midnapore, 30th January, 1767

To

Eusign John Fargusson

Sir,

To the westward of Mindapore there is a very large tract of country comprehended within the limit of the province, but of which the Zaminders taking

advantage of the situation support themselves in a kind of independance. The continuation of the independance in judged to be highly unsuitable in the present situation of our Government and is also thought to obstract a commercial intercourse which used to subsist the Bengal Provinces and the districts to be westward of the Hills. —*John Graham*

[মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশে প্রদেশের বিরাট অঞ্চল আছে কিন্তু এখানকার জমিদারগণ আঞ্চলিক অবস্থানের সুযোগে স্বাধীন ভাবেই রয়েছেন। সরকারের বর্তমান পরিস্থিতিতে এদের এই স্বাধীনতাকে বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে ও এদের সঙ্গে একটা আর্থিক যোগাযোগের কথা চিন্তা করা হচ্ছে—যেটা প্রদেশের এবং পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চলগুলির পক্ষে সহায়ক হবে।]

পলাশীর যুদ্ধের পরেই কোম্পানীর লোকেরা যখন সুকৌশলে ধীরে ধীরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করছিল তখন এদেশের জমিদারদের স্বাধীন মনোভাব তাদের ভাল লাগেনি। তৎকালীন অবস্থায় জমিদারদের পরস্পর মিলিত হওয়া ছিল ভীষণ অসুবিধাজনক, তাই তারা নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠিয়েছিল বারবার। কিন্তু এদেশের জমিদারগণ এতে বিন্দুমাত্র ভীত হননি। তাঁরাও একযোগে বৃটিশ শক্তির অগ্রগতিকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। রাইপুর, ফুলকুসমা ও মানভূম প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের জমিদারগণ কোনরূপ রাজস্ব দিতেই অস্বীকার করে কোম্পানীর কর্মচারীদের একেবারে বিব্রত ক'রে তোলে। ঘাটশীলার জমিদার তাঁর জমিদারীর সর্বত্র সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন। কোন কারণেই একটি ফিরিঙ্গীকেও তিনি রাজ্যে স্থান দিতে চাননি (জে. ফারগুসনের ১৪ই ফেব্রুআরি, ১৭৬৭ তারিখে লেখা চিঠি)। বৃটিশ সৈন্যের অগ্রগতি রোধ করবার জন্য তিনি কতকগুলি বড় বড় রাস্তা ভেঙ্গে দেন ও অন্য কতকগুলি

রাস্তা গাছ ও পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের দুর্গ রক্ষা করতে পারেননি। ঐ সময়কার এক দিনের যুদ্ধের বর্ণনা—লেখাটি বৃটিশ সেনাপতির।

"২২শে মার্চ, ১৭৬৭ খ্রীঃ

আজকের অভিযানে তারা বেশ ভালভাবেই যুদ্ধ করল যাতে মনে হয় তারা সংখ্যায় খুব বেশী। প্রথমে সামনে ও পরে পাশের জঙ্গল থেকে তারা আক্রমণ করে কিন্তু তেমন কিছু ক্ষতি করতে পারেনি। প্রায় ৯টার সময় দুর্গে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখি সেটা জ্বলছে এবং সেখানকার লোকজন পুনরায় আমাদের আক্রমণ করবার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জঙ্গলে পালিয়েছে…।"

ঘাটশীলার দামোদর সিং পরে আর একবার ছোট ছোট জমিদারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং জাম্বনীর মোগল রায় প্রায় দুই হাজার পাইক নিয়ে বৃটিশের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

সে যাই হোক ঘাটশীলার জমিদারী দেওয়া হ'ল পলায়িত জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্রকে। পরে জমিদার ধরা পড়লে তাকে মেদিনীপুরে আনা হয় ও তার জন্য মাসিক ৩০ টাকা মাত্র বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। মেদিনীপুরেই তাঁকে থাকতে আদেশ দেওয়া হ'ল। তার বন্ধু আদিত্যভূমের জমিদারের ক্ষীণ প্রতিবাদ ব্যর্থ হোলো। অতঃপর কোম্পানী ঘাটশীলা জমিদারীর রাজস্ব ধার্য করেন বার্ষিক ৫৫০০ টাকা।

আরো কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধরত মিঃ জি. রুক ১৭৬৮ সালের ৪ঠা জুন মি. ভান্সিটার্টকে লিখলেন—

"মহাশয়,

গতকল্য প্রাতে বলরামপুর হলে দুই ক্রোশ দূরে জাম্বনীতে থেমে ছিলাম। বলরামপুর থেকে ২১ জন পাইক এসে যোগ দিল। ওরা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ৪ জন কিন্তু জঙ্গলে পালিয়ে গেল। ওদের সন্ধান আর পাইনি। আজ প্রাতে গ্রামে পৌছে দেখি সব

লোকজন পালিয়েছে। সিপাইদের জন্য কিছু খাদ্য মিলবার উপায় নাই। মাত্র এই খানেই এই অবস্থা নয়, যেখানে গেছি সেখানেই। আজ সংবাদ পেলাম মেদিনীপুর থেকে একজন, বিভিন্ন জমিদার ও অন্যান্য ব্যক্তির কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছে যে তাদের ধরবার জন্য সিপাহী ফোজ এগিয়ে চলেছে, তারা যেন অচিরকাল মধ্যে বাড়ীঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

এই মাত্র আমার এক হরকরা এসে খবর দিয়ে গেল যে, এই অঞ্চলের চারিদিকে ঘাটশীলার রাজার লোকজন তীর ধনুক নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

৪।৬।১৭৬৮ ভবদীয়—
জি. রুক।”

খবর পাওয়া গেল শত্রু পাশেই ঘোরাফেরা করছে ও তাদের নেতৃত্ব করছেন ঘাটশীলার তরুণবীর জগন্নাথ ঢোল। ৮ই জুন কয়েকজন সিপাই নিয়ে রুক সাহেব বেরোলেন। তার নিষেধ সত্ত্বেও ক্রুদ্ধ সিপাহীরা বেপরোয়া গুলি চালাতে লাগল। সৌভাগ্যের বিষয় কেউ হতাহত হ'ল না। সিপাহীরা গ্রামে ঢুকে লুঠ করল কিছু ধান, চাল ও বাসনপত্র। জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট কাপড়ের টুকরা ভর্তি ছোট ঝুড়ি পাওয়া গেল কতকগুলো, কিছু বারুদ, সীসে ও বারুদ তৈরীর মসলা, কয়েকটা তলোয়ারও তারা পেল। চারজন অনুচরসহ জগন্নাথের কাকা নিমাই ঢোল ধরা পড়ল। (তিলিয়া বাঁধ ক্যাম্প থেকে ভান্সিটার্টকে লিখিত রুকের চিঠি ৮ই জুন, ১৭৬৮ খ্রীঃ)

জুলাই মাসের প্রথম দিকে মরগান সাহেব কয়েকজন জমিদারকে কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন। কেউ তার চিঠির কোন উত্তর দেননি। ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। জীবন নামে একব্যক্তি ঐরূপ একদল ফৌজকে হঠাৎ একরাত্রে আক্রমণ ক'রে বিপর্যস্ত

করে দেয়। ফলে আরো সৈন্যসামন্ত পাঠান হ'ল। জীবন সর্দার সাঁতরে স্ুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে ময়ূরভঞ্জে পালিয়ে গেলেন।

অপর এক দুর্দান্ত জমিদার জগন্নাথ পাত্রকে (ডোমপাড়া) এরূপ অনুরোধপত্র পাঠান হয়। উত্তর দেওয়া দূরে থাক তিনি পত্রবাহককেও আটকে রাখেন। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য মরগান সাহেব একজন সার্জেণ্ট-এর অধিনায়কত্বে একদল সিপাই পাঠালেন। সকল গ্রামবাসীসহ জগন্নাথ জঙ্গলে আত্মগোপন করলেন। বন্যাপ্লাবিত সুবর্ণরেখা পার হবার জন্য গোরা সৈন্যেরা একটা নৌকাও যোগাড় করতে পারল না।

চাকুলিয়ার শক্তিশালী জমিদারকে আয়ত্তে আনবার জন্য সার্জেণ্ট ব্যাসকম্ব সদলবলে যাত্রা করেন। বড় বড় গাছ কেটে পথরোধ করে জমিদারের লোকজনেরা গোরা সৈন্যের অগ্রগতিতে বাধা দিলেন। ক্রমে সার্জেণ্ট-এর গোলাগুলিও শেষ হয়ে এল। চাকুলিয়ার যুদ্ধে ব্যাসকম্ব নিহত হলেন।

বৃটিশের মতে এইসব বিদ্রোহিগণ এক ঝাঁক বোলতার মত। হঠাৎ আক্রমণ করে আবার হঠাৎ পালিয়ে যায়, এদের দমন করা অসম্ভব। ওদেরই ভাষায়—

"It is almost impossible to kill any of them, as they always keep at a great distance and fling their arrows at you···"

অর্থাৎ তাদের কাউকে হত্যা করা একপ্রকার অসম্ভব, কেননা সব সময় ওরা দূরে দূরে থাকে ও তীর ছোঁড়ে···।

দেশীয় জমিদারগণ ঘাটশীলার জগন্নাথ ঢোলের নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করে মরগান সাহেবের মুখোমুখি হলেন। যারা ঐ দলে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেনি তারাও ভিতরে ভিতরে সমর্থন ও সাহায্য করত। তাই কোম্পানীর লোকজন কোথাও কোনরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি পেত না। খাদ্যের অভাবে মরগান

সাহেব ও তার দলবল ভীষণ অসুবিধায় পড়েছিল। বহু চেষ্টা করেও বিশেষ সুবিধা করতে পারল না কোম্পানীর সৈন্যসামন্তগণ। অবশেষে মরগান কর্তৃপক্ষকে জানান—

"জয় করা দূরে থাক এখানে থাকাই বেশ বিপজ্জনক। কারণ গোলযোগকারীরা এখন এমন একজন তরুণ নেতা পেয়েছে যে কখনো কোন নির্দিষ্ট স্থানে বেশীদিন থাকে না…।"

রাণী শ্রীমনী, সীতারাম ও অযোধ্যারাম প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ ছিলেন এই জনজাগরণের স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু জগন্নাথের ভাই কৃপাসিন্ধু তখন দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; আর তার বিনিময়ে পেয়েছিল ঘাটশীলা জমিদারীর দেওয়ানের পদ। আর কাকা নিমু ঢোল বলেছিল জগন্নাথকে ধরিয়ে দেবে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সেই বীর নেতাকে ধরা যায় নি।

এই সময় হঠাৎ এদেশীয় আবহাওয়ায় মরগান সাহেবের লোক-জন অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তিনি ব্যাপারটার যথাশীঘ্র একটা মীমাংসা করতে চাইলেন। কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলে হয়ত গোলযোগ বেড়েই যাবে এই ভেবে তিনি প্রচার করলেন যে, জগন্নাথ ফিরে এলে তাকেই ঘাটশীলার জমিদারী দেওয়া হবে—কেননা অকর্মণ্য নিমুর দ্বারা রাজস্ব আদায় হবে না, এতে কোম্পানীর সমূহ ক্ষতি, তবে দরিদ্র নিমুকে কয়েকটি গ্রাম দেওয়া হবে। ২২শে জুলাই (১৭৬৮ খ্রীঃ) এক চিঠির দ্বারা ভান্সিটার্টকে এই নির্দেশ দেওয়া হ'ল। কিন্তু এই কৌশল অবলম্বন করেও জগন্নাথের কোন প্রকার খোজখবর পাওয়া গেল না।

এদিকে জগন্নাথ পাত্র ফিরে এলেন (ডোমপাড়ার পলায়িত জমিদার) ও মরগান সাহেব তাকে তার গরুবাছুর ও সকল জিনিস-পত্র ফিরিয়ে দিলেন। খবর পাওয়া গেল জগন্নাথ ঢোল তখন ময়ূরভঞ্জে। ২রা অগস্ট যাত্রা করে একটিমাত্র ভাঙ্গা নৌকায় অতি-কষ্টে সিপাই ও মালপত্রসহ সুবর্ণরেখা পেরিয়ে মরগান ৪ঠা তারিখে

হলদিপুকুরে পৌঁছান, কিন্তু তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদল আসতে পারল না। বামুনঘাটির জমিদারকে জানান হ'ল ঢোলকে তাদের হাতে তুলে না দিলে লুঠ ও অত্যাচারে তার জমিদারী ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হ'ল না। অবশেষে মরগান বুঝতে পারলেন যে জগন্নাথ ঢোলকে ধরা যখন অসম্ভব তখন অনর্থক তার সন্ধান করা নিছক প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। (হলদিপুকুর ক্যাম্প থেকে ভান্সিটার্টকে লেখা মরগানের চিঠি, ৬ই অগস্ট, ১৭৬৮ খ্রীঃ)

পরের বছর ফেব্রুআরি মাসে ভান্সিটার্ট তৎকালীন কলেক্টার বাহাদুর জেমস আলেকজাণ্ডার-এর নিকট অনুমতি চাইলেন মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশের পরগণাগুলি ঘুরে দেখবার জন্য (১৬ই ফেব্রুআরি, ১৭৬৯)। প্রায় একমাস ধরে তিনি এই অঞ্চলে ভ্রমণ করে দেখলেন দেশের প্রত্যেকটি ছোটবড় জমিদার পরস্পর কলহে লিপ্ত। অধিবাসিগণ কৃষিকার্যে এমন কিছু উন্নত নয়, বরং স্থানগুলির বেশীর ভাগই গভীর অরণ্যময়। মূল্যবান কাঠ ও অরণ্যজাত দ্রব্যাদি পাওয়া গেলেও রাজস্বের দিক দিয়ে কোম্পানীর কাছে এই অঞ্চলটি বিশেষ লাভজনক নয়। তবে অধিবাসীরা কিছুটা শিক্ষিত হ'লে ও চাষবাসে উন্নতি করলে এদের কাছ থেকে আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হ'তে পারে। ১০ই এপ্রিল ভান্সিটার্ট একটি চিঠি দিয়ে আলেকজাণ্ডারকে এই কথা জানালেন।

এই বছরই শেষের দিকে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার পাইক একত্র মিলিত হয়ে ঘাটশীলা আক্রমণ করে এবং কোম্পানীর আশ্রিত জমিদারকে নরসিংপুর দুর্গে আটক করে রাখে। অচিরকাল মধ্যে বরাহভূম অঞ্চলেও অশান্তি দেখা দেয়। ঘাটশীলার অশান্তি দমনের জন্য ক্যাপটেন ফরবেস ও বরাহভূমের জন্য লেফটেন্যাণ্ট নান প্রেরিত হন। এদের সঙ্গে পাঁচ দল সিপাই ও দুটি ছোট ফিল্ডগান ছিল। প্রথম দিকে নান কিছুটা সাফল্যলাভ করেছিলেন। একটি

যুদ্ধে তাঁর চারজন সিপাই নিহত ও সাতজন আহত হয়। ফরবেসের কুড়িজন সিপাই হলদিপুকুর থেকে সামান্য দূরে নির্মমভাবে নিহত হোলো। শেষের দিকে নানও কম শিক্ষা পাননি। তার মোট কুড়িজন সিপাহীসহ একজন সার্জেণ্ট ও একজন সুবাদার নিহত হয়। একজন সুবাদার ও চল্লিশ জন সিপাহীসহ তিনি নিজেও গুরুতর ভাবে আহত হন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরির প্রথমদিকে বঙ্গসিং নামে এক সর্দার ধরা পড়েছিলেন। ভান্সিটার্ট তার ফাঁসীর আদেশ দেন। অপর নেতাদের মধ্যে লালসিং ধরা পড়লে কেউ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজী হয়নি। তীরবুলন সিংকে মেদিনীপুরে ধরে আনতে ও সুবলাসিংকে ঘটনাস্থলেই ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিতে নির্দেশ পেলেন নান সাহেব। এমনি করে ভান্সিটার্ট আশা করেছিলেন বছরের প্রথম দিকে অশান্তি অনেকটা প্রশমিত হবে; কিন্তু তাঁর সে আশা সফল হয়নি। (*History of Midnapore—N. N. Das, Vol. I*)

ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা অশান্তি দমন অসম্ভব দেখে কোম্পানী কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করল। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ (বাং সন ১১৭৬ সাল) "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" এর সময় দেশে একমুঠো খাদ্যের জন্য হাহাকার পড়ে যায়। এই সময় খাদ্য ও অর্থাদি সাহায্য করে কোম্পানী অনেককেই বশ করে দলে টানে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুআরি জন কার্টার ভান্সিটার্টকে নির্দেশ দেন তাদের দলে লোক নিয়োগ করবার জন্য দালাল নিয়োগ করতে। এই সময় জেলার লোকসংখ্যা ছিল ১২ লক্ষের কিছু কম। মেদিনীপুর ও জলেশ্বর থেকে প্রায় ৬৪৮০০ জন শক্ত সমর্থ ব্যক্তি বৃটিশের সৈন্যদলে নাম লেখায়। কোম্পানীর হয়ে লড়াই করবার জন্য এদের মহীশূর ও উত্তর ভারতের কয়েকটি স্থানে পাঠান হয়েছিল। এই মেদিনীপুরের

বীর সৈনিকগণ সেদিন বৃটিশের পক্ষে অস্ত্রধারণ করে অতুলনীয় বীরত্ব ও আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

এইরূপে কার্টার জেলার আভ্যন্তরিণ সমস্যার অনেকটা সমাধান করলেন ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের মারাঠা শক্তিকে প্রতিহত করবার জন্য তৈরী সৈন্যদলও পাওয়া গেল। ক্যাপ্টেন চার্লি মরগান, লেঃ নান, ফারগুসন, ভান্সিটার্ট, কার্টার প্রভৃতির অক্লান্ত চেষ্টা ও কৌশলে অশান্তি ও উৎপাতপূর্ণ জঙ্গল মহলগুলিতে বৃটিশ আধিপত্য অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত হোলো।

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কি লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন একি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে…।"—রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় অধ্যায়

বিপ্লবের সূচনা

"…বিপ্লব জিনিসটা কিছু আমোদের নয়, কিন্তু মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচানোর জন্য যুগে যুগে এটার প্রয়োজন হয়েছে…।"

—শহীদ প্রদ্যোৎকুমার।

একথা অনস্বীকার্য যে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচার ও শোষণমূলক শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতাই এদেশের আপামর জনসাধারণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ক্রমাগত অত্যাচার ও অবিচারের ইতিহাস পাঠ করলে বাংলার বিপ্লববাদের অন্তর্নিহিত কারণ অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। স্যার জর্জ কর্ণওয়াল লুই নামে এক ব্যক্তি তো স্পষ্টই বলেছেন—

"…দৃঢ়কণ্ঠে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, পৃথিবীর বুকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত এত দুর্নীতিপরায়ণ লুণ্ঠনকারী ও বিশ্বাসঘাতক সরকার আর কখনো শাসনকার্য চালায় নাই…।"

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব এক স্মারকলিপিতে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে জানান—

"…ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এতদ্দেশীয় কৃষক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ন্যায্য মূল্যের মাত্র এক-চতুর্থাংশ দিয়া বলপূর্বক মালপত্রাদি কাড়িয়া লইতেছে এবং বিলাত হইতে আমদানী মালপত্রাদি যাহার মূল্য মাত্র এক টাকা তাহা বলপূর্বক কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে পাঁচ টাকা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছে…।"

কোন কোন ঐতিহাসিক ক্লাইভের শাসনকালের সাত বৎসরকে 'তস্কর রাজত্ব' বলে অভিহিত করেছেন—

"…The state he founded and administered for seven years was nothing more than a robber state…".

(—*A Survey of Indian History.* *Page 246.*)

এমনকি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর', মহামারী ও প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের সময়ও কোম্পানীর রাজস্ব আদায় কম হয়নি। যে সময় দারুণ খাদ্যাভাবে দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুবরণ করে সেই সময়েই স্বৈরাচারী বিদেশী ইংরেজ কোম্পানীর 'কড়াচাপের' ফলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যায় বেড়ে। দেশে যখন এককণা খাদ্যশস্যের জন্য হাহাকার পড়ে যায়, দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি ঋতু পরিবর্তনের মতোই ঘুরে ফিরে আসে তখন দেখা যায় অত্যাচারী অর্থলোভী ইংরেজ বণিক নীলের উপর মুনাফা লুটছে…। বর্বর নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী যে-কোন সভ্যতার ধারক ও বাহক সভ্য মানব জাতির সবচেয়ে কলঙ্কময় ইতিহাসকেও লজ্জা দেবে চিরদিন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের কলেক্টার বাহাদুর এদেশীয় জমিদারদের অবস্থা সম্বন্ধে লিখলেন—

"…নীলাম ও খাসকরণ প্রথার ফলে বাংলার বহু বিখ্যাত জমিদার মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভিক্ষুকে পরিণত হইয়াছেন। বাংলার ভূমিপ্রথার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে সত্য কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোন দেশেই নামমাত্র এক আভ্যন্তরিণ আইনের বলে এত বড় অঘটন ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ রহিয়াছে…।"

(*India to-day'—Rajani Pam Dutta, Pp. 190-91*)

কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারমূলক এই অত্যাচার ও কুশাসনকে যে বিদেশীয়গণও ঠিক মনে প্রাণে সমর্থন করতে পারেনি—স্থানে স্থানে এরূপ মন্তব্যগুলিই তার প্রমাণ এবং এর মধ্যেই নিহিত আছে এদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বীজ। যা পরবর্তী কালে মহীরুহে পরিণত হয়ে যে ফলপ্রসব করেছিল তা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 'সিপাহী বিদ্রোহ'ই বৃটিশ কোম্পানীর সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান যা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার আগে কিন্তু বাংলার স্থানে স্থানে

বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক বিদ্রোহ ঘটে গেছে যদিও সেগুলি সংহত ছিল না...বা ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। তার কারণ সম্ভবতঃ এই ত্রুটিই—প্রথমতঃ কোম্পানীর কৌশলী কর্মতৎপরতা এবং কঠোর হস্তে বিপ্লব দমন, আর, দ্বিতীয়তঃ বিভেদমূলক অপপ্রচার। সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাব তো ছিলই।

যে বাংলায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জয়যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ সেই বাংলায় কোম্পানীর ক্ষমতা বিস্তারের প্রথম যুগে কোম্পানীকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হয়। এদেশের অধিবাসীরা তখন থেকেই বৃটিশ শক্তিকে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল মনেপ্রাণে। অনেক ক্ষেত্রে তারা এতো দূর অগ্রসর হতে পেরেছিল যে, কোম্পানীর শাসন বানচাল হবার উপক্রম হয়। কৌশলী ইংরেজ নিজেদের সেই ব্যর্থতার কথা বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি। পক্ষপাতদুষ্ট ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও সুকৌশলে আসল সত্যের অপলাপ করে অবজ্ঞাভরে সেই সব জাতীয় অভ্যুত্থানগুলির নাম দিয়েছিল 'চুয়াড় হাঙ্গামা', 'লায়েক বিদ্রোহ', 'সন্ন্যাসী হাঙ্গামা' বা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। আসলে মুঘল বাদশাহগণ কথিত 'বুঘলকপুর' বা 'বিদ্রোহের দেশ' এই বাংলায় কোম্পানীর আমলেও বহু বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, বিদেশী শাসন অবাধে চলতে পারেনি। ঐতিহাসিক সত্য হ'ল এই—

"...অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ইংরেজ ঐতিহাসিক বর্ণিত 'ডাকাতের দল' (?) নূতন শাসকদের বিপর্যস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, ফলে বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় ইংরেজ শাসন বানচাল হবার উপক্রম হয়। পিণ্ডারী, ঠগী, বর্গী প্রভৃতিরা নিছক দস্যু ছিল কিনা সন্দেহ। ওহাবী আন্দোলনও বিদেশীর হুমকিকে অস্বীকার করেছিল। বাংলার তীতু মিঞার নেতৃত্বে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুরের জনগণ এক ব্যাপক বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিলেন। এমনকি নীলকরদের বিরুদ্ধে

প্রজাবিদ্রোহও স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্য রচনা করেছে…।"
(*India Struggles for Freedom—H. N. Mukherjee*).

স্বার্থান্ধ ও ক্ষমতালোভী বিদেশী শাসকসম্প্রদায় লোকচক্ষে বিপ্লবীদের হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য বা দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতির মনোভাব তাদের প্রতি যাতে আকৃষ্ট না হয় সেজন্যই দস্যু বা ডাকাত আখ্যা দিয়ে বিকৃত করে প্রচার করেছিল তাদের মহৎ প্রচেষ্টার কাহিনীগুলিকে। তাই এই সব খণ্ড প্রচেষ্টাগুলি বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেনি। নির্বিচারে হত্যা করে, ফাঁসী দিয়ে, ঘুস দিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে, জালজুয়াচুরি ইত্যাদি ছলে-বলে-কৌশলে তাদের দমননীতি সাফল্যলাভ করেছিল। নববলদৃপ্ত উন্নত ইংরেজ জাতির গোলাবারুদ, অর্থসম্পদ, কামানবন্দুক আর বণিকসুলভ বুদ্ধির কাছে আমাদের তীর ধনুক, লাঠি আর তলোয়ার-সর্বস্ব অল্পশিক্ষিত সরল ধর্মভীরু জনগণ পেরে উঠল না। দেশের উপরের সমাজ তখনও জাগেনি। তাই ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপিত হতে পেরেছিল।

কোম্পানীর আনুগত্য মেদিনীপুর কোনদিনই একবাক্যে মেনে নেয়নি। অনেক কষ্ট, অনেক নির্যাতন সহ্য করেও এখানকার স্বাধীনচেতা অধিবাসিগণ বারে বারে বহু আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ব্যর্থও যে কম হয়েছে তা নয়; তবুও চরম সাফল্যের মধ্যে এই জেলার অবদান অনস্বীকার্য। মেদিনীপুরের শহীদগণ আজ জগৎপূজ্য। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান আছে মেদিনীপুরের। এখানে শাসনক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কোম্পানীকে যে পরিমাণ শক্তি ও অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল এমন আর কোথাও হয়নি। বহুবার তাদের দিগ্বিজয়ের রথ রুদ্ধগতি হয়ে অচল হয়ে পড়েছে এই অঞ্চলে।

যতদূর জানা গেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক আর উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই মেদিনীপুর অঞ্চলেই প্রথম ব্যাপক ও

সুপরিকল্পিত গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদার, পাইক ও সর্দারগণ একযোগে রুখে দাঁড়াল—অস্বীকার করতে চাইল :বিদেশীর স্বৈরাচারী শাসন ও স্বেচ্ছাচারকে। আমাদের এই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামই 'চুয়াড় বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। এর আগে অবশ্য ১৭৮৩ সালের জুলাই মাসে পাঞ্চেৎ পরগণার দক্ষিণে এক খণ্ড বিদ্রোহ হয়েছিল—কিন্তু তা তেমন প্রবলাকার ধারণ করতে পারেনি, অতি সহজেই দমন করেছিল বৃটিশ সেই অশান্তিকে। জিল নামে এক ইংরেজ ক্যাপ্‌টেন এই বিদ্রোহ দমনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। পলায়িত নেতাদের জন্য বগড়ীর কলেক্টার পুরস্কার ঘোষণা করলেন।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলেক্টার বাহাদুর কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্র বা যে কোনরূপ যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দিলেন।

ইতিহাসখ্যাত চুয়াড় বিদ্রোহ

(১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ)

এই আন্দোলনের কারণ সুস্পষ্ট। তখন কোম্পানীর ক্ষমতা বিস্তারের যুগ। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ প্রতাপশালী ও জনপ্রিয় রাজা বা জমিদারদিগকে বশে আনতে বৃটিশকে অনেক কৌশল ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনেক জমিদারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে তারা, অনেকের রাজ্য ইচ্ছামত যাকে তাকে বিলিয়ে দিয়ে বঞ্চিত করেছে প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে। অন্যায় ভাবে বেশী রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা তো ছিলই।

রামগড়, লালগড়, চিলকিগড়, চন্দ্রকোণা, ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, শিলদা প্রভৃতি স্থানের রাজাগণ ছিলেন স্বাধীন ও সঙ্গতিসম্পন্ন।

বৃটিশের আধিপত্য বিস্তারের পথে এই সব রাজাদের সঙ্গে বিরোধ বাধল কোম্পানীর কর্মচারীদের, আর তারই জন্ম এই অঞ্চলের নিরীহ প্রজারাও জড়িয়ে পড়ল বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে। ক্রমে এই সব ব্যক্তিরাই কোম্পানীর প্রবলতম জাত শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। ফিরিঙ্গী শাসনের এই বিরুদ্ধবাদী দলে যোগ দিল দেশের অশিক্ষিত অবুঝ, দরিদ্র চাষী ও মজুরের দল। দেশীয় রাজগণের স্বার্থরক্ষার সঙ্গে তাদের স্বার্থবোধও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। আলীবর্দীর ফৌজের বহু সৈন্যও এদের দলে যোগ দেয়, এরা সুশিক্ষিত ও সামরিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিল।

'চুয়াড়' বলে নির্দিষ্ট কোন জাতি ছিল না; এই দলে ছিল, লোধা, মাঝি, কুড়মী, বাগ্দী, ভঞ্জ, কোরা, কুরমালী ও মুণ্ডারী প্রভৃতি স্বাধীনচেতা বীর জাতিগণ আর অবজ্ঞাভরে বৃটিশ তাদেরই নাম দিয়েছিল 'চুয়াড়' অর্থাৎ 'অসভ্য', 'গোঁয়ার'। বলা বাহুল্য এককথায় দেশের সাধারণ কৃষক ও মজুর সম্প্রদায় সবাই যোগ দিয়েছিল এই আন্দোলনে। এদের বৃটিশের সঙ্গে যত না সংগ্রাম করতে হয়েছিল, বৃটিশের অনুগত ও অনুগৃহীত স্থানীয় দেশদ্রোহী ব্যক্তিদের সঙ্গে তার চেয়ে অনেক বেশী লড়তে হয়েছিল। অনেক সময় কোম্পানী এদের একটি দলের বিরুদ্ধে আর একটিকে লেলিয়ে দিয়ে বিভেদমূলক নীতিতে বেশ কিছুটা সাফল্যলাভও করেছিল। কিন্তু পরে তারা এই কৌশল বুঝতে পারে। পরে যোগ দেয় জমিদারদের চাকুরীরত পাইকগণও।

এরা প্রথমে সেই সব জমিদারদের সাহায্য করত যারা কোম্পানীর কোপদৃষ্টিতে পড়ে ধন-মান হারাতে বসেছিল। এইসব ভূস্বামীদেরও পাইক থাকত এবং বিপদের দিনে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করত প্রভুর ধনপ্রাণ রক্ষা করতে। সেইজন্য এই বিপ্লবীরাও সাহায্য পেতে লাগল স্থানীয় জনগণ ও ভূস্বামীদের। প্রয়োজন মত অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, নেতৃত্ব ও প্রয়োজন মত পরামর্শ দিয়ে পাইকদের

শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন এইসব জমিদারগণ। পাইকদের সাফল্যের সঙ্গে যে তাদের স্বার্থও জড়িত এবং সেটা আর কিছুই নয় যে কোন উপায়ে বৃটিশ শক্তির গতিরোধ করা। এই জন্যই দেশের আপামর জনসাধারণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল; একযোগে অস্বীকার করতে চাইল বেনিয়া কোম্পানীর শাসনকে। প্রাণপণ চেষ্টায় এই মরিয়া জনশক্তি সাময়িক ভাবে বানচাল করে দিয়েছিল বিপক্ষের কূটকৌশল আর আধুনিক সমরসজ্জাকে···রুদ্ধগতি হবার উপক্রম তাদের জয়যাত্রার রথ। ইতিহাস এই গণঅভ্যুত্থানগুলিকে যেরূপেই চিত্রিত করুক আজকের নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে আমরা বুঝবো প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের ব্যাপক জন-জাগরণ দেখা দিয়েছিল এই অঞ্চলগুলিতে এটা অনস্বীকার্য সত্য।

ক্রমশঃ বিপ্লব ভীষণ আকার ধারণ করে এবং বগড়ীতে চুয়াড় নেতাগণ এমন বেপরোয়া হয়ে উঠল যে মনে হোতো তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন।

"···In Borgi the leaders of the Chuars continued to act as if they had been independent of any Government···" —*Hamilton's 'Hindusthan'*.

আরো কারণ ছিল; ছোট ছোট চাষী ও মজুরদের সবাই ছিল স্থানীয় ভূস্বামীদের অনুগৃহীত। রাজাদের আপদে বিপদে সাহায্য করবার জন্য পাইকগণ জমি পেত ও বংশানুক্রমে তা ভোগ করত। ১৭৯৩-৯৪ সালে এমনি অনেক জমি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারী লোক নিযুক্ত হয়। এই সরকারী পাইকদের কোন ক্ষমতাই ছিল না, এদের অনেকে আবার চুয়াড়দের সঙ্গে যোগ দেয়। আরো আগে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস ফৌজদারের পদ বিলুপ্ত করে আইন করেন। ফলে অনেক জনপ্রিয় ফৌজদারের ক্ষমতা ও প্রভাব বিনষ্ট হয়। এই

ফৌজদার ও তার লোকজন সবাই প্রতিশোধের আশায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে স্বেচ্ছায় যোগদান করে। চুয়াড় বিপ্লবীদের একটা বিরাট অংশই ছিল এই সব অধিকারচ্যুত চাষী, পাইক ও ফৌজদার বা তাদের দলের লোকজন।

এই বিদ্রোহ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে রামগড়ে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণগড়ের রাণী শ্রীমনী ও তার লোকজনের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাতে কলেক্টর সাহেব রাণীর রাজ্য বাজেয়াপ্ত করলেন। কারণ এই বছরই জুলাই মাসের গোলযোগে ধৃত বংশীরাম বক্সী ও সীতারাম খানের পক্ষ অবলম্বন করায় কোম্পানীর কর্মচারীরা রাণীর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল না। অনুরোধ উপরোধের পর কয়েকখানা গ্রামমাত্র রাণীকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল।

ওদিকে রাজস্ব বাকীর দায়ে পাঞ্চেৎ জমিদারের জমিদারী নিলামে বিক্রি করা হোলো, ক্রয় করলেন নীলাম্বর মিত্র। অনেক আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হওয়ায় জমিদার ক্রেতাকে জমিদারীর দখল দিতে চাইলেন না—প্রজারা ছিল তারই পক্ষে। এই নিয়েও এক গোলযোগ আরম্ভ হ'ল। চুয়াড় বিদ্রোহে একে একে মিলিত হল রাইপুর, অম্বিকানগর, মানভূম, বরাভূম, সাহাপুর, বাহাদুরপুর, ব্রাহ্মণভূম, ভঞ্জভূম, রামগড়, লালগড়, নয়াবসান, বগড়ী প্রভৃতি জমিদারীর সর্দারদের শক্তি। রাইপুরের রাজ্যচ্যুত রাজা দুর্জন সিংহ ছিলেন এদের নেতা। একবার তিনি ধরা পড়লে সাক্ষীর অভাবে তাকে ছেড়ে দিতে হয়।

দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে আত্মগোপন করে থাকত এই সব বিদ্রোহীরা। গেরিলা রণনীতিতে অভিজ্ঞ এই সব সর্দারগণ বার বার আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের। দেখতে দেখতে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল এই বিপ্লবের আগুন। মেদিনীপুর শহরের খুব কাছাকাছি পর্যন্ত

তারা অগ্রসর হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট ও মুষ্টিমেয় কয়েকজন গোরা সৈন্য অসহায়। এই বিপুল জনশক্তির সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক এবং শিশুরা সবাই কোলাঘাট হয়ে কলকাতা পালাবার জন্য কাঁসাই নদীর উপর নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করল। —*History of Midnapore by N. N. Das.*

মেদিনীপুরের নিকটবর্তী তিনটি স্থান ছিল বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি—শালবনী, বাহাদুরপুর ও কর্ণগড়। বিদ্রোহ দমনের জন্য ফুলকপুর, বলরামপুর ও আনন্দপুর প্রভৃতি স্থানে সৈন্য প্রেরিত হল। পাইকদের অত্যাচার থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করবার অজুহাতে নাড়াজোলেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল। (মিঃ ইনহফ্‌কে লেখা লেফটেন্যান্ট গ্রেগরির চিঠি, ২৮।২।১৭৯৮)

এই বছরই (১৭৯৮ খ্রীঃ) জুলাই মাসে প্রায় ১৫০০ পাইক রাইপুরে সরকারী সিপাহীদের আক্রমণ করে এবং বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়। বৃটিশের আশ্রিত দুইজন রায়তসহ একজন জমাদার, চারজন সিপাহী ও নয়জন বরকন্দাজকে তারা হত্যা করে। একজন ইউরোপীয়ান অফিসারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরিত হ'ল কিন্তু স্থানীয় জমিদার ও অধিবাসিগণ তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করল না। তারা সৈন্যসামন্ত ও লোকজনদের খাদ্যদ্রব্যাদি বা কোনরূপ সংবাদাদি দিতে অস্বীকার করে। অনেকে আবার বিদ্রোহী পাইকদের পক্ষেই যোগ দেয়। দুর্জন সিং প্রায় ১৫০০০ লোক নিয়ে রাইপুর আক্রমণ করে ও বৃটিশ অধিকৃত তিনটি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়।

বিদ্রোহের অপর নেতা গোবর্ধন দলপতির নেতৃত্বে প্রায় চার-শত দেশী পাইক চন্দ্রকোণার নিকট হাজির হয় এই সময়েই। সেপ্টেম্বর মাসে আবার নয়াবসান অঞ্চলেও গোলযোগ দেখা দিল।

কোম্পানীর লোকজন সাড়ম্বরে প্রচার করতে লাগল পাইকদের

অত্যাচারে নিরীহ গ্রামবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই উপদ্রুত এলাকাগুলোতে বৃটিশ সৈন্য পাঠান হোলো। কেননা বিদ্রোহীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রায়তগণ খাজনা বন্ধ করলে কোম্পানীর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কিন্তু এই অপপ্রচারেও চুয়াড়দের কোন ক্ষতি হোলো না। তারা দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি আদায়ের কাজে যথেষ্ট সফল হয়েছিল। এই বছর ডিসেম্বর মাসে (১৭৯৮) তারা এতো বেপরোয়া হয়ে উঠল যে ৭।৮টি গ্রাম তারা অধিকার করল, বেশ কিছু সংখ্যক কোম্পানী অধিকৃত গ্রাম লুঠ করল ও প্রকাশ্য দিবালোকে মাঠের ফসল কেটে নিতে লাগল। এই সুযোগে দেশীয় রায়তগণ বলল অশান্তি দূর করতে না পারলে তারা কোম্পানীকে রাজস্ব দিতে পারবে না। কাশীজোড়ায় একজন হাবিলদারের অধীনে কয়েকজন গোরা সিপাহী পাঠান হোলো। তমলুকের বাসুদেবপুরেও গোলমালের জন্য শান্তি রক্ষার্থে সিপাহী পাঠান হয়। (*History of Midnapore by N. N. Das*).

বরাহভূমের রাজার পাটরানীর পুত্র অর্থাৎ রাজ্যের উত্তরাধিকারী ইংরেজের চাতুরীতে রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে মেদিনীপুরের কারাগারে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। এর নাম লক্ষ্মণ সিংহ। তার পুত্র গঙ্গানারায়ণ পিতার উপর এই অবিচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রথমেই চক্রান্তের মূল নায়ক ইংরেজ আশ্রিত মাধব চন্দ্র সিংহকে হত্যা করলেন ও ইংরেজ বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। পরে ইনি শিলদা ও কুইলাপাল প্রভৃতি স্থানের চুয়াড় নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চাকলাতোড়ে প্রবলভাবে যুদ্ধ করলেন কিন্তু এই যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। পরে ইনি বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন সিংভূমের খরসোয়ার দুর্গ আক্রমণকালে।

পরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন গোবর্ধন দলপতি। বাঁশগড়, ডোমগড় ও বীরমাদলের চুয়াড়গণ একত্র মিলিত হয়ে ইংরেজ ঘাঁটি

শিলদাগড় আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে যে সকল চুয়াড় নিহত হয় ইন্দকুড়ির মাটিতে তাদের সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

বিদেশী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এরা অপরাধী,—আইন অমান্যকারী বুনোজাত।

"It may be that the incurious of the Chuars in this year were owing to those periodical outbursts of of crime and lawlessness to which all wild tribes are subject." (—*Churas Rebellion W. Price.*)

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বিপ্লব প্রবলাকার ধারণ করে। একসময় বিদ্রোহীদের সাহস এতোই বেড়ে গিয়েছিল যে, মেদিনীপুর শহরের অতি নিকটবর্তী গ্রাম তারা লুঠ করেছে। দুইশত জন পাইক কাঁসাই নদীর তীর পর্যন্ত এসে তহশীলদার রঘুনাথ পালকে জোর করে তাদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করেছে।

বৃটিশের আশ্রিত দেশী সিপাহীরাও অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এমনি এক ঘটনা ঘটে লালগড়ে। পাইকদের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য সেখানে যে সিপাহীদের পাঠান হয় তারা হতভাগ্য রায়তদের উপরই অত্যাচার আরম্ভ করে। ("Some Sepoys were sent to repel the Pykes at Lalgarh who instead of fighting the Pykes plundered the unfortunate Ryots."—*W. Price*)

আরো আছে। কোম্পানীর আশ্রিত বাহাদুরপুরের কৃষ্ণভঞ্জকে বিদ্রোহীরা টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলে ও সেখানে খাজনা আদায়ের জন্য আর কেউ যেতে চাইল না। ফলে একজন হাবিলদারের সঙ্গে মাত্র জনপাঁচেক গোরা সৈন্য সেখানে পাঠান হ'ল।

এমনকি বৃটিশের প্রধান ঘাঁটি মেদিনীপুর শহরও সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না। নারায়ণগড় থেকে ঘোষপুর পর্যন্ত সর্বত্র বিদ্রোহীরা

ছেয়ে ফেলেছিল। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও বৃটিশ অধিকৃত মোট ১২৪টি গ্রাম তারা লুণ্ঠন করে। তহশীলদারদের অফিস শালবনীও লুণ্ঠিত হয়। দিনের বেলায় কোম্পানীর একজন কর্মচারী নিহত হ'ল এবং গুরুতর প্রহারের ফলে আর একজন পরে মারা গেল। কোম্পানীর রাজস্ব ও রসদের যোগান বন্ধ করবার জন্য গ্রামের গোলাগুলিতে অগ্নিসংযোগ করতে লাগল বিদ্রোহীরা। কোম্পানীর অনুগত রায়তগণ আনন্দপুরে পলায়ন করলে পাইকগণ সেখানে গিয়ে আনন্দপুর লুণ্ঠন করে।

এইরূপে কোম্পানীর অর্থ ও জনবলকে অগ্রাহ্য করে গ্রামের পর গ্রাম তারা লুণ্ঠন করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলগুলি। বৃটিশ কর্মচারী বা তাদের অনুগৃহীত ব্যক্তিদের হত্যা করেছে নির্মম-ভাবে। মুষ্টিমেয় সৈন্য আর সীমিত শক্তি নিয়ে তাঁদের অনুগত ও আশ্রিত প্রজাদের রক্ষা করতে পারেনি বৃটিশ কোম্পানী। জনৈক বিদেশী ঐতিহাসিকের ভাষায় সেই অসহায় অবস্থার চিত্র—

"Every attempt to establish an efficient police having failed, if became necessary to concentrate the powers usually vested in different local authorities in one functionary under the immediate direction of the Governor General which was accordingly done and Mr. Oakley was deputed to execute the arduous Commission."—*Mr. Hamilton.*

[একটি যথার্থ পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় স্থানীয় কর্তৃ-পক্ষের উপর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ও গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে মিঃ ওকলেকে [illegible] ব্যবস্থা নিতে ভার দেওয়া হয়েছে।]

এবং গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশ অনুযায়ী এই বিপ্লব দমন-করবার জন্য ওরা যে কৌশল ও নীতি গ্রহণ করল তা হচ্ছে—

"The first measure adopted by this gentleman

(Mr. Oakley) was to ascertain the principal ring-leaders of the 'Banditti' in order that they might be specifically exclued from the general omnesty to be offered to the great majority of the Chuars. The next was to deprive them to their accustomed supplies of food to encourage a spirit of active co-operation among the inhabitants and generally to diminish the terror which the cruelty of the Chuars and impressed on the neighbouring villagers and cultivators."—

Hamilton's 'Hindusthan.'

[এই ভদ্রলোক (মিঃ ওকলে) প্রথমে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তা হ'ল বিদ্রোহের নেতাদের ধরার চেষ্টা ও তাদের জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রচার, পরে তাদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করা ও সাহায্যকারী গ্রামবাসীদের নিরুৎসাহ করা ও তাদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করে চুয়াড়দের নিষ্ঠুরতাকে বন্ধ করা ও চুয়াড়দের বিরুদ্ধে পাশাপাশি গ্রামবাসীদের ও কৃষকদের প্রভাবিত করা।]

কিন্তু পাইকদের এই আপ্রাণ চেষ্টাও শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হ'ল, কোম্পানীর কর্মচারীদের অক্লান্ত চেষ্টা ও সুচিন্তিত কৌশলে বগড়ী, ব্রাহ্মণভূম, আনন্দপুর, ক্ষীরপাই, জলহরি, শালবনী, কর্ণগড় ও ঘোষপুর প্রভৃতি স্থানের অশান্তি অনেকাংশে প্রশমিত হ'লেও একেবারে যে শেষ হয়েছিল তা বলা চলে না। এই বিদ্রোহে যারা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হ'ল দুর্জন সিংহ (রাইপুর), রাণী-শ্রীমনী (কর্ণগড়), গোবর্ধন দলপতি (প্রথমে শিলদা পরে বগড়ী), লালসিংহ (বরাহভূম), চুনীলাল খাঁন্ (নাড়াজোল), কনক সিংহ (বগড়ী), নরনারায়ণ বক্সী (কর্ণগড়) প্রভৃতি। কর্ণগড়ের রাণী শ্রীমনীর জীবনের শেষদিনগুলি কেটেছিল বৃটিশ কারাগারে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে দেশে অনেকটা শান্তি ফিরে এল।

রায়তগণ নিজ নিজ জমিদারীতে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করল। জঙ্গলমহলকে ভেঙ্গে তার কতকাংশ বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত করবার প্রস্তাব করল কোম্পানী। উত্তরের বগড়ী অঞ্চলের কতকাংশ বর্ধমান থেকে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হল—বিদ্রোহ দমনের সুবিধা হবে মনে করে। ধৃত নেতাদের দেওয়া হ'ল পাইকারী হারে কারাবাস ও মৃত্যুদণ্ড। রাজশক্তি সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের মনে একটা ভীতি জাগাবার জন্য অনেক নেতাকে প্রকাশ্য ময়দানেই বিনা বিচারে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল।

এমনি করে দেশের প্রথম গণজাগরণ এবং দেশের জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার অপমৃত্যু হ'ল অস্ত্রশস্ত্র সুষ্ঠু সংগঠন ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে। তা না হ'লে কোম্পানীর ক্ষমতা বিস্তারের প্রথম যুগে এমন শক্তি তার ছিল না যার বলে এই বিস্তৃত জঙ্গলমহলগুলিতে এত বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজেদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। (এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য বৃটিশ নিজেদের প্রয়োজনে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের খেজুরীতে এদেশের প্রথম ডাকঘর স্থাপন করে ও ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে খেজুরী থেকে চাঁদপালঘাট পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসানো হয়।)

'চুয়াড় বিদ্রোহ' সাময়িক ভাবে প্রশমিত হ'লেও এর জের চলেছিল বেশ কিছুদিন ধরে। পলায়িত নেতাগণ আত্মগোপন করে থাকতেন এবং সময় ও সুযোগ বুঝে প্রায়ই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেন। এরকম আর একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টা হয়েছিল বগড়ীতে, যার ঐতিহাসিক নাম 'নায়ক' বা 'লায়েক বিদ্রোহ'। আসলে কিন্তু এগুলি পৃথক পৃথক কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। 'চুয়াড় বিদ্রোহ' শেষ হতে না হতেই উত্তরাঞ্চলের এক বিস্তৃত অংশে আবার গোল-যোগ আরম্ভ হোলো।

এযুগে জেলার অন্যান্য অংশও শান্ত ছিল না। দক্ষিণ পূর্বাংশে

রূপনারায়ণের অববাহিকা অঞ্চলে এক বিস্তৃততর স্থানে বেশ সুপরিকল্পিত বিদ্রোহ হয়ে গেছে অনেক বার। সিরাজদ্দৌল্লার সিংহাসনচ্যুতি ও মীরজাফর আলি খাঁর বাংলায় সুবেদারীর সময় থেকেই এর সূচনা এবং সক্রিয়তার শেষ লায়েক বা নায়েক বিদ্রোহের সময়ে। মীরকাসিম আলির সময়েও এখানকার অবস্থা অশান্ত ছিল এবং এমনকি "সেদিনের যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কোম্পানিরই পরাজয় হয়েছিল।" (—'গড়জঙ্গলের কাহিনী'—পৃঃ ১০৯ খগেন্দ্রনাথ মিত্র।)

কিন্তু একদিকে কোম্পানীর পরাক্রম অপরদিকে দেশীয় ব্যক্তিগণের শত্রুতার ফলে দেবেশ্বর, সূর্যপণ্ডিত, মহেশ্বর, তারা নায়েক প্রভৃতি অক্লান্তকর্মী স্বাধীনতাকামী বীরগণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। চোয়াড়ের ছেলে মীর আলিও কম বীরত্ব দেখান নি। মেদিনীপুরে এই সময় থেকেই খাজনা লুঠ, কলেক্টর সাহেবকে প্রহার, কোম্পানীর কর্মচারীদের উপর আক্রমণ ইত্যাদি বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ আরম্ভ হয়। এখানকার ভূস্বামিগণ এই সকল সংঘর্ষে কামান বন্দুকও ব্যবহার করেছিলেন; অদ্ভুত ছিল তাদের সংগঠন-শক্তি। নবাবের নৌবহর ও কোম্পানীর ফৌজ ভুবনপুরের যুদ্ধে একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়ে। রূপাগড়, ফাঁসুড়ের খাল প্রভৃতি অঞ্চল ছিল এই সব নেতৃবৃন্দের প্রধান কর্মকেন্দ্র। (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গড়জঙ্গলের কাহিন' দ্রষ্টব্য।) ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে খেজুরীর নাবিকগণ বিদ্রোহী হয় ও ওয়েনহাম নামক জাহাজের ক্যাপটেন সাহেবকে বন্দী করে রাখে।

নায়ক বা লায়েক বিদ্রোহ

(১৮০৬ খ্রীঃ)

এর আগে দেশীয় জমিদার বা ছোট ছোট রাজাগণ নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেতনভুক পাইক বা লাঠিয়াল রাখতেন,

এরা শাসনকার্যে, শান্তিরক্ষায় ও রাজার আপদে বিপদে রাজাকে সাহায্য করত এবং তার বিনিময়ে নির্দিষ্ট বেতন বা জমি বংশানুক্রমে ভোগ করত। এই সম্প্রদায় ছিল বেশ শক্তিশালী ও রাজন্যবর্গের বিশেষ অনুগত।

চুয়াড় বিদ্রোহের পর এরূপ পাইক বা লাঠিয়াল রাখা নিষিদ্ধ হল কারণ কোম্পানীর কর্মচারীরা বুঝেছিলেন ঐসব লোকজনই হচ্ছে জমিদারদের সামরিক শক্তির উৎস। এই সময় অনেকের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তার ফলে এই সম্প্রদায়ের অনেকে বেকার হয়ে পড়ে। জীবিকার্জনের পথ বন্ধ হওয়ায় অসন্তুষ্ট এই লাঠিয়াল ও পাইকগণ হয়ে উঠল একেবারে মরিয়া।

উত্তরের বগড়ী অঞ্চলেই এই বিদ্রোহের সূচনা দেখা দেয়। বগড়ীর শেষ স্বাধীন রাজা যাদব সিংহের মৃত্যুর পর কোম্পানী তার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করে এবং নিজেরা এজেন্টের দ্বারা রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করে কিন্তু প্রজাগণ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করল—তারা জানিয়ে দিল রাজবংশের কাউকে ছাড়া তারা এক পয়সাও খাজনা দেবে না। বহু চেষ্টায় কিছুতেই প্রজাদের বশে আনতে না পেরে অগত্যা দীর্ঘ সাত বৎসর পরে কোম্পানী ছত্রসিংহকে বগড়ীর রাজসনন্দ দান করল (জুলাই, ১৭৯৭)। কিন্তু এর পরেও রাজস্ব বাকী পড়ায় পুনরায় বগড়ী রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এই হ'ল এই অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্রোহের পটভূমিকা। এখন থেকেই কোম্পানীর উপর এখানকার অধিবাসীদের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে, এই অসন্তোষই ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ আকার আত্মপ্রকাশ করে।

একবার বগড়ীরাজ হরিপুরের নিকট এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন, ময়ূরভঞ্জের রাজাও তার সঙ্গে যোগ দেন। সিমলাপালের রাজাও বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন, তাই হ্যামিলটন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ পেলেন তাকে করে বন্দী বিচারের জন্য পাঠিয়ে দিতে।

এই বিদ্রোহেও দেশস্থ বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক অংশগ্রহণ করে। এদের প্রধান ঘাঁটি ছিল গড়বেতা শহরের পশ্চিমে শীলাবতীর তীরের দুর্গম অরণ্যাঞ্চল, যা এখন গণগণির ডাঙ্গা নামে বিখ্যাত। প্রথমদিকে এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন অচল সিংহ—পরবর্তিকালে ভোন্দা বিশা।

"....there was a conflagration in the Bogri Pargana in 1806 under the leadership of Achal Singh who ravaged the district as far as the Bogri Paragana."

—*History of Midnapore by N. N. Das.*

এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য সভ্য ইংরেজ যে নীচতা ও বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিল যা শুনলে স্তম্ভিত হতে হয়। প্রথমে প্রচুর অর্থ ও জমিদারীর লোভ দেখিয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ছত্র-সিংহকে বশীভূত করে এবং তাঁরই সাহায্যে অচলসিংহকে আমন্ত্রণ করে এনে অতর্কিতে বন্দী করে। অনেকে বলেন ছত্রসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করে অচলকে ধরিয়ে দেন। সে যাহোক সেইদিনই বিনা বিচারে ইংরেজ শিবিরে অচলসিংহের ফাঁসী হয়। এই সময় তার সহকর্মী আরো প্রায় সতর জন নেতা ধরা পড়লে তাদেরও ফাঁসী দেওয়া হয় বা কাউকে জীবন্ত পুঁতে দেওয়া হয়। এই নেতাদের মধ্যে বাতাসা সিং, সোনা, ময়না, ধনা, ডমন, আনন্দ, নোহার ও বংশীসর্দার প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেখানে সোনা সর্দারকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয় তা আজও 'সোনাগাড়া' এবং ময়না সর্দারকে যেখানে প্রকাশ্যে টুকরা টুকরা করে কাটা হয়েছিল তা আজও 'ময়না কাটা' নামে পরিচিত।

অন্যান্য সর্দারগণ গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করলেন। পরে এদের মধ্যে যুগল ও কিশোর নামে আরো দুইজন ধরা পড়েন ও চন্দ্রকোণার নিকটবর্তী কোন স্থানে এদের ফাঁসী দেওয়া হয় (ফাঁসীডাঙ্গা)।

পরে কোম্পানী রাজা ছত্রসিংহের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করে ও তাকে রাজ্যচ্যুত এবং বন্দী করে।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী মিঃ হেনরী ওকবাই ও মিঃ চার্লস্ রিচার্ড বারওয়েল নামে দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে প্রায় তিনশ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি দল বগড়ীর শান্তিরক্ষার্থে প্রেরণ করে। মধ্যবগড়ীর এক বিস্তৃত ক্ষেত্রে তারা শিবির স্থাপন করে—বর্তমানে স্থানটির নাম সাহেবডাঙ্গা। নেতাদের ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়। কিছু দিনের মধ্যে অশান্তি অনেকটা প্রশমিত হ'ল।

অল্পদিনের মধ্যেই ভোন্দা বিশার নেতৃত্বে বিদ্রোহী নায়কগণ আবার জেগে উঠল। ক্ষমতায় কুলাচ্ছে না দেখে কৌশলের আশ্রয় নিল চতুর ইংরেজ। যে ছত্রসিংহ একদিন বৃটিশের কূট-কৌশলে বিশ্বাস করে অচলসিংকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল, তাকেই এবার নিমন্ত্রণ করে শিবিরে ডেকে এনে অতর্কিতে বন্দী করল ইংরেজ সেনাপতি। অতঃপর তাঁকে হুগলীর জেলে প্রেরণ করা হোলো এবং বার্ষিক বৃত্তি ধার্য হ'ল (প্রতিমাসে ৫০০ টাকা হিসাবে কিস্তিতে) ৬০০০ টাকা রাজ্যের কোন কোন অংশ থেকে তাঁর অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হোলো। এই আদেশের ভাষাটি পড়লেই বোঝা যাবে কূট-কৌশলী বৃটিশের আসল মনোভাবের কথা—

To

The High Character and Prosperous

Raja Chutter Singh.

Under instruction from the Supreme Council you are requred to resign forth with the Jogeer of Turf Behala a part of Parganah Bogree which you had obtained through the intervention of Mr. Short; Secondly—you are instructed further to take your abode either in the town of Hooghly or in that of

Midnapore or any other place which may be equally distant from those places and that of Parganah Bogree. Should you agree to the two foregoing conditions an anmunity of Rs. 6000 per annum shall be allowed to you in lieu of your said Jageer which you are thus required to resign, relinquish and that you shall receive the amount in cash either from the collector or Magistrate under whose jurisdictian you are to reside in future, by instalment of Rs 500 per mensem …And though it is known that you have no son still on your demise a moiety of the above annuity be allowed to the person of your family whom you may select as your successor, and if you still resist and do not forthwith execute the agreement, under the order of Government and in default there of not only your Jageer shall be reverted to and resumed by Government, but that you shall not be entitled to any pension or annuity. You are required to reply this parwanah without delay and mention the place which you select for your future residence.

Dated the 11th April 1817.

[সুপ্রিম কাউন্সিলের নির্দেশানুযায়ী তোমাকে বগড়ী পরগণার তরফ্ ভিলার অধিকার ছাড়তে হবে, দ্বিতীয়তঃ বগড়ীর বাসস্থান ছেড়ে তোমাকে হুগলী বা মেদিনীপুর শহরে কিংবা সমদূরত্বের কোনস্থানে বসবাস করতে হবে। এই শর্তে রাজী হ'লে তোমার জায়গীরের পরিবর্তে মেদিনীপুরের বা যে অঞ্চলে বসবাস করে সেখানকার কলেক্টর মহাশয়ের নিকট থেকে মাসিক পাঁচশত টাকা হিসাবে বার্ষিক ছয় হাজার টাকা বৃত্তি পেতে পারবে এবং যেহেতু তোমার কোন পুত্র নাই

সেজন্য তোমার পর তোমার পরিবারে কাউকে বা তোমার মনোনীত উত্তরাধিকারীকেও ঐ বৃত্তি দেওয়া হবে। এতে রাজী নাহ'লে বৃত্তি নামঞ্জুর হবে ও তোমার জায়গীর সরকারে বাজেয়প্ত হবে। অবিলম্বে এই পরোয়ানার উত্তর ও কোথায় তুমি বাস করতে মনস্থ করলে তা জানাতে হবে।]

কি সুকৌশল ষড়যন্ত্র, রাজাকে দেশ থেকে সরাতেই হবে, তার জন্য অন্যায় আবদার, লোভ দেখানো, ভয় দেখানো কোন কিছুই বাদ যায়নি ঐ আদেশ পত্রটিতে। কিছুদিন পরে ২২শে জুলাই (১৮১৭ খ্রীঃ) কোম্পানীর কাউন্সিলের জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের ভাইস প্রেসিডেণ্টও এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে হুকুমজারী করেন—

"Under these circumstances the Vice President in council has learnt with much satisfaction that Raja Chutter Singh has signified his entire acquisence in the liberal terms which the commissioners were authorised to offer to his voluntarily executed, translations of which are included in Mr. Barwell's letter of the 24th ult. Raja Chutter Singh has resigned all rights, title and interest in the jageer which he held in the Parganah of Bogree and has agreed never to return to the parganah but to reside at Hooghly or in some situation equally distant from the Parganah on condition. First, that he will receive from Government during his life a pension of 6000 rupees per annum payable in monthly instalments of 500 rupees, and secondly, that on his death a moiety of that pension be continued during the life of any member of his family whom he, the Rajah may choose to select."

(Pargraph 10)

[কাউন্সিলের সহ-সভাপতি আনন্দের সঙ্গে জানতে পারলেন যে রাজা ছত্র সিংহের প্রতি প্রদত্ত কাউন্সিলারদের উদার শর্তাদিতে সম্মত হয়ে রাজা স্বেচ্ছায় জমিদারির সমস্ত অধিকার ত্যাগ করলেন ও পুনরায় বগড়ী ফিরবেন না এবং হুগলীতে বসবাস করবেন বলে সম্মত হয়েছেন, তাই তাকে মাসে ৫০০ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করা হ'ল এবং এই বৃত্তি তার বংশের যে কেউ বেঁচে থাকবে বা রাজা যাকে মনোনীতি করবেন তাকেই দেওয়া হবে।]

প্রয়োজনমত কথা দিয়ে কার্য সিদ্ধি করে পরে সেই কথা রাখবার মত সভ্য ইংরেজ কোম্পানী ছিল না। তাই ছত্রসিংহের এই বৃত্তি তার মৃত্যুর পর কমতে কমতে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

সে যাই হোক রাজা ছত্রসিংহকে হুগলীর জেলে রাখা হোলো ও তিনি মাসিক ৫০০ টাকা হিসাবে বৃত্তি পেতে লাগলেন ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল থেকে। রাজার উপর এই অন্যায় আচরণের জন্য আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল নায়কগণ। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন দুর্ধর্ষ বীর বিশ্বনাথ নায়ক, ইতিহাসে যিনি ভোন্দা বিশা নামে খ্যাত। বহু চেষ্টা করেও কোম্পানীর লোকজন তাকে ধরতে পারল না। তিনি অতর্কিতে আক্রমণ করে কোম্পানীর ক্ষতি করছিলেন। প্রজাগণ রাজস্ব দিতে সম্মত হোলো না; তদুপরি বিশ্বনাথের ভয় তো ছিলই। কাজেই যে-কোন উপায়েই হোক বিশুকে বন্দী করতেই হবে। এবার দেখা দিল হীন চক্রান্তকারীদের আসল রূপ। জেলে রাজা ছত্রসিংহের উপর দুর্ব্যবহার হ'তে দেখে রাজভক্ত প্রজারা দুঃখিত হতে লাগল। ছত্রসিংহ অপুত্রক থাকায় তার চন্দ্রমোহন ও মনোমোহন নামে দুই দৌহিত্র ছত্রসিংহের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হলেন। কোম্পানী এই সুযোগ ছাড়ল না। তারা প্রচার করল বগড়ীর যে কেহ জীবিত অথবা মৃত ভোন্দা বিশাকে ধরে দিতে পারলেই রাজাকে মুক্তি দেওয়া হবে। এই সঙ্গে

প্রচুর পুরস্কারের লোভ তো ছিলই। কাজেই রাজার দুই দৌহিত্র বিশার খোঁজে বের হলেন।

বহু অনুসন্ধানের পর একদিন মঙ্গলাপোতার নিকট অতর্কিতে নায়ক নেতাকে আক্রমণ ক'রে তাঁরা হত্যা করলেন। তার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে কোম্পানীর কাছ থেকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ও বৃটিশানুগত্যের সার্টিফিকেট পান এবং তারই সাহায্যে মাতামহের মুক্তি ক্রয় করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ছয়দফা শর্তসম্বলিত এক বণ্ড ন প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে দিয়ে রাজা ছত্রসিংহ মুক্তি পান। নিম্নে উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রের নকল দেওয়া হইল—

॥ প্রতিজ্ঞাপত্র ॥

(শীলমোহর)

মহামহিম শ্রীযুক্ত মেজষ্টর সাহেব বরাবরেষু

জেলা—হুগলী

লিখিতং শ্রীরাজা ছত্রসিংহ, সাং বগড়ী, মঙ্গলাপোতা।

কস্য একরার নামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে হুজুর হইতে হুকুম ছাদের হইয়াছে যে আমি যদি নিচের দফাওয়ারীর মতাবেক কবুল করিয়া একরার লিখিয়া দিই তবে আমি বগড়ী যাইতে এজাজত পাইব।

এমতে আমি এ সকল দফা কবুল করিয়া আপন স্বেচ্ছাপূর্বক একরার লিখিয়া দিতেছি।

১। শ্রীযুক্ত খৈলী সাহেব কিংবা মেদিনীপুরের মেজেষ্টর সাহেবের হুকুম ব্যতিরেকে যে সকল লোক আমার নিকট আছে সেই সেওয়ার অন্য লোককে রাখিব না। এবং সেখানে গেলেও দোসরা কোন লোককে খানদানে দাখিল করিব না।

২। বগড়ী পরগণার ঘাটওয়াল সীমানদার ও লায়েক লোক

যাহারা পূর্ব হইতে পুলিশের কাছে আছে তাহাদের মিলাপ রাখিব না।

৩। যদি আমার খানদানের কোন কিছু হরবকত করে তাহার জবাব আমার জিম্বা।

৪। যে জায়গা আমার দখলে ছিল তাহার উপর দস্ত আন্দাজ হইবে না।

৫। যে সময় মেদিনীপুর মেজিস্টর সাহেব কিংবা হুজুরের হুকুম হয় তৎক্ষণাৎ হুগলী আসিব।

৬। উপরে লিখিত ঐ সকল দফা কবুল করিয়া একরার লিখিয়া দিলাম। যদি উহার বরখেলাপ আমলে আসি তবে আমার পেনসন মকুফ হইবে।

ইতি—

—ইসাদ— বাং সন ১২৩০ সাল, ৭ই কার্তিক

শ্রীকালিপ্রসাদ মিত্র শ্রীরাজা ছত্রসিংহ,

সাং চন্দ্রকোণা। সাং বগড়ী, মঙ্গলাপোতা।

শ্রীসুলিম পেয়াদা

সাং বেশভারুই।

শ্রীবৈদ্যনাথ সিংহ

সাং বগড়ী, মঙ্গলাপোতা।

শ্রীএমাম বক্স পেয়াদা

সাং হুগলী।

কোম্পানীর কাউন্সিল রাজা ছত্রসিংহের কাছে এরূপ প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখিয়ে নিল এবং এটি পেয়ে হুগলীর ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার ছত্রসিংহের কারামুক্তির আদেশ দিয়ে লিখলেন—(ফারসী থেকে বঙ্গানুবাদ, সেকালের ভাষায়)।

হুকুমনামা, আদালত ফৌজদারী, জেলা-হুগলী রাজা ছত্রসিংহ বনাম শেখ মুঙ্গুল নাজির আদালত ফৌজদারী।

যেহেতু আনিসান কাউন্সলের সাহেবানের হুকুম অনুসারে উক্ত রাজা ছত্রসিংহ ছয় দফা একরার লিখিত করিয়া দাখিল করিলেক ঐ জন্য বর্তমান সনের ২২শে অক্টোবর তারিখের লিখিত রোবকারির বিবরণ দৃষ্টে তোমাকে লেখা যায় যে, ঐ রাজা ছত্রসিংহকে বগড়ী পরগণা জায়নের হুকুম দিবে।

ইতি—

মকাবিলা
সৈয়দ আবদুল আজিজ
আমলা, ফৌজদারী
ও
নিয়াজ আহম্মদ।

সন ১৮২৩।২২শে অক্টোবর
সকল মতাবক আসল
আপ্তাবুদ্দিন আহম্মদ
সেরেস্তাদার, ফৌজদারী।

রাজা ছত্রসিংহ মুক্তি পেয়ে বগড়ীতে ফিরে এলেন ও কোম্পানীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৃত্তি ভোগ করতে লাগলেন। অথচ এঁরই পিতা যাদবসিংহ বৃটিশের কোপে পড়ে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে নিজের বিষ অঙ্গুরীয় চুম্বন করে আত্মহত্যা করেছিলেন (১৭৭২ খ্রীঃ), তবুও নতি স্বীকার করেননি। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে ছত্রসিংহ মারা যান। তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী মনোমোহনের জন্য ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অগস্ট তারিখ থেকে তিন হাজার টাকা বৃত্তি মঞ্জুর হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তিনি মারা গেলে ঐ বৃত্তি সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হ্যারিসন সাহেবের অনুরোধক্রমে ভারত সরকার ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের আদেশানুযায়ী ঐ বংশের জগজ্জীবন সিংহকে পনর শত টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তিনি মারা গেলে ঐ বৃত্তি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

আবার নায়েক বিদ্রোহের প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এই বিদ্রোহ অনেকাংশে প্রশমিত হয়েছিল। পাইক ও লায়েক নেতাদের জমি জায়গা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল—উদ্দেশ্য তারা শান্তভাবে জীবনযাপন করতে পারে। আরো কিছুদিন পরে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইকদের রেজেষ্ট্রী তালিকাভুক্ত করা হোলো। এই সব তালিকাভুক্ত পাইকদের বিশেষ সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হ'তে লাগল, ফলে এদের মধ্যেই দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে এদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি হ্রাস পেল।

কিন্তু এর পরেও ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় প্রবল ভাবে দেখা দিল কৃষক আন্দোলন; যার জের চলল বেশ কয়েক বছর ধরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার জমিদারগণ একযোগে ধর্মঘট করেছিলেন ও ইংরেজকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেছিলেন। দুর্দান্ত প্রকৃতির তৎকালীন কলেক্টর রবার্ট হাউস্‌টোন কয়েকটি জমিদারী নিলাম করান, কিন্তু মাত্র এক টাকা মূল্যেও মূল্যবান সম্পত্তি ক্রয় করার ক্রেতা পাওয়া যায়নি। তারও পূর্বে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে হিজলীর মলঙ্গীরা ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বহুবার বিক্ষোভ জানিয়েছে।

"বৃটিশগণ বিদেশী বলিয়াই যে আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত তাহা নয়, আমাদের হৃদয়ে স্থান করিতে পারে নাই তাহাও নহে। তাঁহারা আমাদের মঙ্গল ও স্বার্থরক্ষার ভাণ করিয়াছেন ও নিজদেশের মুষ্টিমেয় ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্য ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের সুখশান্তি জলাঞ্জলি দিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম শিষ্ট ইংরেজ এই সকল অবিচার সম্বন্ধে নীরব থাকিবে এবং আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য আমাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্তু আমাদের ক্ষতে ক্ষার ক্ষেপ করায় সে শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে…।"

—দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

কোম্পানী শাসনের প্রথম দিকে বাংলার স্থানে স্থানে একদল সর্বত্যাগী ফকির দেশবাসীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। এঁরা সত্যই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন কিনা সন্দেহ। এমনও হ'তে পারে একদল দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে দেশের মধ্যে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাচ্ছিলেন। সত্যিই সেই সময় কতকগুলি লোকের মধ্যে ধারণা জন্মে যে, আধ্যাত্মিক সাধনাই শক্তি সঞ্চয়ের প্রকৃষ্ট উপায়। জাতির ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা দূর করতে শারীরিক ও মানসিক শক্তিসঞ্চয় করতে হবে সর্বাগ্রে। তাই একশ্রেণীর লোক সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে মানসিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন; তাদের কাছে দেশমাতৃকার সেবাই ছিল শ্রেষ্ঠ ব্রত ও সাধনা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাঁরা দেশমায়ের পূজার মন্ত্র প্রচার করতে আরম্ভ করেন। এদের এই সংগঠন ক্রমে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যে 'সন্তান' সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে তাও এই ইংগিত বহন করে। সাহিত্য সম্রাট এদের উন্নত চরিত্র, সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা ও সুপরিকল্পিত সংগঠনের প্রশংসা করেছেন।

যাই হোক এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠে পূর্ববঙ্গে, বিশেষতঃ ঢাকায় এবং এঁরা এতোই সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে অতি অল্পদিনের জন্য হ'লেও ঢাকায় বিদেশী শক্তিকে প্রতিহত ক'রে বিদেশী শাসনমুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা।

মেদিনীপুর জেলায় এঁরা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই অঞ্চলে। মারাঠাদের ন্যায় এঁরাও গেরিলা রণনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন; তাই এঁদের আক্রমণে কোম্পানীর কর্মচারিগণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এঁদের দমন করতে কোম্পানীর প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছিল।

এর পর শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র জঙ্গল মহলকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা হোলো এবং এরই কিছু অংশ নিয়ে মানভূম ও সিংভূম জেলার সৃষ্টি হোলো বিহারে। দক্ষিণাংশের কিছু অঞ্চল উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত করায় স্থানীয় শক্তি অনেকাংশে দুর্বল হ'য়ে পড়ল ও ভূস্বামীদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরল।

কিন্তু এতো চেষ্টা করেও কোম্পানী অশান্তি দূর করতে পারল না। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে ১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিম অংশের সাঁওতালগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদেশী কোম্পানীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ এইসব 'অসভ্য' আদিম অবুঝ মানুষ-গুলোর উত্থানকে দমন করবার জন্য সেদিন সভ্য ইংরেজ যে পৈশাচিকতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিল ইতিহাসের রক্তাক্ত পৃষ্ঠাই তার সাক্ষী হয়ে আছে।

এমনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলন এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে এবং বলা বাহুল্য ধনজন সম্পদে সমৃদ্ধ বিদেশী শক্তির এবং দেশীয় বহু ব্যক্তির প্রতিকূলতায় তা ব্যর্থও হয়ে গেছে বহুবার।

সে যাই হোক অগণিত বৃটিশ কর্মচারীর অক্লান্ত চেষ্টায় ও কৌশলে মেদিনীপুর অঞ্চলের সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব হোলো ও কোম্পানীর শাসন অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত হোলো বলা চলে। বিরুদ্ধ-বাদী শক্তিগুলি নানা কারণে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে এবং প্রতিপক্ষের প্রবল পরাক্রম, অর্থ ও লোকবলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তি হারায়। ফলে কোম্পানীর শাসন কায়েম হয়ে বসতে পেরেছিল। অন্যদিকে নূতন শাসক সম্প্রদায় তখন দেশের মধ্যে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বা বিদেশী শাসন স্বাধীনচেতা দেশবাসীদের অনেকটা সহ্য হয়ে এসেছে; কেননা বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কোম্পানী তখন একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী। তার বিরুদ্ধে মাথা তুলবার মত সাহস ও শক্তি তখন এদেশের কারো নেই।

———

চতুর্থ অধ্যায়

নব যুগের সূচনা

অবশেষে এল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেই ব্যাপক গণজাগরণ—ঐতিহাসিকের ভাষায় যার নাম 'সিপাহী বিদ্রোহ।' শুধু বাংলার কেন সমগ্র দেশের হিন্দু মুসলমান একযোগে রুখে দাঁড়াল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মেদিনীপুরে তখন একদল রাজপুত সৈন্য শান্তি রক্ষার্থে নিযুক্ত ছিল এবং তাদের কম্যাণ্ডার ছিলেন ফস্টার সাহেব। এক তেওয়ারী ব্রাহ্মণ সুবাদার প্রথমে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ও অনেক দেশীয় ব্যক্তিও যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কোম্পানী জানত এটি এমন একটি অঞ্চল যেখানে "....which matched a civilion revolt with the 'Sepoy Rising. which stirred an answering chord in the Pyke country"—(*Census Report.*)

সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাইকদের দেশ মেদিনীপুরের জন্য কোম্পানী ভীত হোলো। সকল সিপাহীকে ডেকে জোর করে ধানদুর্বা ছুঁয়ে শপথ করাতে বাধ্য করা হোলো যাতে তারা বিদ্রোহে যোগদান না করে। এই সময়ে ফস্টার সাহেবের আশ্রিতা এক রাজপুত রমণী তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাই এই সময়ে মেদিনীপুর অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল।

এতদিন দেশের নিম্নস্তরের লোকেরাই যে শুধু বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি চালিয়ে যাচ্ছিল তা নয়; স্বার্থের খাতিরে দেশের জমিদার ও ভূস্বামিগণও তাতে যথেষ্ট ইন্ধন যোগাচ্ছিলেন। তবে সেগুলি প্রায় সবই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনের তাগিদে। দেশকে ফিরিঙ্গী শাসনের কবলমুক্ত করবার মত বৃহত্তর লক্ষ্য তখনও স্থির হয়নি। প্রকৃত দেশাত্মবোধ তখনো অঙ্কুরিত হয়নি, আর সবচেয়ে বড় কথা দেশের শীর্ষস্থানীয় মানুষেরা তখনও জাগেনি।

ক্রমে ক্রমে ইওরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার অনুপ্রবেশে আমাদের দেশে নব্যশিক্ষিত এক নূতন সম্প্রদায় গড়ে উঠল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই একটা জাতীয় চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হ'তে আরম্ভ করে—সমাজের সর্বস্তরে। অপেক্ষাকৃত সভ্য ও আলোক-প্রাপ্ত শিক্ষিত দেশবাসীর আত্মাভিমান ও সম্মানে আঘাত দিল পরাধীনতার গ্লানি। অসংখ্য নিরীহ দেশবাসীর উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ও প্রভুত্বের জুলুম দেখে জন্ম নিল এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া, জেগে উঠতে আরম্ভ করল লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত জনগণ তাদের অলস তন্দ্রা ছেড়ে। বাইরের জগতের শিক্ষাদীক্ষার আলোয় সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তারা দেখতে আরম্ভ করল নিজেকে—দেশকে আর জাতিকে।

জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ

এদেশে এত বড় পরিবর্তনের কথা বলতে গেলে একটু গোড়া থেকেই বলতে হয়।

বাংলায় এই ভাবধারার প্রথম ভাবুক হিসেবে দুইজন প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাপুরুষের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। এরা হলেন নবগোপাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসু। নবগোপাল মিত্র সম্বন্ধে 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় মনোমোহন বসু বলেছেন—"অত্র বঙ্গদেশে বাবু নবগোপাল মিত্রই সেই জাতীয়ভাবের প্রথম ভাবুক ও প্রধান প্রচলন কর্তা।"

('জাতীয়তার নবজন্ম'—যোগেশ চন্দ্র বাগল।)

সত্যিই নবগোপালের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মসূচীর মধ্যে একটা জাতীয় চিন্তা ফুটে উঠত, তিনি মনে প্রাণে সদাসর্বদা জাতীয় অগ্রগতির কথা চিন্তা করে সময় কাটাতেন। তাই তার প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত পত্রিকার নাম—'জাতীয় পত্রিকা', প্রেসের নাম 'জাতীয় প্রেস', বিদ্যালয়ের নামের আগেও 'জাতীয়', ব্যায়ামশালার নাম 'ন্যাশনাল জিমনাসিয়াম', সভার নাম 'ন্যাশনাল সোসাইটি',

মেলার নাম 'জাতীয় মেলা' (হিন্দু মেলা) এবং এমনকি সার্কাসের নাম 'ন্যাশনাল সার্কাস।' সকল কথার আগে 'জাতীয়' কথাটির উপর তিনি জোর দিতেন। তাই তার নামই হয়ে গিয়েছিল 'ন্যাশনাল মিত্র।' হিন্দু মেলার অধিবেশনগুলিকে সার্থক করবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। এ সম্বন্ধে তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্য—"...Babu Nabagopal has left off eating, sleeping and is roaring from door to door." সত্যিই জাতীয় কাজে তার আহার নিদ্রা চলে গিয়েছিল।

রাজনারায়ণকে 'Grandfather of Indian Nationalism' বলা হোতো। কেননা "কলকাতায় যখন দেবেন্দ্রনাথ ও নবগোপাল স্বাদেশিক জাতীয় সভা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন তার কিছুকাল পূর্বেই এই মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' বা 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সম্পাদনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে এক নূতন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।" ("ঠাকুর পরিবারের স্বদেশ চর্চা ও হিন্দু মেলা"—স্বপনপ্রসন্ন রায় রচিত প্রবন্ধ, মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫।)

রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর থেকে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভায় ইংরাজী অনুবাদ করতেন তিনি। মহর্ষির নেতৃত্বে 'হিন্দু হিতার্থী' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি তার পরিদর্শক নিযুক্ত হন। মহর্ষির সঙ্গে রাজনারায়ণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং এমনকি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে ধর্মীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করবার পূর্বে এই রাজনারায়ণকেই তিনি জাতীয় আন্দোলনের কর্মসূচী পরিচালনার ভার দেন। তার লেখায়—"আমার ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে অবসর লইবার জন্য আমাকে বড়ই ব্যস্ত করিতেছে। এ সময়ে যদি তোমাকে পাই তবে ইহা হইতে আর অধিক আহ্লাদ

আমার কিছুতেই নাই। তোমার মুখের প্রতিই আমি চাহিয়া রহিয়াছি।" (দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী)।

এই রাজনারায়ণ বসুই দেবেন্দ্রনাথের পরবর্তিকালে ঠাকুর বাড়ীকে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতেন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে রাজনারায়ণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়ে মেদিনীপুরের সরকারী জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হ'য়ে এলেন। জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা (Society for the Promotion of the National Glory) ছাড়াও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সুরা নিবারণী সভা' ও একটি বালিকা বিদ্যালয়। তিনি জেলা স্কুল ও ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্গঠন করেন বলা চলে।

রাজনারায়ণের জাতীয় 'গৌরব সম্পাদনী সভার' প্রতিষ্ঠার পর সভার আদর্শ সারা দেশে প্রচারের প্রচেষ্টা চলতে লাগল। দেবেন্দ্রনাথ ও নবগোপালও এজন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই সময়ই রাজনারায়ণের উদ্যোগে ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে গগনেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নবগোপাল প্রভৃতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বাদেশিকদের সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উভয় সভারই আদর্শ প্রায় একই—"...a society for the promotion of national feelings among the educated natives of Bengal."

১৭৮৭ শকাব্দের চৈত্রসংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এবং ঐ বছরই National Paper-এ মুদ্রিত হ'য়ে এই পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ এই খসড়াতে নিম্নোক্ত বিষয়-গুলির উপর জোর দেন—

[এক] স্বদেশীয় ব্যায়াম, সংগীত ও চিকিৎসা বিদ্যার প্রচলন।

[দুই] ইংরাজী শিক্ষারম্ভের পূর্বেই বালকবালিকাদের যথোপযুক্ত ভাবে মাতৃভাষা শিক্ষা দান।

[তিন] সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অনুশীলন।

[চার] বাংলা শব্দ ব্যবহার দ্বারা কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সাধন।

[পাঁচ] বাংলা ভাষায় পরস্পরকে পত্র লেখা, বাঙ্গালীর সভাতে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান।

[ছয়] সুরাপানাদি বিদেশী অনিষ্টকর প্রথা এদেশে যাতে প্রচলিত না হয় তার উপায় অবলম্বন।

[সাত] হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করে সমাজসংস্কার কার্য সম্পাদন।

[আট] ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি স্বদেশীয় সুপ্রথা সকল রক্ষা।

[নয়] নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন।

[দশ] বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার সম্পূর্ণ বর্জন ও দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় প্রভৃতি।

এই বহুমুখী কর্মসূচীর সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "এই খসড়াটি থেকে আমরা জানিতে পারি···পূর্বে একজন বঙ্গ সন্তানের (রাজনারায়ণ) মনে স্বাজাত্যবোধ কিরূপ পূর্ণাঙ্গ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।" মূল ইংরাজী বক্তব্যের শেষাংশ ছিল—

"It would be unreasonable to expect that such a society would prove to be the cause of every National feeling. Its main object would be to promote and foster national feelings which would lead to the formation of a national character and thereby to the eventual promotion of the prosperity of the Nation."

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৭৮৭ শকাব্দ)

[এই সব সোসাইটির দ্বারাই জাতীয়বোধ জাগরিত হবে এটা আশা করা ঠিক হবে না, তবে এর প্রধান উদ্দেশ্য হোলো জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ যাতে করে জাতীয় চরিত্র গঠনে ও উন্নতিতে সহায়ক হয়।]

রাজনারায়ণের এই খসড়ার মতোই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ

'National Paper'-এ 'A National Gathering' নামে একটি আবেদন ছাপা হয়। তার বক্তব্যও একই—

"The interests of our country however demand .. that we should…try to see each and every one our countrymen in that spirit of brotherly love…unless we try to do so, all our attempts to move in a National cause or carry any National cause into a successful issue must abortive."

[দেশেব স্বার্থের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হ'লে আমাদের দেখতে হবে যাতে প্রতিটি দেশবাসীর মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠে ; এটা না হ'লে জাতীয় কারণে আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।]

এই আবেদনে সাড়া দিয়েই চৈত্র সংক্রান্তির দিনে National Gathering বা জাতীয় সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল—যার পরবর্তী নাম হিন্দুমেলা। দেবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থ সাহায্যে নবগোপাল, রাজনারায়ণ ও ঠাকুর বাড়ীর অন্যান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় চিৎপুরের রাজা নরসিংহ চন্দ্র বাহাদুরের বাগানে বঙ্গাব্দ ১২৭৩-এর চৈত্র সংক্রান্তির দিন এই মেলা প্রথম বসে (১২ই এপ্রিল, ১৮৬৭ খ্রীঃ)। এই সভার প্রথম সম্পাদক মহর্ষির ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও সহ-সম্পাদক মনোনীত হন নবগোপাল মিত্র।

রাজনারায়ণের জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার প্রভাবেই এঁরা হিন্দু মেলার প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই মেলার উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে গণেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"জাতিকে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বাবলম্বী করিয়া তোলা এই মেলার একমাত্র উদ্দেশ্য।" এই মেলায় দেশীয় শিল্পজাত, কৃষিজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী হোতো, বিখ্যাত শিল্পী, লেখক ও ব্যায়াম বীরদের পুরস্কার দেওয়া হোতো। এই মেলার আর একটি

প্রধান আকর্ষণ ছিল মনোমোহন বসুর স্বদেশী বক্তৃতা। ইংরেজীর বদলে বাংলায় ভাষণ দিতেন বলে তাঁর কথা সর্বসাধারণের বোধগম্য হোতো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার প্রথম প্রচলন করেন রাজনারায়ণ বসু। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও মনোমোহন একজন প্রধান উৎসাহীরূপে যোগদান করেছিলেন ('ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি'—ললিত হাজরা, মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৫৫ দ্রষ্টব্য।)। রাজনারায়ণের অপর এক সহকর্মী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তার বক্তৃতার যথেষ্ট প্রশংসা করেন ও কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করে প্রাচীন হিন্দু রাজাদের কীর্তি কাহিনী সবিস্তারে প্রচার করতে আরম্ভ করেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অপর একটি সংস্থা যার নাম 'Patriot's Association'। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন রাজনারায়ণ ও জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন ঐ বছরই দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকুল্যে ও নবগোপালের সম্পাদনায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর বিখ্যাত 'National Paper'—ছাপা হোতো ইংরেজী ভাষায়।

যাই হোক অনতিকাল মধ্যেই মেদিনীপুরে জাতীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে অন্য দৃশ্যের অবতারণা সূচিত হোলো। রাজনারায়ণের কিছু পরে জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বোস এলেন জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক হয়ে। ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন তিনি। এইজন্যই জাতীয় ইতিহাস ও দেশবিদেশের বিভিন্ন বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর কথা তিনি ছাত্রদের বুঝাতেন; সেই সঙ্গে দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও আলোচনা করতেন। ফলে এখান থেকেই মেদিনীপুরের তরুণ ছাত্র সমাজের মনে জাতীয় চেতনার বীজ উপ্ত হোলো।

ওদিকে অপর একটি দলও একই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যাদের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। সংক্ষেপে সে ইতিহাসও আলোচনা করা যেতে পারে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গড়েন একটি সংস্থা, যার নাম 'জমিদার সভা'। বছর ছয়েক পরে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও গড়েন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি।' ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই দুটি প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হ'য়ে গড়ে উঠল 'British Indian Association.' এই সময়েই বোম্বাই-এ দাদাভাই নওরোজী প্রতিষ্ঠা করেন 'Bombay Association' ও পুনায় রাণাডে প্রতিষ্ঠা করেন 'সার্বজনিক সভা।' মাদ্রাজে Native Association-ও এই সময় আত্মপ্রকাশ করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে উঠে 'Indian Association.' ঐ বছরই সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে থাকে। দেশবাসী ঐ সকল সংস্থাকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করে।

এই উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করা হোলো (All India National Conference)। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা এতে যোগদান করেন। এই সভায় গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন, অস্ত্র আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ক্রমে ক্রমে এই সভার শক্তি বৃদ্ধি হ'তে থাকে এবং এর দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বসবে বলে স্থির হয়। এর শক্তি বৃদ্ধিতে বৃটিশ সচেতন হয়ে উঠে এবং ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন তখন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। এর প্রধান কারণ সুরেন্দ্রনাথের সংগঠন এতো শক্তিশালী হয়ে উঠছিল যে বৃটিশ মনে করল বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।

বাংলার বাইরে যারা জাতীয়তার ভাবধারা প্রচার করছিলেন তাঁরা বোম্বাই-এ প্রাক্তন সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়াস হিউমের উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য বোম্বাই-এ এক অধিবেশনের আয়োজন করেন। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন বাঙ্গালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এতে সারা

দেশের মাত্র সত্তর জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। আর সবয়েচে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'রাজবিদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের এই অধিবেশনে ডাকা হয়নি। এইরূপে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হোলো।

পরের বৎসর কংগ্রেস অধিবেশন হোলো কলকাতায়। বাংলার 'National Conference' ও বোম্বাই-এর কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শ-গত কোন বিরোধ না থাকায় উভয়ে মিলিত হ'য়ে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই কংগ্রেস ছিল আপোষপন্থী। ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ক্রমে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হোলো বৃটিশ, আর তার জন্য ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগল এই সংগঠনে। ডাফরিন প্রচার করলেন কংগ্রেস কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান—জাতীয় প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নয়। এই অপপ্রচারে ক্ষুব্ধ হয়ে একদল নেতা প্রত্যক্ষ আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অপর দল কংগ্রেসকে সত্যিই জনগণের প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হোলেন। এইরূপে কংগ্রেসে বামপন্থী ও দক্ষিণ পন্থী বা চরমপন্থী ও নরমপন্থী—এই দুই দলের আবির্ভাব হোলো (১৯০৭ খ্রীঃ)। তার আগেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগ। এর প্রথম সভাপতি মাননীয় আগা খাঁ। এ বিষয়ে অন্যতম উৎসাহী ছিলেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই তুরস্কের নবজাগরণে ভারতের মুসলিম সমাজে জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ হয়। ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 'আল হেলাল' নামে বিখ্যাত পত্রিকার সাহায্যে প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। ক্রমে মুসলিম সমাজও স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে।

গুপ্ত বিপ্লববাদ

অপর দিকে আর একটি ব্যাপক সংগঠন ও প্রস্তুতির কাজ চলছিল · যাদের সমস্ত সক্রিয়তাই বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের চোখের আড়ালে রাখতে চাইত তারা ; আর অতর্কিতে আক্রমণ করে প্রতিশোধ নিতে চাইত অত্যাচারের। এই সংগঠনের শক্তির প্রধান উৎস ছিল তরুণ সমাজ··· ; ছাত্র ও যুবনেতারাই ছিলেন তার ধারক ও বাহক। কিন্তু পরবর্তী কালে যে মৃত্যুর মহোৎসবে তাঁরা মেতেছিলেন তার জন্যও ছিল দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। বহুদিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ আর বহু অত্যাচারের দুঃসহ বেদনাই তাঁদের বৃটিশের জাত শত্রুতে পরিণত করেছিল।

যাই হোক এ যাবৎ এর ইতিহাস যা পাওয়া গেছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। এটা অনস্বীকার্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীরই দ্বিতীয়ার্ধে যখন কোম্পানীর শাসনের শুরু তখন থেকেই এই গুপ্ত বিপ্লববাদের অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল।

১৭৬৫-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সময়কার কথা, বর্ধমান জেলে তখন দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে রাজস্ব বাকীর দায়ে বন্দী থাকতে হয়েছে। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস থেকে ১৭৯৩ এর মার্চ মাস পর্যন্ত দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের গয়ারাম মিশ্র কারারুদ্ধ হয়ে আছেন; তার রাজস্ব বাকী ৩৯১৪৪ টাকা। ঘাটালের রেসিডেন্ট সাহেব নিরীহ চাষীদের উপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার করেছিল নির্লজ ইংরেজ তাতে লজ্জিত হয়েছিল। এই সব ঘটনা-গুলির সঙ্গে উত্তর কালের স্থানীয় রাজনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। ('স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়ার কথা'—তারানাথ রায়, মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১২৫৬)

এমনি দীর্ঘ দিনের অত্যাচার সহ্য করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল একটি প্রতিরোধ আন্দোলন। অমানুষিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ একদল লোক প্রতিশোধ স্পৃহায় হয়ে উঠেছিল অসহিষ্ণু, মারের বদলে

মার, লাঠির বদলে লাঠি ব্যবহার করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল একদল স্বাধীনচেতা নির্ভীক মানুষের চিত্ত। তারাই পরে সন্ত্রাস-বাদের কার্যাবলী চালিয়ে কাঁপিয়ে দিয়েছিল বৃটিশ সিংহের অন্তর। আগেই বলেছি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর গড়েছিলেন 'জমিদার সভা', ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও গড়েছিলেন 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এই দুটি মিলিত হয়ে গঠিত হোলো 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসন।' এই সকল প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, কিশোরী চাঁদ মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতি। আর একজন ইউরোপীয় ব্যক্তি এদের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন তিনি হলেন মিঃ টমসন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুআরি সোমবার শ্রীকৃষ্ণ সিং মহাশয়ের মাণিকতলার বাগান বাড়িতে রাজা সত্যচরণ ঘোষের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা বসল। এই সভায় মিঃ টমসন প্রস্তাব করেন যে, এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়া দরকার যাতে ইংরেজের অত্যাচার-ক্লিষ্টরা প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য অভারতীয় দরদীদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজকর্ম করতে পারে। তিনি আরো বললেন—

"........yours is one that can only be commenced by you and which future generation must carry on and perfect........".

অর্থাৎ 'তোমরা শুধু আরম্ভ করতে পারো, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তা চালিয়ে যাবে ও সম্পন্ন করবে নিশ্চয়ই।'

কয়েকদিন পরে ৬ই মার্চ সোমবার ৩১ নং ফৌজদারী বালা-খানায় গুপ্ত-মিত্র এণ্ড কোম্পানীর ডিস্পেন্সারির উপর তলায় 'বেঙ্গল-বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন' স্থাপিত হোলো। সভাপতি হরকুমার ঠাকুর ও প্রধান বক্তা মিঃ জর্জ টমসন উদাত্ত কণ্ঠে জ্বালাময়ী ভাষায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করলেন; সকলে পথ

খুঁজে পেল সম্মিলিত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবার। এ থেকেই বোঝা যায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কেবল মাত্র জনকয়েক উদ্‌ভ্রান্ত তরুণের দ্বারা সংগঠিত হয়নি, তাদের পিছনেও দীর্ঘদিনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সংগঠন ছিল।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং এই দলের কর্মসূচী যে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল তার অনেক প্রমাণ আমরা পাই। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন হলের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় বিচারপতি প্যাক্সটন নর্মান জনৈক মুসলমান আততায়ীর হাতে নিহত হন ('কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র'—যোগেশচন্দ্র বাগল)।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিশির কুমার ঘোষ 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এর সঙ্গে সহযোগিতা করেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রভৃতি। ইণ্ডিয়ান লীগ এদেশে ভারতীয়গণ কর্তৃক প্রতিনিধিমূলক শাসনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির উদ্যোগে 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু বাংলায় নয় ভারতের অন্যান্য অংশেও এমনি নানা প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই ('ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস'—সন্তোষ ঘোষ, মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৫৫)

এই সব আন্দোলন ও সংগঠনগুলির পাশে পাশে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির কার্যাবলী ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অগস্ট বাংলার যুব সমাজের উচ্চ শিক্ষার জন্য টাউন হলের এক সভায় একটি সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় স্থাপিত হয় 'Society for the Higher Training of young men.'

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে এলেন এবং তারই দুর্নীতিমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ অপরিহার্য হয়ে পড়ল। ১৯০১ সালে মেদিনীপুরেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হোলো। গুপ্ত বিপ্লববাদীরা বুঝল এইবার বুঝি যাবতীয় বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে সক্রিয় করে তুলবার সময় এসেছে, তাই শীঘ্রই শুরু হয়ে গেল আগুন জ্বালাবার প্রস্তুতির।

১৯০২ সালের শেষের দিকে এই গুপ্ত বিপ্লব সমিতির একটি কেন্দ্র স্থাপিত হোলো কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীট থানার নিকট ১০২ নং সাকুলার রোডের এক বাড়ীতে। এর প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ব্যারিস্টার পি. মিত্র ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি পরে নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন। ইনি পূর্বে বরোদার মহারাজার দেহরক্ষী ছিলেন। বাংলায় বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি কলকাতায় আসেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। এটিই অনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলায় গুপ্ত সমিতি স্থাপনের সূচনা ('ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস'—সুকুমার রায়।)

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই সমিতিতে যোগ দেন। মেদিনীপুর শহরের জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতির কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকে আহ্বান জানান। এই উদ্দেশ্যে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ও সত্যেন্দ্রনাথও এসে এঁদের সঙ্গে মিলিত হন। সত্যেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের ভাই অভয়াচরণের দ্বিতীয় পুত্র। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অরবিন্দ ও বারীন্দ্র রাজনারায়ণের দৌহিত্র। রাজনারায়ণের অবসর গ্রহণের পর অভয়াচরণ বসু জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। আর হেমচন্দ্র দাস কানুনগো পরে উন্নত ধরনের বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদির ব্যবহার শেখার জন্য প্যারিসে গিয়েছিলেন। মেদিনীপুর জমিদার-সমিতি তাঁর

খরচের জন্য দুই শত টাকা মঞ্জুর করে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হোতিলাল বর্মা ও সেনাপতি ভকত। এক রুশ সন্ত্রাসবাদীর নিকট থেকে তাঁরা বোমা তৈরীর কলাকৌশল শিক্ষা করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অগস্ট বাংলার যুব সমাজের উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় যে Society for the Higher Training of young men' স্থাপিত হয়েছিল তার আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ দল এবার থেকে সক্রিয় সংগঠনে নামল। শুরু হোলো এক ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি, যার প্রকাশ আমরা দেখতে পেলাম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে।

আঘাতের প্রথম সুযোগ– বঙ্গভঙ্গ

বাংলার ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করবার জন্য কার্জন এক কৌশল অবলম্বন করলেন। কেননা বাংলাই তখন ছিল বৃটিশ বিরুদ্ধবাদের কেন্দ্র ও প্রধান কর্মক্ষেত্র। এইজন্যই বুঝি বৃটিশ বাংলার নাম দিয়েছিল 'সমস্যার দেশ' এবং তার অনেক আগে মুঘল বাদশাহগণ বাংলাকে বলতেন, 'বুঘলকপুর' বা বিদ্রোহের দেশ।

যাই হোক কার্জনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির হোলো বাংলার পশ্চিমাংশ ও বিহার এবং উড়িষ্যার কিছুটা নিয়ে গঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ, আর উত্তর বাংলা ও আসামের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত হবে পূর্ববঙ্গ—ঢাকা হবে দ্বিতীয় অংশের রাজধানী, এতে নাকি শাসন কার্যের সুবিধা হবে কিন্তু বাংলার এই বিভাগ বাঙ্গালী মনেপ্রাণে মানল না। জাতীয় আন্দোলনের নেতারা বঙ্গভঙ্গ রোধ করবার জন্য বদ্ধ পরিকর হলেন। বাংলাই ছিল তখন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতিভূ ('স্বদেশের কথা'—অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। মেদিনীপুরের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অগস্ট মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে টাউন হলের (কলিকাতা) এক সভায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক

নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিলাতি দ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হোলো। দিকে দিকে সভাসমিতি হতে লাগল। নেতারা সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। কিন্তু শত সহস্র আবেদন নিবেদনে বৃটিশ কর্ণপাত করল না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই এক অফিসিয়াল গেজেটে বঙ্গভঙ্গকে নির্ধারিত সত্য ('a settled fact') বলে ঘোষণা করা হয় এবং দেশবাসীর তীব্র প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে ১৬ই অক্টোবর 'বঙ্গবিভাগের' সিদ্ধান্ত কার্যকরী হোলো।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে মেদিনীপুরে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে দিকে দিকে সভা সমিতি হতে লাগল এবং এই সব সভা সমিতিতে শান্তি রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দলে বহু যুবক নাম লেখালেন। মেদিনীপুরের চারটি স্থানে স্বদেশী আখড়া অর্থাৎ গুপ্ত সমিতির কেন্দ্র খোলা হোলো। এগুলি ছিল মীরবাজার (বসন্তমালতি), পাটনাবাজার, অলিগঞ্জ এবং পাহাড়িপুরে। রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা বের হতে লাগল। মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশ্য হোলো "The settled fact must be unsettled" অর্থাৎ নির্ধারিত সত্যকে বানচাল করতেই হবে।

মেদিনীপুরের তরুণদল জীবনপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিদ্রোহের আগুনে। আখড়াগুলিতে তরুণদল নৈতিক ও শারীরিক শিক্ষা পেতে লাগল। এ ছাড়া ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁরা জ্ঞানলাভ করতেন। স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন। অলিগঞ্জে তাঁতশালা ও বড়বাজারে 'ছাত্রভাণ্ডার' নামে একটি দোকান খোলা হোলো। এই সব দোকানে স্বদেশী দ্রব্যাদি পাওয়া যেত। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও এই উদ্দেশ্যে কর্মচঞ্চলতা দেখা গেল, নানা সংগঠন সক্রিয় হয়ে উঠল। এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিল 'স্বদেশী শিল্প প্রচার সমিতি' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বদেশী সংঘ।' মন্মথ নাথ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'দেশের কথা' পুস্তিকায় স্বদেশী-

দ্রব্যের তালিকা, প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম ও ঠিকানা লেখা থাকত। এই সব সংস্থাগুলির সহায়তায় এমন অনেক পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকে যার ফলে স্বদেশী শিল্প প্রচার বেশ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। শাসকশ্রেণীর অত্যাচার অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্ররোচনামূলক পুস্তিকা ও ইস্তাহার প্রভৃতি প্রকাশিত হতে আরম্ভ হোলো। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে কবিগুরু 'রাখীবন্ধনের' দিন বলে ঘোষণা করলেন ও এই উদ্দেশ্যে রচনা করলেন তার বিখ্যাত গান 'বাংলার মাটি বাংলার জল।' গ্রামে গ্রামে নানাপ্রকার ব্রত, উৎসব প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে বাংলার জনসাধারণ ঐক্য অনুভব করতে লাগল। সারা বাংলা ঐদিন 'অরন্ধন' পালন করল। ঐ দিনটিতে সবাই গান গাইতে গাইতে পরস্পরের হাতে পরিয়ে দিলেন রাখী; শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা সহ একই ভ্রাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন সকলে। কেননা এর আগে ৫ই অগস্ট মেদিনীপুরের পাবলিক লাইব্রেরী হলে মেদিনীপুরের নাগরিকগণ মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা বিদেশী দ্রব্য অশুদ্ধ ও অস্পৃশ্য বিধায় পরিত্যাগ করবেন। যতদিন বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রত্যাহৃত না হয় ততদিন তাঁরা কোন আমোদ প্রমোদে যোগদান করবেন না। ৩রা সেপ্টেম্বরের এক জনসভায় প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি খালি পায়ে যোগদান করলেন। আর একদিন সমগ্র মেদিনীপুরবাসী জগন্নাথ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করলেন যতদিন বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রত্যাহৃত না হবে ততদিন তারা বিদেশী চিনি, লবণ ও বস্ত্র স্পর্শ করবেন না।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলির পিছনে এখন থেকেই প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। স্বাধীনতার সংগ্রাম যাকে বলে তারও শুরু বলতে গেলে এখন থেকেই। এর সূচনা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অগস্ট টাউন হলের এক সভায়। ঐ দিন বাঙ্গালী সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করল এবং স্থির করল তিনটি কর্মসূচী—

(ক) বিদেশীদের সর্ববিষয়ে বর্জন,

(খ) স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার এবং

(গ) স্বদেশী শিক্ষার বিস্তার।

দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করবার স্বপ্ন এখন থেকেই সবাই ভাবতে শুরু করে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় দাদাভাই নওরোজী ভারতবাসীর মনের প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত 'স্বরাজ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিলেন আমরা কি চাই—। কলকাতায় কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে স্পষ্টভাষায় তিনি বললেন—

"...India's claim is comprised in one word 'Self-Government' or 'Swaraj' like that of United Kingdom or the colonies."

পরে অবশ্য এই 'স্বরাজ' এর ধারণা বদলেছে—কিন্তু এই প্রথম দেশবাসীর দাবী সোচ্চার হয়ে উঠে।

যাই হোক ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে বার্ষিক 'মাঘোৎসব'-এ এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হোলো মেদিনীপুর শহরের পুরাতন জেল প্রাঙ্গণে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিন্দু মেলার প্রবর্তনের সমসাময়িক কালে এরূপ মাঘোৎসবেরও ব্যবস্থা করা হোতো। বলা বাহুল্য এই দুটি সংগঠনেরই উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী প্রায় অভিন্ন এবং উদ্যোক্তাগণও অনেকাংশে একই।

জেলার সকল স্থান থেকে প্রচুর লোক এই কৃষিশিল্প প্রদর্শনীটি দেখতে আসে। মেলার প্রধান প্রবেশ পথে ক্ষুদিরাম (শহীদ ক্ষুদিরাম বোস) 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি ছোট পুস্তিকা বিলি করছিলেন। তখন এই জাতীয় পুস্তক বিতরণ করা বা পাঠ করা নিষিদ্ধ ছিল; কেননা এই সকল পুস্তিকার পাতায় পাতায় থাকতো আগুন ঝরানো ভাষা এবং বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্ররোচনা। এই জাতীয় পুস্তিকা তখন প্রায়ই প্রকাশিত হোতো। পরবর্তিকালে

যে সব রচনাগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোলো দেবদাস করণের 'মেদিনীবান্ধব', কলকাতায় প্রকাশিত 'মুক্তি কোন পথে ?' ও 'বর্তমান রণনীতি' প্রভৃতি। 'ভবানী মন্দির' নামে মাত্র ষোল পৃষ্ঠার একটি বই কম আলোড়ন তোলেনি। 'শক্তি সঞ্চয়' নামে একটি পুস্তিকা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এর আলোচ্য বিষয় বোমা তৈরীর কলাকৌশল, গুলি বারুদ প্রভৃতির ব্যবহার।

সে যাই হোক 'বন্দেমাতরম্' পুস্তিকা বিলি করবার সময় জনৈক সিপাহী ক্ষুদিরামকে বাধা দেয়, কিন্তু তিনি তার নাকে কয়েকটি ঘুসি মেরে পালিয়ে যান ; পরে অবশ্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়—কিন্তু নাবালক বলে বিচারে তিনি মুক্তি পান। তাকে মাল্যভূষিত করে গাড়ীতে নিয়ে শহরে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে 'ডিষ্ট্রিক্ট পলিটিক্যাল কনফারেন্স' হোলো। এতে উপস্থিত ছিলেন হেমচন্দ্র সেন, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, জে. চৌধুরী, ললিতমোহন ঘোষাল, মৌঃ দীন মহম্মদ, মৌঃ দিদার বক্স এবং অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। প্রায় দু'শ পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবক সত্যেনের নেতৃত্বে মীরবাজারে শোভাযাত্রা বের করলেন।

এতদিন গুপ্ত বিপ্লববাদের ধূমায়মান অগ্নি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল—এবার আরম্ভ হোলো তার শিখা বিস্তার। এই অগ্নিবৃষ্টি যে কী ভয়ংকর তা শীঘ্রই জানতে পারল শাসকশ্রেণী।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার ছিলেন লর্ড কার্জনের প্রধান সমর্থক—তাঁর উপর আন্দোলনকারীরা সন্তুষ্ট ছিলেন না ; এর আগেও তাকে হত্যা করবার চেষ্টা হয়েছিল। এবার স্থির হোলো মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের নিকট তার স্পেশাল ট্রেন বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬ই ডিসেম্বর (১৯০৭) নারায়ণগড়ে তাঁর গাড়ীর ইঞ্জিন উড়ে গেল—সৌভাগ্যক্রমে

এবারেও তিনি রক্ষা পেলেন। শত চেষ্টাতেও পুলিশ অপরাধীদের কোন সন্ধান করতে পারল না। মিঃ ডোনাল্ড ওয়েস্টন (তৎকালীন জেলা শাসক) মহাশয়ের নির্দেশে গোয়েন্দা বিভাগের রসময় মুখার্জী, লালমোহন মুখার্জী, লালমোহন গুহ এবং মৌঃ মজরুল হক আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। দোষী ব্যক্তিদের ধরিয়ে দেবার জন্য বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানী (B. N. R. বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ) পাঁচ হাজার টাকা এবং পুলিশের পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হোলো। কয়েকজন নাগপুরী কুলির মধ্যে সামান্য গোলমাল দেখা দেওয়ায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয় ও শাস্তি দেওয়া হয়। পরে আলিপুর বোমার মামলার তদন্ত-কালে প্রকাশ পায় কাজটি বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল—তখন কুলিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। দোষী-নির্দোষ সকলকেই শাস্তি দেবার যে দমননীতি বৃটিশ গ্রহণ করেছিল এটি তার চমৎকার উদাহরণ। এই নারায়ণগড়ের ব্যাপারে হেমচন্দ্র কানুনগো, প্রফুল্ল চাকী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার প্রভৃতি জড়িত ছিলেন।

মেদিনীপুরের যুবকগণ বিদেশী দ্রব্যাদি বর্জন আর স্বদেশী দ্রব্যাদি গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রতী সমিতি', 'সন্তান সম্প্রদায়', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হোলো। সারা বাংলায় স্বদেশী দ্রব্যের বাজারকে প্রসারিত করবার চেষ্টা হয়েছিল আগেই। এই উদ্দেশ্যে সরলাদেবী চৌধুরানী 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' খুললেন। 'বেঙ্গল স্টোর্স', 'ইণ্ডিয়ান স্টোর্স' নামে স্বদেশী দ্রব্যের দোকান খোলা হোলো। 'রাধাষ্টমী' ব্রত প্রচলন করলেন সরলা-দেবী। দেশের যুব সমাজের মনে জাগল এক বিরাট চাঞ্চল্য—তারা এবার সক্রিয় সংগ্রামের জন্য আরম্ভ করল এক ব্যাপক আয়োজন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-এর 'সন্ধ্যা', বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম্', মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি', ভূপেন্দ্র নাথ

দত্তের 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় দেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়ে নানা রচনা ও সংবাদাদি বেরিয়ে উৎসাহ যোগাতে লাগল। (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বিপিন চন্দ্র পাল বিলাতে থাকা কালে 'স্বরাজ্য' নাম দিয়ে একটি মাসিক কাগজ প্রকাশ করতেন। ঐ পত্রিকায় "Aetiology of the Bomb in Bengal" নামে প্রবন্ধ লেখায় বোম্বাই-এ নামা মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে তাঁর কারাদণ্ড হয়।)

বিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বদেশী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে টাউন হলের এক সভায় জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' বা 'National Council of Education' স্থাপিত হওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনতিবিলম্বে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও National Medical College স্থাপিত হোলো। গ্রামে ও শহরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাতে ভর্তি হতে লাগল। শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ ঘোষ। চারিদিকে যেন সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

এইরূপে এক দলের আন্দোলন যখন একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, আমাদের জাতীয় কংগ্রেস তখন আত্মকলহে লিপ্ত। ক্ষমতা ও মতবাদ নিয়ে তাঁদের মধ্যে রেষারেষি আরম্ভ হয়ে গেছে। শাসক সম্প্রদায়ের উস্কানীতে যে কংগ্রেসের জন্ম তার ক্ষমতা দেখে ভীত হতে আরম্ভ করে বৃটিশ এবং নানা কৌশলে তার ক্ষমতা সংকুচিত করতে সচেষ্ট হোলো তারা। 'কংগ্রেস শিক্ষিত ও ভদ্রলোকদের প্রতিষ্ঠান', 'কংগ্রেস কেবলমাত্র হিন্দুদের' ইত্যাদি ফাঁকা বুলি দিয়ে আমাদের বড় বড় জ্ঞানীগুণী নেতাদের বিভ্রান্ত করতে লাগল তারা—, মুসলমানদের তোয়াজ করে বৃটিশ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করল আমাদের জাতীয় জীবনে। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, শাসক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যমূলক এই অপপ্রচারের শিকার

হয়ে কংগ্রেসের আভ্যন্তরিণ কলহ বেড়ে যেতে লাগল দিনের পর দিন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের কলহ চরমে ওঠে—ফলে চরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করে। আভ্যন্তরিণ মতানৈক্যের জন্য কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর পর সুদীর্ঘ সময় বিপ্লবীদের সুসংগঠিত আন্দোলন ও কর্মপন্থা ঘিরে থাকে জাতীয় আন্দোলনের রঙ্গমঞ্চকে···। সন্ত্রাসবাদীদের কার্য-কলাপই তখন থেকে প্রাধান্য লাভ করে। তাই সে সময়ে সম্ভবতঃ এমন একটি সপ্তাহ ছিল না যার মধ্যে কোন না কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত না হয়েছে। এই 'অগ্নিযুগ' কংগ্রেসের আন্দোলনকে স্তিমিত করে রেখেছিল প্রায় ১৯৪২ এর অগস্ট বিপ্লব পর্যন্ত। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

অন্যদিকে দেশের এই জনজাগরণের দিনে শাসক-সম্প্রদায় নিশ্চিন্তে বসে ছিল না। তারাও যথেষ্ট কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গে শাসন ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে লাগল। প্রয়োজন মত আইন কানুন তৈরী করে সুবিধা মত তার প্রয়োগ করতে লাগল। ইতিমধ্যে ইংরেজদের মতের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়ে বৃটিশ রাজশক্তি হয়েছে আমাদের প্রতিভূ। সাত সমুদ্র পারের পার্লামেন্টে ভারতের শাসন কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়—ওখান থেকে আসে সব দক্ষ অফিসার, কূটনীতিক ও রাজকর্মচারী। তারা প্রবল প্রতাপে 'একটি অনুন্নত দেশের' শাসনকার্য চালিয়ে ছলে বলে কৌশলে বহু সম্পদ পাঠাতে লাগল মাতৃভূমিতে। কর্তৃপক্ষরা খুশী হয়ে ভাবল ভারতে তাদের শাসন অবশ্যই দৃঢ়ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অবশ্য যে সকল বৃটিশ কর্মচারী শাসনকার্যে সহায়তা করবার জন্য এদেশে আসতেন তাঁরা যে সবাই বিশেষ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন তা নয়। স্বয়ং ক্লাইবের বাল্যকালের কথা সবারই জানা,

মিথ্যাবাদী হলওয়েল সাহেব ওদেশেও ঘৃণার পাত্র ছিলেন। এ সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্রের একটি উদ্ধৃতি দিলে সহজেই বোঝা যাবে সেই সব সিভিলিয়ানদের দক্ষতা ও যোগ্যতার কথা। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুআরি দৈনিক সংবাদ প্রভাকর অপর একটি পত্রিকার সংবাদ উদ্ধৃতি করে লিখল—

"………'বিভাকর' পত্রে দৃষ্ট হইল ৩।৪।৫ বৎসর পর্যন্ত কর্ম করিতেছেন এমত কুড়ি জন সিবিল সম্প্রতি পরীক্ষিত হইয়া কি বাঙ্গালা কি উর্দ্দু উভয় ভাষার একবর্ণও বলিতে পারেন নাই। দুই একজন যে দুই একটি প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিলেন তাহাও কোন কার্যের নহে।" অতঃপর উক্ত পত্রিকার তীব্র বক্রোক্তি ও সমালোচনা—"এই সকল বিড়ালেরা বনে গিয়া ব্যাঘ্র হইয়া বসেন, ইহারা না এদেশের ভাষাই জানেন, না আচার ব্যবহারও জানেন। এই মহাপুরুষদিগের হস্তেই এই সুদীর্ঘ রাজ্যের সমস্ত প্রজার সুখ দুঃখ, মান অপমান এবং ধনপ্রাণ সমর্পিত হইয়াছে। যেমন নাপিতের ছেলের কামানো শিক্ষা, সেইরূপ বিলিতি ছেলেদের সিবিল শিক্ষা হইয়াছে। পরের মাথা কাটিয়া রক্ত পড়ুক, জ্বলিয়া মরুক, তাহাতে হানি কি, সেই প্রকার প্রজার সর্বনাশ হইলেও দৃক্‌পাত নাই, বালক সিবিলদিগের কর্ম্মের অনুশীলন হইলেই কর্তারা সন্তুষ্ট হয়েন।"

এই কারণেই বোধ হয় কয়েকদিন পরেই সংবাদ প্রভাকর মন্তব্য করেছিল 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব চিরস্থায়ী হইবে না।' (১১ই জানুআরি, সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।)

যাই হোক ঐ সমস্ত বিজ্ঞ সিভিলিয়ানগণের বুদ্ধি ও কৌশলে বৃটিশ শাসন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলতে লাগল। বৃটিশ বিরোধী এই আন্দোলনগুলি দমনের জন্য শাসন কর্তৃপক্ষ নিত্য নূতন আইন প্রণয়ন করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য

সচেষ্ট হলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকার বিরোধী সভা নিবারণ আইন প্রচারিত হোলো। এই আইনের বলে যত্র তত্র সভাসমিতি গঠন করা নিষিদ্ধ হয়; এমন কি এই সকল সভার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশও নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে যে কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য রাখা অপরাধ বলে গণ্য হোলো। ঐ বছরই সংবাদপত্রে অপরাধের প্রেরণা দেওয়া আইনের বলে পত্রপত্রিকাগুলির উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। একই বছরে আর একটি আইন পাশ হয়। তা হোলো ভারতীয় দণ্ডবিধি সংশোধন আইন। এর বলে জুরির পরিবর্তে তিন জন বিচারকের দ্বারা অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হোলো।

"The boat is sinking, but I shall see the sunrise..........."

—*Sister Nivedita.*

পঞ্চম অধ্যায়

আগুনের ফুলকি

বিপ্লবের প্রথম পর্যায়

(১৯০৮-২৮ খ্রীঃ)

"……তোমরা আমাকে রক্ত দাও,
আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব…।"

—নেতাজী।

গুপ্ত বিপ্লববাদের সংগঠন ও প্রস্তুতি একটা পূর্ণাঙ্গরূপ পরিগ্রহ করল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই। বৃটিশ রাজকর্মচারীদের দমনমূলক অত্যাচারের প্রতিশোধ স্পৃহায় একশ্রেণীর তরুণদলের রক্তে জাগল নেশা। তারা দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে নামল এক সর্বনাশা পথে।

কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড ছিলেন বিপ্লবীদের উপর কঠোর দমননীতির সমর্থক ও কয়েকটি রাজনৈতিক মামলায় আসামীদের কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। সুশীল নামে একজন স্কুল ছাত্রকে সামান্য অপরাধে তিনি বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়েছিলেন।* বিপ্লবীরা তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাকে

---

*জেল হাজতে সুশীলকে বেত্রাঘাত করা হয়। তার পরের দিন 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় কিংসফোর্ডকে উপহাস করে একটি মজার কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি এই—

"মাই নেম ইজ কিংস ফর্‌দ্‌
আই অ্যাম এ গ্রেট মর্‌দ্‌,
পেটের জ্বালায় আই কেম হিয়ার,
ইন দিস নেটিভ ভারত এম্পায়ার,
মাই গুড লাক এণ্ড ফেট,
করে দিয়েছে ম্যাজিষ্ট্রেট,
আই রিটালিয়েটেড অন হিম সাধ মিটাইয়া
উইথ সিক্সটিন ষ্ট্রাইপ্‌স্‌ হাজতে পুরিয়া।"

মজঃফরপুরে বদলী করা হয়। কিন্তু তাতেও বিপ্লবীরা সন্তুষ্ট হলেন না। বিপ্লব সমিতির তিন জন নেতা অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিক ও চারুচন্দ্র দত্তের বিচারে কিংসফোর্ডের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোলো এবং এই কাজ সম্পন্ন করবার জন্য বারীন্দ্র ও সত্যেনের সুপারিশে নির্বাচিত হলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। এঁরা সত্যেনের মন্ত্রশিষ্য ও বারীনের মেদিনীপুর শাখার কর্মী। মেদিনীপুর থেকে রওনা হয়ে দু'জন কলকাতায় পৌঁছালেন। এখানে হেমচন্দ্র দাসের ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের বাসায় দিন সাতেক অপেক্ষা করলেন। তার পর মজঃফরপুর।

ভাবতে বিস্ময় জাগে সুদূর মজঃফরপুরের একটি রাস্তায় দুজন বাঙ্গালী অসমসাহসী যুবক নিজেদের তৈরী বোমা নিয়ে অপেক্ষা করছে। অগ্নিশিশুদের এই প্রথম আগুন নিয়ে প্রকাশ্য খেলার উদ্বোধন, শত শত শহীদের মিছিলে পুরোধা ও পথপ্রদর্শক এই দুই মেদিনীপুরবাসী তরুণ।

সারা বাংলা শুধু বাংলা কেন সারা ভারত চমকে উঠল ৩০শে এপ্রিলের (১৯০৮) সন্ধ্যার সংবাদে, বোমার আওয়াজ ও আলোয় সচকিত হয়ে উঠল বৃটিশ। বোমা ছোড়া হয়েছে কিংসফোর্ডের গাড়ীতে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়ে গেলেন কিংসফোর্ড কেননা তিনি গাড়ীতে ছিলেন না। ঐ সময় গাড়ীতে যাচ্ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী মিঃ কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা—এঁরা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন।

অত দেখবার সময় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের ছিল না। পলায়মান প্রফুল্ল মোকামাঘাট স্টেশন পর্যন্ত এসে পৌঁছান। ঐখানে গোয়েন্দা নন্দলাল কৌশলে প্রফুল্লকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। পুলিশ বেষ্টিত হয়ে আর পালাবার কোন উপায় নেই দেখে নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করলেন প্রফুল্ল। সনাক্তকরণের জন্য পুলিশ তার মাথাটা কেটে আনল। শোনা যায় ঐ মাথা নাকি

লালবাজারের পুলিশ স্টেশনের উঠানে পুতে ফেলা হয়েছিল। এই নন্দলাল গোয়েন্দাকে ক্ষমা করেনি বিপ্লবীরা। ঐ বছরের ৯ই নভেম্বর কলকাতার সার্পেনটাইন লেনে গোয়েন্দা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত হন।

ওদিকে মজঃফরপুর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে ওয়াইলি স্টেশনের নিকট এক বিহারী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ক্ষুদিরাম। পথশ্রমে ক্লান্ত ক্ষুদিরাম একটি কলে জল খেতে গিয়েছিলেন…। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, বিন্যস্ত বেশবাস দেখে বিহারী পুলিশের মনে সন্দেহ জাগে। সে ধরতে আসে ক্ষুদিরামকে। ধস্তাধস্তিতে তার কোমরে গোঁজা পিস্তল বেরিয়ে পড়ে। সেখানেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসীর হুকুম হোলো। পরে বিচারকের হুকুম নিয়ে উকিল সতীশবাবু ক্ষুদিরামকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে তিনি বলেন—

"…মেদিনীপুর শহরে আমার বাড়ী। আমার মা নাই, বাবা নাই, ভাই নাই, মামা নাই, কাকা নাই, আমার কেউ নাই। আছে কেবল একটি বোন—তিনি আমার বড়। অমৃলাল রায়ের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। অমৃতবাবু মেদিনীপুর জজ কোর্টের হেড ক্লার্ক। অবিনাশচন্দ্র আমার জ্যাঠতুতো ভাই, তিনি আমার কোন খোঁজই রাখেন না। আমি স্বদেশী আন্দোলনে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া অমৃতবাবু আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। আমার মা নাই, বাবা দশ এগার বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। আমার বিমাতা তাঁহার ভায়ের কাছে থাকেন।

প্রশ্ন—কাহাকেও তোমার দেখিতে ইচ্ছা হয় না ?

ক্ষুদিরামের উত্তর—হ্যাঁ, হয় বইকি ; মরণের আগে জন্মভূমি মেদিনীপুরকে দেখিতে সাধ হয়, দিদির ছেলেমেয়েগুলিকে দেখিতে মন চায়।

প্রশ্ন—তোমার মনে কোন দুঃখ আছে কি ?

উত্তর—না, কিছু না।

প্রশ্ন—কোন আত্মীয় স্বজনকে এখানে আসিতে বলিতে চাও ?

উত্তর—না, তবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন।

প্রশ্ন—তোমার মনে কোন ভয় হয় কি ?

উত্তর—(সাহাস্তে) কেন ভয় করিব ? (একটু থেমে দৃঢ়স্বরে) আমি কি গীতা পড়ি নাই ?

প্রশ্ন—তুমি কি জান রংপুর হইতে আমরা কয়েকজন উকিল তোমাকে বাঁচাইতে আসিয়াছি ? তুমি তো নিজেই আপন কৃতকার্য স্বীকার করিয়াছ ?

উত্তর—কেন স্বীকার করিব না ?..... ”

অন্তিম সময়ে ক্ষুদিরাম ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির কাহিনী পড়তে চেয়েছিলেন। ফাঁসীর আগের দিন ক্ষুদিরাম উকিল কালিদাস বাবুকে বলেছিলেন, “রাজপুত নারীরা যেমন নির্ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়া জহর ব্রত উদ্‌যাপন করিত, আমিও তেমনি নির্ভয়ে প্রাণ দিব। আগামীকাল ফাঁসীর আগে আমি চতুর্ভুজার প্রসাদ খাইয়া বধ্যভূমিতে যাইতে চাই।” (সুকুমার রায় লিখিত ‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস’ দ্রষ্টব্য)।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অগস্ট অগ্নিশিশু ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন মজঃফরপুর সেণ্ট্রাল জেলেব বধ্যভূমিতে।

১৯০৮ সালের ৩০শে মে যুগান্তর পত্রিকায় এক প্রবন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ ‘মা তৃষিতা হইয়াছেন,...নররক্ত এবং ছিন্নমুণ্ড ব্যতীত তিনি প্রসন্না হইবেন না।’ এতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল বিপ্লবিগণ—চেয়েছিল তৃষিতা মাকে প্রসন্না করতে, তার জন্য যে কি, মূল্য দিতে হয়েছিল, কত রক্ত ঝরাতে হয়েছিল আজ ইতিহাসের পাতাই তার সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

ক্ষুদিরাম বসু
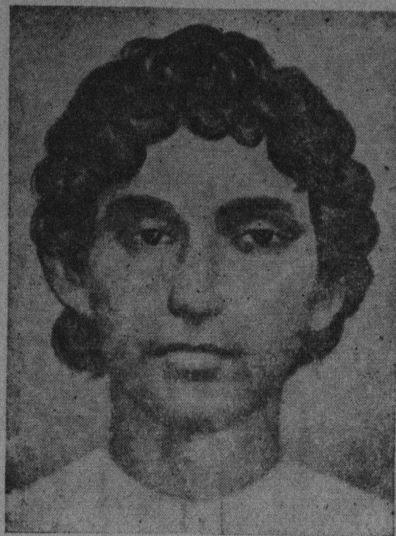
আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা
ও
মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা

মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের মাত্র এক দিন পরে ২রা মে (১৯০৮ খ্রীঃ) ভোরে পুলিশ একই সঙ্গে কলকাতা ও মেদিনীপুরের বহুস্থানে তল্লাসী চালায় ও ধরপাকড় আরম্ভ করে। কলকাতার মুরারীপুকুর বাগানবাড়ী ঘেরাও করে যে চৌদ্দ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাদের মধ্যে ঘাটালের পূর্ণচন্দ্র সেন ছিলেন। অপর নেতাদের মধ্যে অরবিন্দ, বারীন ও হেমচন্দ্র ধৃত হন। মেদিনীপুরে ধরা পড়লেন সত্যেন। ফলে একই সময়ে কলকাতা ও মেদিনীপুরের দুইটি প্রধান ঘাঁটি আক্রান্ত হোলো। মেদিনীপুরে খুব বেশী জিনিসপত্র পুলিশ পেল না কেননা হেমচন্দ্রের তৈরী শক্তিশালী কতকগুলি বোমা সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ী থেকে যোগজীবন ঘোষের বোনেরা ট্রাঙ্কে করে সরিয়ে দিলেন অন্যত্র। পুলিশ বুঝতে পারল কলকাতার মত মেদিনীপুরেও বিপ্লবীদের একটি প্রধান ঘাঁটি আছে। ঐ দিনই কর্ণিস সাহেব কলকাতার গোয়ান্দা বিভাগ থেকে আর একটি টেলিগ্রাম পান। পরের দিনও বহু বাড়ীতে খানাতল্লাসী চল্‌ল। কিন্তু পুলিশ বিশেষ সুবিধা করতে পারল না।

৮ই জুলাই (১৯০৮ খ্রীঃ) হঠাৎ অতি প্রত্যুষে অ্যাসিস্টেণ্ট পুলিশ সুপার মিঃ ব্রেটের অধীনে একটি শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী শহরে মীরবাজারের প্যারীমোহন দাসের বাড়ীতে হানা দেয়—তার বৈঠকখানায় একটি বোমা পাওয়া যায় ও তার পুত্র সন্তোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৬শে জুলাই ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর বাড়ীর নিকটে একটি ড্রামে একটি বোমা আবিষ্কৃত হয়। ফলে ৩১শে জুলাই সারদা দত্ত ও বরদা দত্তের বাড়ীসহ প্রায় ১৫৪টি ঘরে তল্লাসী চলে এবং বৈঠকখানায় বোমা পাওয়া যায়, যার জন্য সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রভৃতি গ্রেপ্তার হলেন। বিভিন্ন স্থানে

তল্লাসীর পর দেখা গেল উপেন্দ্রনাথ মাইতি, রাজা নরেন্দ্রলাল খান, অবিনাশ চন্দ্র মিত্র সহ ত্রিশ জন ধরা পড়েছেন।

এই সময় পুলিশের ডেপুটি সুপার মৌলভী মজহরুল হক কর্তৃক নিয়োজিত রাখাল চন্দ্র লাহা নামে এক মাতাল ইনফরমার পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, সে হেড কনেস্টবল আশাহুল্লার নিকটে নানাপ্রকার গোপনীয় সংবাদ এনে দিত।

এইরূপে কলকাতায় যখন আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হোলো তখন মেদিনীপুরে আরম্ভ হয় মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলায় রাজসাক্ষী হবার জন্য পুলিশ সন্তোষ দাসকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু বার বার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টন সাহেবের আদেশে তার পিতাকে ধরে এনে পুত্রের সামনে সপ্তাহকাল ধরে অমানুষিক অত্যাচার চালান হয়। বৃদ্ধ পিতার উপর পৈশাচিক নির্যাতন দেখতে না পেরে সন্তোষ পুলিশের লেখা স্বীকারোক্তিতে সই করতে বাধ্য হয়। সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জীও পুলিশের পৈশাচিক নির্যাতনের জন্য তাদেরই লেখা একটি বিবৃতিতে বাধ্য হয়ে স্বাক্ষর করেন। পুলিশ ইনফরমার রাখাল লাহা ও ঐ দুই নেতার বিবৃতি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল—কেননা এদের উৎস একই, পুলিশ নিজেদের সুবিধামত করে এগুলি নিজেরাই রচনা করেছিল।

যাই হোক সবদিকে প্রস্তুত হয়ে ৭ই সেপ্টেম্বর পুলিশ এক শত চুয়ান্ন জনের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে। এদের মধ্যে ছিলেন চল্লিশ জন দোকানদার, একুশ জন জমিদার, কুড়ি জন ছাত্র ও যুবক, পনর জন উকিল, ছয় জন ডাক্তার, তিন জন মোক্তার, এক জন কর্মকার, এক জন ভিখারী ও খেতাবধারী রাজা একজন।

এদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের অভিযোগ ছিল, যেমন—

ক) এরা সকলেই একটি গুপ্ত সমিতির সভ্য, এই সমিতি সারা দেশে এবং মেদিনীপুরে গোপনে কর্মরত; এদের কাজ বোমা,

বিস্ফোরক দ্রব্যাদি বা আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা।

খ) আসামী যোগজীবন ঘোষের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ ছিল। তিনি নাকি ক্ষুদিরামকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টনকে হত্যা করবার জন্য ঝাড়গ্রামে গিয়েছিলেন। এমনকি ওয়াইলি স্টেশনে ক্ষুদিরামের কাছে যে দুটি পিস্তল পাওয়া যায় তার একটি যোগজীবনের ও অপরটি সত্যেনের এটাও প্রমাণ করার চেষ্টা করল পুলিশ। এই যোগজীবন তার লাঠি ও অসি খেলার ওস্তাদ আব্দুর রহমানকে বোমা তৈরী করে ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিলেন। এর আগেও খোলা তরবারি নিয়ে ঘোরাফেরা করবার জন্য অস্ত্র আইনে সত্যেন, শরৎচন্দ্র ও যোগজীবনের কারাদণ্ড হয়েছিল। মেদিনীপুরের বিখ্যাত বসন্তমালতি আখড়ায় লাঠি ও ছোরা খেলা শেখানোর ওস্তাদ ছিলেন এই যোগজীবন। শরীর চর্চা, লাঠি খেলা ও ছোরা খেলায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পুলিশের আক্রোশ ছিল তার উপরই বেশী।

গ) উক্ত আসামিগণ শহরের বিভিন্ন বাড়ীতে মিলিত হয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করত, কর্মসূচী স্থির করত। বোমা, পিস্তল ইত্যাদি দেখিয়ে তরুণদের মনে প্ররোচনা দিত। এদের আড্ডা ছিল বাইশ জায়গায়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য স্থান হোলো—মেদিনীপুর শহরস্থিত মহিষাদলের রাজার বাড়ী, উপেন্দ্রনাথ মাইতি ও আই-সি-এস বি. দে এবং শহরের দুজন দেহোপজীবিনী রাজবালা ও কামিনীবালার বাড়ী।

যাই হোক প্রথমে আসামীদের জামিন দেওয়া হয়নি, পরে হাইকোর্টের নির্দেশে রাজা নরেন্দ্রলাল খান ও আরও জন কয়েককে জামিন দেওয়া হয়।

এত চেষ্টা করেও এই মামলায় বিশেষ সুবিধা হোলো না কেননা

৪ঠা নভেম্বর (১৯০৮ খ্রীঃ) আদালতের কাঠগড়ায় উঠে ইনফরমার রাখাল লাহা প্রকাশ করে দিল আসল ষড়যন্ত্রের কথা। সে বলল মৌলভী মজহরুল হক, লালমোহন দারোগা ও জেলাশাসক ওয়েস্টন সাহেবের প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শনের জন্য সে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল। তার দেওয়া দিনের পর দিন যে বিবৃতি আদালতে ৫৬নং এগজিবিট হিসেবে দাখিল করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, পুলিশের ভয়ে সে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। এর আগে ৩১শে অগস্ট সন্তোষ ও সুরেন্দ্র আদালতে তাঁদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। মামলার অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হোলো বিরোধী পক্ষ। কলকাতা থেকে তৎকালীন এডভোকেট জেনারেল মিঃ এস. পি. সিংহ (পরে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ) এলেন মামলার তদারক করতে। প্রাথমিক রিপোর্টে এক শত চুয়ান্ন জন আসামীর নাম থাকলেও শেষ পর্যন্ত সাতাশ জন বাদে সবাইকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এবারে আরও চব্বিশ জনকে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দিতে হোলো (৯ই নভেম্বর, ১৯০৮ খ্রীঃ)। বাকী রইলেন তিন জন— সন্তোষ দাস, সুরেন মুখোপাধ্যায় ও যোগজীবন ঘোষ।

পুলিশ হাজতে অন্যান্য অপরাধে ধৃত আসামীদের মুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করা হয় এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের নানা ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করে বিচার হয় এদের। বিচার শেষে মিঃ স্মিথার (জেলার অতিরিক্ত জেলা জজ) অন্য দুইজন বিচারকের সিদ্ধান্তের কথা না মেনে আসামীদের শাস্তি দিলেন। পরের বছর ৩০শে জানুআরি রায় বেরুল—

[এক] আসামী যোগজীবন ঘোষ—দশ বৎসর দ্বীপান্তর।

[দুই] আসামী সন্তোষ দাস—এক ধারায় দশ বছর ও অপর ধারায় সাত বছর দ্বীপান্তর। উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলবে।

[তিন] আসামী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাত বছর দ্বীপান্তর বাস।

এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হোলো। স্যার লরেন্স জেঙ্কিস ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির অসারতা ও হাস্যকর বিবরণ দেখে আসামীদের বেকসুর মুক্তি দেন। এই মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন সেকালের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ। এঁদের মধ্যে ছিলেন দাশরথী সান্যাল, দেবেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, সুরেশ মুখার্জী, অবনী মুখার্জী, অমরেন্দ্র বসু, যতীন্দ্র সেন, ক্ষিরোদবিহারী দত্ত, মন্মথ মুখার্জী প্রভৃতি।

সন্তোষ মুক্তি পেলে প্যারীমোহন দাস কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টনকে ছেড়ে দিলেন না। বেআইনী গ্রেপ্তার, অন্যায় ভাবে আটক ও নির্মম অত্যাচারের অভিযোগে জেলাশাসক ওয়েস্টন-এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে তিনি মামলা দায়ের করলেন। বিচারক মিঃ ফ্লেচার ম্যাজিস্ট্রেটকে কঠোর ভাবে ধিক্কার দেন ও এক হাজার টাকা জরিমানা করেন। আপীলে বিচারপতি উড্রফ্ ওয়েস্টনের এই দণ্ড মকুব করে রায় দেন।

যাই হোক এমনি ভাবে মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার শেষ পরিণতি সরকার পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত করল—তাদের প্রতিহিংসা পরায়ণ আসল রূপ অনেকাংশে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে জেলার অন্যান্য অংশে এই সময়ে বৈপ্লবিক কর্মসূচী নানা ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল।

২রা জুন রাত্রিতে ঢাকার বারহা বাজার লুঠ করা এবং সেখানের বিলাতি দ্রব্যের দোকানগুলিতে অগ্নিসংযোগ করার পরিকল্পনা হয়। বাঁকুড়ার মুন্সেফের পুত্র শৈলেশ চক্রবর্তীসহ কয়েকজন একটি উইঞ্চেষ্টার রাইফেল ও পাঁচটি পিস্তল এবং কিছু বোমা বারুদসহ রওনা হন এবং বাজারের বিলাতি দ্রব্যের দোকানগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করেন। বাজারের বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির বিরোধিতা তাঁদের কিছুই করতে পারল না।

এই সময় গড়বেতার বিভিন্ন স্থানে লাঠি খেলার আখড়া স্থাপিত হয়। প্রথমে গড়বেতা কেন্দ্রের সদস্য ছিলেন সতীশ অগস্তি, হাবু অগস্তি, মন্নু ভট্টাচার্য, অবোধ দে, ফণী সিংহ (গড়বেতা), নীলমাধব হাজরা (কড়ুই), প্রভাকর চৌধুরী (খড়কুশমা) প্রভৃতি। পরে কাতরাবালি, বাঁশদা, বলদঘাটা, বড়াই প্রভৃতি স্থানেও এরূপ আখড়া স্থাপিত হয়েছিল। সন্ধিপুরের একটি সভায় ফ্রান্সের মাদাম কুরী প্রদত্ত একটি লাল পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাংলার বিপ্লবীদের জন্য তিনি ঐ পতাকাটি পাঠিয়েছিলেন।

ওদিকে আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় তখন বিচারাধীন রয়েছেন অরবিন্দ, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, পূর্ণসেন, কানাইলাল, সত্যেন প্রভৃতি নেতাগণ। মেদিনীপুরের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক সত্যেনকে মেদিনীপুর থেকে নিয়ে গিয়ে ঐ মামলায় জড়ান হয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ঐ সঙ্গে বাস করছিলেন নরেন গোস্বামী, যিনি রাজ সাক্ষী হতে চেয়েছিলেন। জেল হাসপাতালে কানাই ও সত্যেন নরেনকে হত্যা করে বহু বিপ্লবীকে বিপদের হাত হতে উদ্ধার করেন। এই ছিল তাদের দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার পরিণাম। নরেনকে হত্যার অপরাধে তাদের ফাঁসী হয়। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় কয়েক জনের দ্বীপান্তর ও দীর্ঘমেয়াদী জেল হোলো।

পরে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তকারী ভারপ্রাপ্ত অফিসার সামসুল আলমকে হাইকোর্টের কাছে হত্যা করলেন বীরেন গুপ্ত। এই মামলার অন্যতম পুলিশ প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাসও বিপ্লবীদের হাতে নিহত হলেন ১০ই ডিসেম্বর (১৯০৯ খ্রীঃ)।

এই ষড়যন্ত্র মামলা এক আশ্চর্য বস্তু, যেখানে কোন প্রমাণ মেলে না, যাকে কোনরূপে গ্রেপ্তার করার অভিযোগ পাওয়া যায় না বা যার বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী দেয় না এরূপ সন্দেহভাজন

ব্যক্তিকে ছেঁকে তোলা হোতো এর জালে। সামান্যতম সন্দেহের অবকাশে বা যে কোন সূক্ষ্ম সূত্র ধরেও এর কাজ চলত। ফলে কত নির্দোষ যুবক যে এর কবলে পড়ে দণ্ড ও হয়রানি ভোগ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। যাকে তাকে ধরে এনে সামান্যমাত্র বিচারের প্রহসনে নির্বিচারে জেল, দ্বীপান্তর আর ফাঁসীর মহোৎসব চলত এই সভ্য শ্বেতাঙ্গের রাজত্বে।

যাই হোক ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে মেদিনীপুর অনেকটা শান্ত হোলো। সত্যেন, ক্ষুদিরামের ফাঁসী, কয়েকজনের দীর্ঘ মেয়াদী জেল ও দ্বীপান্তর প্রভৃতি দেখে সাধারণ দেশবাসী ভয় পেয়ে গেছে মনে করল বৃটিশ। অত্যাচারী শাসকের নিষ্ঠুর দমননীতি থেকে এরূপ একটা ভীতির সঞ্চার কিছুটা যে না হয়েছিল তা নয়, তবে তা অত্যন্ত সাময়িক ও এক বিশেষ শ্রেণীর লোকদের মনে। বড় বড় নেতারা দণ্ডিত ও কারারুদ্ধ থাকায় হয়ত এই সময় গুপ্ত বিপ্লববাদ কিছুটা থমকে দাঁড়িয়েছিল সত্যিই, তবে তার পরেই শুরু হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ের আর এক ব্যাপকতর প্রস্তুতি।

অবশ্য একথা ঠিক যে বৃটিশের আইন এবং কৌশলে সাধারণ নাগরিকগণ এতই ভীত ও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে যে, বর্বর দমননীতির ভয়েই হোক বা হয়রানি কিম্বা সম্মান হানির অজুহাতেই হোক কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই বিপ্লবীদের প্রকাশ্যে কোনরূপ সাহায্য করতে অসম্মত হতে থাকে। অনেকে আবার বৃটিশের সাহায্যকারীর ভূমিকাও গ্রহণ ক'রে তাদের প্রিয়পাত্র হবার জন্য সচেষ্ট হতে থাকে নিজ নিজ ধন-প্রাণ-মান-রক্ষার আশায়। এই সব কারণে গুপ্ত সমিতিগুলিকে কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল।

কিন্তু তাই বলে তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না, বরং সংগঠনকে শক্তিশালী করবার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন নানা উপায়ে। বিদেশীদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং উন্নত ধরণের

আক্রমণ কৌশল ও সংগঠন দেখে বিপ্লবীদলের অভিজ্ঞতা বাড়ল। তাঁরা বুঝলেন মুষ্টিমেয় যুবক সামান্য অস্ত্রশস্ত্র সম্বল করে উল্লেখযোগ্য একটা কিছু হয়ত করতে পারবেন না। তাই তাঁরা সচেষ্ট হলেন দলকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে অনেক শক্তিশালী করে তুলতে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে বিদেশী শক্তির অপসারণ চাই কাজেই সেই বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে সমাজ থেকেই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। ধনী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় অর্থ দিতে না চাইলে জোর করে তা আদায় করে নিতে হবে। এই জোর করে কেড়ে নেওয়ার ঘটনাগুলিকেই বৃটিশ বিশেষিত করেছিল 'ডাকাতি' আখ্যা দিয়ে। স্বাধীন দেশে একটু অন্যভাবে আমরা এদের আখ্যাত করি 'রাজনৈতিক ডাকাতি' বলে। শুধু ধনী ব্যক্তির অর্থই নয়, সরকারী ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, ডাক প্রভৃতি থেকে অর্থ এবং অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে নিজেদের দলের শক্তি বৃদ্ধি করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কাজেই আর যাই বলি না কেন এই সব ঘটনাগুলিকে 'ডাকাতি' বলতে মন চায় না; যখন দেখি ওদের পরিকল্পনা ও সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কত মহৎ ও উদার। উক্ত ঘটনাগুলির বিচার কালেই বৃটিশ বুঝতে পেরেছিল সে কথা, ওদেরই ভাষায়—

"..that their object was to form a gang and obtain money by means of decoities with which to purchase arms in order to shake off the British yoke and free the country....."

('খুলনা-যশোহর গ্যাংকেশ'-এর চার্জসীট থেকে গৃহীত)।

প্রসঙ্গতঃ এরূপ একটি ডাকাতির কেসের কথা সংক্ষেপে বলি, মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা এতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ডাকাতির মধ্যে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃটিশের

ভাষায় এর নাম 'খুলনা-যশোহর গ্যাং কেস'। ১৯০৯ সালের শেষ এবং পর বৎসরের প্রথম দিকে পূর্ব বঙ্গের খুলনা ও যশোহর জেলার কয়েকটি স্থানে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ কয়টি ডাকাতি সংঘটিত হয়। হোগলাবন্যার বরদাকান্ত মণ্ডলের বাড়ীতে প্রথম আরম্ভ। এর কয়েকদিন পরে ভূঁইকরার অক্ষয়কুমার সিংহ (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৯), শোলঝাঁটির রাখালদাস চক্রবর্তী (৭ই ফেব্রুআরি ১৯১০), ধূলগ্রামের শ্রীচরণ ঋষি (১১ই ফেব্রুআরি), নন্দনপুরের বিশ্বনাথ কর (৩০শে মার্চ) এবং মইষাগ্রামের অপর একটি বাড়ীতে (৭ই জুলাই) এই দুঃসাহসিক ডাকাতিগুলি সংঘটিত হয় যথেষ্ট দক্ষতা ও সুপরিকল্পনার সঙ্গে।

সেদিন এই ডাকাতির অভিযোগে যাঁদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁদের সবাইকে আমরা চিনি; তাঁরা স্বাধীন ভারতের চিরনমস্য ব্যক্তি, তাঁরা চোরও নন ডাকাতও নন। মোট চুয়াল্লিশ জন আসামীর মধ্যে যাঁরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলে প্রকাশ তাঁরা হলেন নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য (মুখার্জী), রামেশ্বর নাথ (রমেশ রায়), রাজেন্দ্র বিশ্বাস, শরৎচন্দ্র কর্মকার, ললিতমোহন দে, ললিতমোহন মজুমদার, নৃপেন্দ্রভূষণ সরকার, শান্তিগোপাল ভট্টাচার্য, পঞ্চু কাজী (লাঠিখেলার গুরু), সামতুল্লা ফকির (শান্তা), বিশ্বেশ্বর চ্যাটার্জী, ভূপাল বসু (ভজা), কেশব বসু (গজা), হেমচন্দ্র গাঙ্গুলী, ভোলানাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি। বিপ্লবী দলের দু'জন উপেন চক্রবর্তী ও সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য রাজসাক্ষীসহ এই মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষী ছিলেন দুই শত আটচল্লিশ জন। সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে প্রকাশিত হয় এরা 'অনুশীলন সমিতি' নামে এক গুপ্ত সমিতির সভ্য এবং এরা সংখ্যায় অনেক। ডাকাতির অর্থ দিয়ে নকুলেশ্বর ঝালদা থেকে রিভলবার, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশাস্ত্র কিনে আনেন। কার্টিজ তৈরীর জন্য একটি ক্ষুদ্র লেদ মেসিন ও টাকা জাল করবার জন্য একটি যন্ত্রও নকুলেশ্বর কিনে আনেন। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল—

"......to serve the mother country and free it from the British yoke by fighting if necessary...."

দেশমাতার সেবা করতে এবং তাকে বৃটিশের কবলমুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন হ'লে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত হচ্ছিলেন তাঁরা। বিস্তারিত তদন্তের সময় এঁদের কতকগুলি কর্মকেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হোলো ডাকাতির সন্নিহিত স্থান মহেশ্বরপাশা গ্রাম, ধূলগ্রাম, দামোদর ও দাঁদনী খাল প্রভৃতি অঞ্চলে। আর কলকাতায় এদের ঘাঁটি ছিল ৯৬ নং হরিশ মুখার্জী রোড, ২৪ নং কানাইলাল ধর লেন (ঢাকা অনুশীলন সমিতির মেস ও অফিস), ৩/১২ গৌরী বাড়ী লেন (যোগেন্দ্র ঠাকুরের দলের আস্তানা ও অনুশীলন সমিতি), ৭ বোস-পাড়া লেন (বাগবাজার), ৮৪/৫ হ্যারিসন রোড (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড), ১১/১/১ হরলাল মিত্র স্ট্রীট (বাগবাজার), ৪৮/১ চাউলপট্টী রোড, ১১ ও ২৬ হালদার বাগান লেন, ৮/৪ যদুনাথ মিত্র স্ট্রীট (আপার সার্কুলার রোড), ১১ রামকান্ত বোস সেকেণ্ড লেন (ঢাকা অনুশীলন সমিতির অস্ত্রাগার), ১১ কাম্বুলিয়া টোলা, ৪ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন (বি. কে. সরকার মেস) প্রভৃতি।

এই মামলায় সরকারের বাইশ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ শেষ পর্যন্ত অপরাধীদের কোন শাস্তি না দিয়ে মোকদ্দমা তুলে নেয়। কঠোর দমননীতির বদলে বিপ্লবীদের সঙ্গে সরকারের আপোষমূলক মনোভাব এই প্রথম প্রকাশ পেল। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই মামলা বৈপ্লবিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এরূপ উদ্দেশ্যমূলক ডাকাতি সে যুগে অনেক সংঘটিত হয়েছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন ঢাকার বরাবরা গ্রামের ডাকাতিতে চার জন নিহত ও কিছু ব্যক্তি আহত হয়। ঐ বছরই সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে নড়িয়াতে এরূপ আর একটি ডাকাতি হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর পনর জন ব্যক্তি ফিরোজপুরের

ট্রেজারী আক্রমণ করে; এতে দারোগা ও পঞ্চায়েত নেতা নিহত হয়। বিপ্লবী পক্ষেও দুই জন নিহত ও সাত জন বন্দী হন। পরের বছর মে মাসের ১২ তারিখে বার্ড কোম্পানীর কুড়ি হাজার টাকা গার্ডেনরিচে ট্যাক্সি থামিয়ে লুঠ করা হয়। এর আগে ফেব্রুআরি মাসের বাইশ তারিখে বেলেঘাটায় চাল ব্যবসায়ীদের টাকা লুঠ হয়েছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলায় ললিতেশ্বরে এক ডাকাতিতে রাজসাহী কলেজের ছাত্র-বিপ্লবী প্রবোধ ভট্টাচার্য মারা যান। বিপিন গাঙ্গুলী আগড়পাড়া ডাকাতিতে রিভলবার সহ ধরা পড়েছিলেন। এছাড়া এ প্রসঙ্গে কলকাতার কয়েকটি মোটর গাড়ী ডাকাতি, কলকাতার করপোরেশন স্ট্রীট, নদীয়ার শিবপুর ও প্রাগপুর, ত্রিপুরার হরিপুর ও করতালা, ময়মনসিংহের চন্দ্রকোণা, রংপুরের কুরুল (১৯১৫), ত্রিপুরার গণ্ডোরা ও নাটখর, ফরিদপুরের ধানুকা, ময়মনসিংহের শইলদ (১৯১৬), ঢাকার আবদুল্লাপুর প্রভৃতি স্থানের ডাকাতিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া লাকসাম ট্রেন ডাকাতি, ঢাকা শহরে সার্জেন্টের রিভলবার ছিনতাই, চরগুরিয়া পোস্ট অফিস ডাকাতি, রংপুর ট্রেন ডাকাতি, ধামরাই ডাক লুঠ, তেজগাঁও ট্রেন ডাকাতি, মাণিকগঞ্জ ডাক লুঠ প্রভৃতিও সংঘটিত হয়েছিল বিপ্লবীদের দ্বারা।

ওদিকে লর্ড কার্জন বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার পর লর্ড মিণ্টো বড়লাট হয়ে এলেন এবং বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হোলো (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ, ১২ই ডিসেম্বর)। মিণ্টোর শাসন কৌশলের গুণে বাংলার বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক আকাশ অনেকটা প্রশমিত হোলো।

প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবীরা এই সময় একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেন নি। ভিতরে ভিতরে চলছিল অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, সংগঠন ও ব্যাপকতর প্রস্তুতির কাজ। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার গুপ্তচর আবদার রহমানকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু তা সফল হয়নি। ১৯১২-১৩ সালে মেদিনীপুর শহরের শীতলা

মন্দিরের সামনে 'জর্জ লাইব্রেরী' নামে একটি বই-এর দোকান খোলা হোলো, তারই পাশে এক পোড়ো বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র রাখা হোতো। এই সকল অস্ত্রাদি কলকাতা থেকে আদান প্রদান করতেন নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য। এর আগে কর্ণেলগোলাতে খোলা হয়েছিল একটি নৈশ বিদ্যালয়। এই সময় পুলিশের গুপ্তচর ও গোয়েন্দারা সর্বদা চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখত।

১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে পুলিশ এক ভোরে কলকাতার ২৯৬/১ নং সার্কুলার রোডের এক বাড়ী থেকে অতর্কিতে হানা দিয়ে শশাঙ্ক (অমৃতলাল হাজরা) ও আরো কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে। এখানে শশাঙ্ক সিগারেটের টিনে করে বোমা প্রস্তুত করত ও মেদিনীপুরে পাঠাত।

পরের বছর ২৬শে অগস্ট (১৯১৪ খ্রীঃ) বিখ্যাত রডা কোম্পানীর এক বাঙ্গালী কর্মচারীর দ্বারা হাওড়া স্টেশন থেকে চারটি অস্ত্রের বাক্স অপহৃত হয়। তার মধ্যে ছিল পঞ্চাশটি বড় আকারের মশার পিস্তল ও ছেচল্লিশ হাজার রাউণ্ড বুলেট। এগুলি গুপ্ত সমিতির মধ্যে ভাগ হয়। নকুলেশ্বর মেদিনীপুরে দিয়ে গেলেন পাঁচটি মশার পিস্তল ও কিছু টোটা। এই পিস্তলগুলি ছিল চকচকে মসৃণ, একেবারে আয়নার মত। আর সবচেয়ে সুবিধা ছিল প্রয়োজন মত কুঁদো লাগিয়ে এগুলি রাইফেলের মত ব্যবহার করা চলত।

এর আগে নলিনী দেব একটি প্রথম শ্রেণীর সেভেন রিপিটার উইঞ্চেষ্টার রাইফেল সংগ্রহ করে এনেছিলেন। পরে জানা যায় সেটি ছিল নাকি ঠাকুর পরিবারের। এই নলিনী দেব পরে সন্ন্যাসী হয়ে যান।

ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটকে স্টীমারের মধ্যে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল ১৯০৭ সালে, আততায়ী মেঘনার মত নদী সাঁতরে পার হয়ে পালিয়ে যান। কিছুদিন পরে তিনি মেদিনীপুরে আসেন। তার বাড়ী ছিল ময়মনসিংহে। মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা তাকে চিনতেন নলিনী

সরকার নামে। গড়বেতার কাতরাবালিতে তিনি ছয় মাস আত্মগোপন করেছিলেন। এই সময় তিনি পিস্তল ও রাইফেল চালনা শিক্ষা দিতেন। তার লক্ষ্য এত অভ্রান্ত ছিল যে, উড়ন্ত অবস্থায়ও যে কোন ছোট পাখীকে তিনি গুলিবিদ্ধ করতে পারতেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় অপরাধবিধি সংশোধন আইন চালু হোলো। এর ফলে অপরাধের চেষ্টাও দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হ'তে আরম্ভ করে। ফলে দোষী নির্দোষী সন্দেহভাজন সকলকেই শাস্তি দেবার এক অজুহাত তৈরী করে নিল শাসকগণ। বিপ্লবীরাও ক্রমে ক্রমে সংগঠিত ও শক্তিশালী হবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

১৯১৪ সালে কলকাতায় বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন বাঘা যতীন। বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, ভোলানাথ প্রভৃতিব চেষ্টায় বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোলো। এই সঙ্গে স্থির হয়—

২১শে ফেব্রুআরি (১৯১৫) বাংলায় ও উত্তর ভারতে এক ব্যাপক বিদ্রোহ করা হবে। প্রধান প্রধান রেলসেতুগুলি উড়িয়ে দিয়ে বাংলার সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে প্রতি জেলার সরকারী অস্ত্রাগার, কোষাগার, জেলখানা প্রভৃতি দখল করা হবে। মেদিনীপুরের বিপ্লবিগণ এই পরিকল্পনায় সোৎসাহে যোগদান করেন। এই শহরের সেণ্ট্রাল জেল দখল করে কয়েদীদের মুক্ত করা, অস্ত্রাগার ও ট্রেজারী দখল করার ভার পড়ল গড়বেতা শাখার উপর। এঁদের মধ্যে ছিলেন তারাপদ মুখার্জী, বিপিন হাজরা, মনু ভট্টাচার্য প্রভৃতি মোট আট জন। কিন্তু নানা কারণে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। এই বছরই ২৮শে ফেব্রুআরি (১৯১৫খ্রীঃ) কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে পুলিশ ইন্সপেক্টার সুরেশচন্দ্র মুখার্জী চিত্তপ্রিয়কে বন্দী করতে গিয়ে পিস্তলের গুলিতে নিহত হন। ফলে ব্যাপক অনুসন্ধান ও ধরপাকড় আরম্ভ হয়।

ওদিকে যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতির চেষ্টায় অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। খবর এল 'মেভারিক' নামে এক জাহাজে করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ থেকে আসছে। বাঘা যতীন উড়িষ্যার বালেশ্বর রওনা হলেন, উদ্দেশ্য গোপনে অস্ত্রশস্ত্র নামানো এবং ঠিকমত বিলি বন্দোবস্ত করা। ট্রেনে যাওয়ার সময় গোয়েন্দা পুলিশ তাদের অনুসরণ করতে পারে এই জন্য মেদিনীপুরের জকপুর স্টেশনের নিকট রমেশ মিত্রের বাগানবাড়ীতে দিন কয়েকের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে মাঝপথে যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়। বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর মোহানায় মেভারিক থেকে অস্ত্রশস্ত্রাদি নামাবার সুবিধা হবে ভেবে যতীন সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত জাহাজ এসে পৌছাল না। দীর্ঘদিন একই স্থানে বসে থাকতে হোলো তাঁকে, এক কৃষকের বাড়ীতে মজুরের ছদ্মবেশে।

এদিকে গোয়েন্দা পুলিশও নিষ্ক্রিয় ছিল না, কলকাতায় বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র বলে বর্ণিত একটি দোকানের সন্ধান পাওয়া গেল এবং সেই সূত্রধরে তারই শাখা অফিস বালেশ্বরে গিয়ে পৌঁছাল পুলিশ। এখানে কাগজপত্রাদি দেখে সব তথ্যাদি জানতে পারল তারা। ফলে বুড়িবালামের তীরে যতীনকে ঘিরে ফেলে ইংরেজ বাহিনী। ধরা দেওয়ার চেয়ে সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করলেন তাঁরা। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর এই ঐতিহাসিক যুদ্ধের কাহিনী ইতিহাস প্রসিদ্ধ। মাত্র জনকয়েক (পাঁচ জন) অসমসাহসী যুবক তাদের সীমিত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ নিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তির সুসজ্জিত পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে—এমন নজির বোধ হয় বাংলা ছাড়া অন্য কোন দেশের ইতিহাসে নেই। এই যুদ্ধের ফলাফল জানা আছে সবার। চিত্তপ্রিয় ঘটনা স্থলেই নিহত হলেন। নেতা বাঘা যতীন বালেশ্বর হাসপাতালে মারা গেলেন, দু'জনের ফাঁসী হোলো (মনোরঞ্জন ও

নীরেন), পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারে অপর একজন আন্দামানে পাগল হয়ে পাগলা গারদেই মারা যান। ইনি জ্যোতিষচন্দ্র পাল।

এই সময় প্রেস আইনের বলে ১৯১০-১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৩৫০টি মুদ্রাযন্ত্র, ৩০০টি সংবাদ পত্র ও ৫০০ এর বেশী পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হোলো। এই আইন প্রচলিত হয়েছিল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ—এর বলে কোন সাময়িক পত্র প্রকাশের পূর্বে সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট থেকে অনুমতি নিতে বাধ্য করা হোলো। কি কি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা নিষিদ্ধ তার মুদ্রিত তালিকাও দেওয়া হোতো। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন আবার 'Vernacular Press Act' দ্বারা দেশীয় পত্র পত্রিকাগুলির স্বাধীনতা অনেকাংশে সংকুচিত করেন। এই সময় কত মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক ও পত্রপত্রিকা যে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেল তার ইয়ত্তা নেই। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রেস আইন সংশোধিত হয়ে নূতন 'ভারতীয় প্রেস আইন' তৈরী করা হোলো। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সরকার বিরোধী সভা নিবারণ আইনে সভা-সমিতির উপরও নানারূপে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়।

কার্জনের পর লর্ড মিণ্টো (১৯০৫-১০ খ্রীঃ) কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করে দেশশাসনের চেষ্টা করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট (১৯০৯খ্রীঃ) প্রচারিত হোলো শুধু জনমতকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই; কেননা এই সময় বিপ্লববাদের প্রভাব বেশ বিস্তারিত ভাবে প্রচারিত হয়েছিল। ভারত সচিব মর্লে এবং বড়লাট মিণ্টোর 'মর্লে-মিণ্টো সংস্কার'-এর ফলে ভারতীয় ও প্রাদেশিক সভায় বেসরকারী সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হোলো।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতে এলেন, তাঁরই সম্বর্ধনা সভায় বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হোলো। বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা (আসাম-সহ)—এই তিনটি নূতন প্রদেশ সীমা নির্দিষ্ট ভাবে স্থিরীকৃত হোলো। কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হোলো দিল্লীতে।

ওদিকে বিশ্বরাজনীতির পরিস্থিতি দিনের পর দিন বদলে যাচ্ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তার প্রভাবও এসে পড়ল ভারতীয় বিপ্লবীদের মনে এবং তাদের সংগঠনের উপর।

এই অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে দেশীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গের সঙ্গে আপোষমূলক ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল শাসকগণ। যার ফলে এল মণ্টেগু-চেম্‌চফোর্ড রিপোর্ট। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগস্ট এই রিপোর্টটি তৈরী হয় এবং এর সংস্কার কার্য আরম্ভ হয় বা কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয় পরের বছর জুলাই মাস থেকে। ভারত সচিব মণ্টেগু সাহেব ও ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ডের এই চুক্তি কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করল। এই রিপোর্টই ভারতের 'ম্যাগনা কার্টা' নামে পরিচিত (ইংলণ্ডের রাজা জনের ম্যাগনা কার্টা, ১৫ই জুন ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দ)। এই রিপোর্টে ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় প্রতিনিধি লওয়ার ব্যবস্থা হয়।

বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত বৃটিশ ভারতীয়দের নিকট থেকে কিছু সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে সাহায্য প্রত্যাশা করেছিল—। শাসক সম্প্রদায়ের বিপদের দিনে এদেশবাসী কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা যে করেনি তাও নয়। কিন্তু নিজেদের বিপদ কেটে যাবার পর প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করার মত সভ্য ও ভদ্র তারা তখনও হতে পারেনি। দেশীয় ব্যক্তিগণ যখন কিছুটা রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার আশায় উন্মুখ তখনই এল কয়েকটি দমনমূলক আইন।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'The Government of India Act' চালু হোলো। এই আইন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অ্যানি বেসান্ত বললেন "Unworthy of England to offer and India to accept."। মহামান্য তিলক সেদিনের কথা সামান্য কথায় সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে বললেন "A sunless dawn."

১৯২৯ সালে মেদিনীপুরের
বিপ্লবীদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ঐ বছরই ১৭ই মার্চ প্রচলিত হোলো রাউলাট অ্যাক্ট—ভারতীয় ইতিহাসে যার নাম 'Black Bill.' ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে স্বায়ত্তশাসন ('Home Rule Movement') আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় তার সমর্থনে শ্রীমতী বেসান্ত মেদিনীপুরে এলেন। রাউলাট বিলের প্রতিবাদে গান্ধীজীও সারা জেলা ভ্রমণ করলেন। ওদিকে ১৩ই এপ্রিল জেনারেল ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগের বদ্ধস্থানে নিরীহ ভারতবাসীর রক্তের স্রোত বইয়ে দিলেন অমানুষিক নিষ্ঠুরতায়। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে মেদিনীপুরে শোক দিবস পালিত হোলো। এই হত্যাকাণ্ডে ৩৭০ জন নিহত ও ১১৩৭ জন ব্যক্তি আহত হন। ইংরেজের তদন্ত কমিটি ডায়ারকে নিষ্কৃতি দিয়ে রিপোর্ট দিল—ওটা ছিল "........an error of judgement"·একটা সিদ্ধান্তের ভুলমাত্র। কিন্তু এ সম্বন্ধে জাতীয় কংগ্রেসের তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিলেন—

"........a cold blooded, calculated massacre of innocent, unoffending, unarmed men, women and children, unparalled for its heartlessness and cowardly brutality in modern times."

[ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা মত আবালবৃন্দ-বনিতার বর্বর গণহত্যা-যারা নির্দোষ, যারা বাধা দিতে জানে না এবং যারা ছিল নিরস্ত্র।]

এতে অবাক হবার কিছু নেই, ইংরেজের তদন্ত কমিটি ও বিচারকগণ এই দৃষ্টিতেই তখনকার আইন ও ন্যায়ের নামে শাসন ও বিচার কার্য চালাত। পরবর্তিকালে হিজলী বন্দীশালায় নিরস্ত্র বন্দীদের উপর গুলি চালানোর সরকারী তদন্তও এরূপেই হয়েছিল। যথাস্থানে তা লেখা হবে।

১৯১৯ সালেই ইণ্ডিয়ান জেল কমিটি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অস্বাস্থ্যকর বলে সেখানে বন্দী প্রেরণের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করে। স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার উইলিয়াম ভিন্সেন্ট The Abolition of Transportation Bill নামে একটি বিলও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়

পেশ করেন। এতে দ্বীপান্তর-দণ্ড রোধ করা এবং আন্দামানকে কয়েদী আবাসরূপে গড়ে তোলার বিরুদ্ধে সরকারী অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এর পর কিছু সংখ্যক কয়েদীকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হোলো। ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর কিন্তু এসব গ্রাহ্য করেননি। এতো বলা সত্ত্বেও বিচারান্তে একশ জন বিপ্লবীকে তিনি আন্দামানে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন।

এই সময় অপর এক সুযোগ্য নেতার আবির্ভাবে মেদিনীপুরের তরুণদের মনে নূতন আশার আলো দেখা দিল। কাঁথি মহকুমার চণ্ডীভেটি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মাহিষ্য বংশের সন্তান বীরেন্দ্র নাথ শাসমল এসে এই জেলার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি বিপ্লবীদের এবং তরুণদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে মেলামেশা করে তাদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাঁর নেতৃত্বে মেদিনীপুরবাসিগণ সরকারী উপাধি, সরকারী আদালত ও সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করেন। সরকারী বিদ্যালয় থেকে ছেলেমেয়েদের ছাড়িয়ে এনে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে আরম্ভ করলেন অভিভাবকগণ।

এই সময় বৃটিশ আইন সভা গ্রামে গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দেশের অন্যান্য অংশ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও মেদিনীপুর তা সহজে মেনে নিতে চায়নি। বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠল। ধনীর দুলাল তিনি, খালি পায়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই আন্দোলনের কাজ চালাতে লাগলেন। পরে তিনি বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর অতুলনীয় সাহস, শক্তি ও দেশপ্রেমের জন্য আজও তিনি 'দেশপ্রাণ' নামে ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। তার নেতৃত্বে মেদিনীপুর জেলায় যে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল, তাই ভারতের প্রথম অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০ খ্রীঃ)।

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে **All India Congress Committee**-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমগ্র মেদিনীপুরবাসী **'Prince of Wales'**-এর ভারত আগমনের দিনে সারা জেলায় হরতাল পালন করে।

এই বছরই 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি' প্রদেশগুলিকে আইন অমান্য আন্দোলনের অনুমতি দিল। মেদিনীপুরের দিকে দিকে সভা-সমিতি হতে লাগল। রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা ও পিকেটিং চলল। শহরে বৃটিশ কর্মচারীদের শান্তি রক্ষার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোলো। এমনকি সরকারের লোকজনের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবার উপক্রম হোলো। প্রথমেই বীরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন। সারা বাংলার মধ্যে সরকারকে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিতে হোলো। অথচ এই আন্দোলন পরিচালনার অনুমতি গান্ধীজী দেননি।

এদিকে বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলন অনেকটা এগিয়ে গেছে। গান্ধীজী তখন অল্পদিন হোলো কংগ্রেসে প্রবেশ করলেও— বেশ পশার করেছেন নেতা হিসেবে। তাঁরই ইচ্ছায় তখন কংগ্রেস পরিচালিত হয়। আইন অমান্য আন্দোলন যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে তখন গান্ধীজী হঠাৎ তা স্থগিত রাখতে নির্দেশ দিলেন। কেননা তিনি চেয়েছিলেন অহিংস ভাবে আন্দোলন চালাতে— ইতিমধ্যে চৌরিচেরায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটতে শুরু করেছে। চৌরিচেরা উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে সামান্য হিংসাত্মক কার্যাবলী ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু তার জন্যই গান্ধীজী সারা দেশের এত বড় উৎসাহ ও আন্দোলনকে থামিয়ে দিলেন। ১৯২২ সালের ১২ই ফেব্রুআরি বারদৌলি কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে তিনি আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন—কেননা তিনি বুঝেছিলেন গঠনমূলক কর্মসূচী তখন দেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মতিলাল ও লালা লাজপত রায়

এতে ক্ষুব্ধ হন। আরো অনেকেই গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারেননি। পরে এ সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'Life of Myself' গ্রন্থে লিখেছেন—

"........Gandhiji at the Belgum Congress while seated in a tent surrounded by leaders including Ali Brothers, remarked to the younger,—'Shaukat, If I had not called of the Civil Disobedience Movement for which people blame me, you and I would not have been sitting here to-day.' I was there, I heard it. It was most revealing."

(বেলগাঁও কংগ্রেসের তাঁবুতে আলি ভাইদের সঙ্গে বসে কনিষ্ঠ সৈকত আলিকে গান্ধীজী বলেন, 'সৈকত যদি আমি আইন অমান্য আন্দোলনকে তুলে না নিতাম তাহ'লে তোমাদের বা আমাকে এখানে বসতে হ'ত না।' আমি সেখানে ছিলাম (যতীন্দ্রনাথ) ও বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।)

১৯২৩ সালে 'স্বরাজ্য পার্টির' সৃষ্টি হোলো এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেদিনীপুরের এক বিরাট জনসভায় এই দলের কর্মসূচী ও আদর্শের কথা জানালেন। বীরেন্দ্রনাথও মুক্তি পেয়ে এঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। মেদিনীপুরের জেলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলিতে কংগ্রেসের অধিকার বিস্তৃত হোলো। বীরেন্দ্রনাথ হলেন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। এই সময় কলকাতার কয়েকটি ডাকঘরে রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। বাংলার অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও কয়েকটি ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর (১লা ?) Bengal ordinance প্রচার করে দমননীতিকে জোরদার করবার জন্য চেষ্টিত হলেন বড়লাট লর্ড লিটন। কেননা ইওরোপীয় অফিসারদের উপর আক্রমণ ও হত্যার চেষ্টা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছিল। এই বছরই ১২ই জানুআরি (১৯২৪ খ্রীঃ) গোপীনাথ সাহা টেগার্ট

সাহেবকে মারতে গিয়ে ভুল করে আর্নেস্ট ডে নামে অপর এক সাহেবকে হত্যা করে। ঐ বছরই ১লা মার্চ এই অপরাধে তার ফাঁসী হয়। ২৪শে মে চট্টগ্রামের পুলিশ এস. আই. প্রফুল্ল রায় নিহত হয়। ২৪শে অগস্ট মীর্জাপুর স্ট্রীটে একটি খদ্দরের দোকানে বোমা নিক্ষেপের ফলে প্রকাশচন্দ্র বণিক নিহত হয়। পুলিশ গুপ্তচরদের দ্বারা ঐ খদ্দরের দোকানটি খোলা হয়েছিল।

১৯২৪ সালে 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি' নামে একটি নূতন দল গঠিত হোলো। এতে যুগান্তর দলের বীরেন ব্যানার্জী, হরিনারায়ণ চন্দ্র, অনন্তহরি মিত্র, পঞ্চানন চক্রবর্তী, উপেন ধর ও সূর্য সেন এবং অনুশীলন গোষ্ঠীর বাণীসেবক সংঘের সুধীর বসুর অধীনে, চট্টগ্রামে চারুবিকাশ দত্তের দল ও শচীন সান্যাল এবং বিনয়েন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির দল একত্রিত হলেন। তাঁরা রাজনৈতিক ডাকাতি, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, বৃটিশ কর্মচারীদের উপর আক্রমণ ও হত্যা প্রভৃতির দ্বারা বাংলাদেশে এক সন্ত্রাসমূলক অবস্থার সৃষ্টি করলেন। মুষ্টিমেয় জনসম্পদে বলীয়ান শাসকশ্রেণী ভয়ে বিনিদ্র রাত কাটাতে লাগল দারুণ উৎকণ্ঠায়। দেশের আপামর জনসাধারণ কংগ্রেসের আদর্শ অহিংস ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে 'বৈধ পথে' স্বরাজ লাভের উপর আস্থা রাখতে পারল না। "গান্ধীজী তাঁর প্রতিশ্রুত এক বছরে স্বরাজ আনতে পারলেন না (Swaraj in a year—Gandhiji)" (স্বদেশের কথা—নৃপেন্দ্র চন্দ্র ও কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হোলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

ফলে দেশের প্রত্যেকটি স্তরের নাগরিক এক ব্যাপক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সরকারী শাসনযন্ত্রও নীরব থাকেনি। কঠোর দমননীতি চলতে লাগল পুরোদমে।

এদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য গান্ধীজী সমগ্র মেদিনীপুর জেলা ভ্রমণ করলেন।

এই সময় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে আভ্যন্তরিণ মতানৈক্য বেশ বেড়ে গেছে। ১৯২৬ সালে বীরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগরে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় তাতে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি মন্তব্য করা হয়েছিল। বামপন্থীরা তার প্রতিবাদ করায় বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। নেতৃবৃন্দের পরস্পর বিরোধী মতবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে এই সময় আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে।

ভারতের শাসনব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে বৃটিশ রাজশক্তি ১৯২৭ সালে জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করল। এই কমিশনের সদস্য সবই ইংরেজ ছিল বলে দেশীয় নেতৃবর্গ তা মানলেন না। সাইমন কমিশন বয়কট করা হোলো। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর নির্দেশে সিদ্ধান্ত হোলো যে, এক বছরের মধ্যেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (Dominion Status) দেওয়া হলে কংগ্রেস তা মেনে নেবে। সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী অগ্রাহ্য হোলো। কিন্তু এক বছরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এলো না। ১৯২৯ সালে জওহরলালের সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী গৃহীত হোলো।

১৯৩০ থেকে বিপ্লব আবার পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল। গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডী অভিযান আরম্ভ করে আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন। ওদিকে একই সময়ে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে সম্মুখ যুদ্ধে বিপ্লবীরা আতঙ্কের সৃষ্টি করলেন (এপ্রিল, ১৯৩০)। একদিকে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন অপরদিকে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ—এই দুই বিপ্লবের গতিরোধ করতে পারল না বৃটিশের চণ্ডনীতি ও কঠোর দমনমূলক শাসন ব্যবস্থা। এই বছর প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি না থাকায় (নভেম্বর, ১৯৩০) দেশীয় নেতৃবর্গ

তার সিদ্ধান্ত মানতে রাজী হলেন না। ফলে গান্ধী-আরউইন চুক্তির বলে গান্ধীজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ পেলেন। এই সহজ সরল অহিংস ধর্মপরায়ণ নিরীহ নেতা গোলটেবিল বৈঠকে কেবলমাত্র উপহাস্যাস্পদ হলেন। ভারতের কোটী কোটী জনসাধারণের প্রতিনিধিকে কূটনৈতিক চালে বৃটিশের ধূরন্ধর রাজনীতিকগণ 'অর্ধনগ্নফকির' আখ্যায় ভূষিত করলেন। লণ্ডন থেকে ফেরার অল্পকাল পরেই গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হোলো ও কংগ্রেসকে বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হোলো। আসলে গোলটেবিল বৈঠকের নামে আন্দোলনকে অনেকটা ক্ষীণশক্তি করবার জন্য সুপরিকল্পিত উপায়ে কংগ্রেসকে ভাঁওতা দিল বৃটিশ রাজশক্তি। পরে অবশ্য এ সম্বন্ধে আসল রহস্য জানা গেছে।

কলকাতায় ইওরোপীয়দের 'রয়ালিস্ট' নামে একটি সমিতি ছিল। এর সভ্যদের জানাবার জন্য একটি গোপনীয় সার্কুলার প্রচারিত হয়। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের ইওরোপীয়গণের প্রতিনিধি মিঃ বেন্থলের বিবৃতি অনুসারে ঐ সার্কুলারে লেখা ছিল— লণ্ডনে এখানকার ইওরোপীয় প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় গান্ধীজীকে অপদস্থ করবার জন্য এবং গোলটেবিল বৈঠক পণ্ড করবার জন্য কি কি কাজ করেছিল ও চাল চেলেছিল। কলকাতার 'অ্যাডভান্স' ও লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকা ঐ গোপনীয় পত্র ছেপে সব ফাঁস করে দেয়। এ নিয়ে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তর কালে সরকার সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারেনি। মনে হয় গান্ধীজীকে বন্দী করবার এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবার সিদ্ধান্ত গোলটেবিল বৈঠক থেকে গান্ধীজী ফিরে আসবার আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। (মাসিক 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৩৯ দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৫৯)

যাই হোক এই সময় থেকে দেশের আপামর জনসাধারণের পাশে দেখা গেল নারী সমাজের জাগরণ। ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, বেথুন, রাজা রাধাকান্ত দেব, কুমারী টমসন, মিসেস হোয়াইট, কুমারী কুক প্রভৃতির চেষ্টায় তখন দেশের স্ত্রী-শিক্ষা

অনেকটা এগিয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এই জাগরণের সূচনা—তখন 'Ladies Society,' 'Ladies Association,' 'Church Missionary Society', 'School Society', মাধ্যমিক পাঠশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টায় নারীসমাজ ধীরে ধীরে আলোকপ্রাপ্তা হচ্ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই তাঁরা দেশের বিপ্লববাদী কর্মসূচীগুলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছিলেন। সরলাদেবী চৌধুরানী 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী দ্রব্যের দোকান খুলেছিলেন। ১৯৩০ সালে 'নারী সমবায় ভাণ্ডার' গড়ে উঠে, প্রথমে এটি ছিল কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে, পরে ১৪নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে উঠে আসে। এখানে স্বদেশী দ্রব্যাদির মধ্যে পাওয়া যেত—চিরুণী, সাবান, তেল, আলতা, সিন্দুর, কাঁটা, এসেন্স, টুথপেস্ট, পাউডার, জুতোর কালি, কাঁচ, এনামেল ও চীনামাটির বাসনপত্রাদি, কাগজ, লেফাফা, কলম, পেন্সিল, এমব্রয়ডারি ও তার সাজসরঞ্জাম, ব্লাউজপিস, ফ্রক, নানাপ্রকার জামা, কাপড় প্রভৃতি। বলা বাহুল্য এর সবগুলিই দেশীয় উদ্যমে প্রস্তুত। এই প্রতিষ্ঠানে অনাথা বিধবা বা স্বহায় সম্বলহীনা স্ত্রীলোকগণও যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে অনেকটা স্বাবলম্বী হতে পারত।

সারা বাংলায় এই সময়ে যে সকল বৈপ্লবিক সংগঠন ও সক্রিয় কর্মসূচী সংঘটিত হয়েছিল তার তালিকা দীর্ঘতর ও অন্য এক বিস্তৃততর ইতিহাস; এখানের আলোচ্য বিষয় নয়—বা আলোচনা করা এই ক্ষুদ্রপরিসর গ্রন্থে সম্ভবও নয়। কাজেই আবার সেই মেদিনীপুরের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

"…ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে, দেশোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত কোন বিলাসিতা করিব না। যতদিন না এ সংকল্প সিদ্ধ হয় অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হয়, ততদিন অন্য কাজ করিব না। এই কাজের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত রহিলাম এবং প্রত্যহ একটি করিয়া পার্টির সভ্য করিবার চেষ্টা করিব…।"

—বিপ্লবীদের দীক্ষান্ত প্রতিজ্ঞাপত্র।

(নিজের রক্ত দিয়ে এতে স্বাক্ষর করতে হ'ত।)

ষষ্ঠ অধ্যায়

অগ্নিযুগ ১৯২৮-৪২ খ্রীঃ

বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্য্যায়

"...যা কিছু অন্যায় অসঙ্গত ও বে-আইনী
তারই বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ...।"—নেতাজী।

নেতাগণের মধ্যে মতদ্বৈধ যাই হোক না কেন মেদিনীপুরের তরুণদল কিন্তু নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকেনি। তারা তখন সংগঠন মূলক কাজে মনোযোগ দেয়। স্বাবলম্বন, নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা ও চরিত্র এবং শরীর গঠনের জন্য অনেক ছাত্র 'বয়েজ স্কাউট' দলে বা রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করে। সেই সঙ্গে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, বন্দুকচালনা, বোমা তৈরী ও তার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে অভ্যাস ও অনুশীলন চলতে লাগল। অভয় আশ্রমের কর্মীবৃন্দ 'তিলক পাঠাগার' নামে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। কাঁথি থেকে বসন্তকুমার দাস এসে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

১৯২৮ সালে মেদিনীপুর শহরের টাউন স্কুলের সামনে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভা পুলিশ ভেঙ্গে দিল। নানা কারণে এই বছরটি মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাসে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বছরের প্রথম দিকে মেদিনীপুর শহরে একটি যুবসংঘ প্রতিষ্ঠিত হোলো। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পরিমল রায়, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী ও ধীরেন মাঝি। কিছুদিন পরে স্থানীয় উকিল যতীশ গুপ্তের ভাই দীনেশ গুপ্ত মেদিনীপুরে এলেন। কলকাতায় তখন 'বঙ্গভঙ্গ' যুগের বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের আদর্শে সংগঠন চলেছে পুরোদমে। নেতাজী সুভাষের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে

'বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' (Bengal Volunteer Group বা সংক্ষেপে B. V.)। প্রথম দিকে এই স্বেচ্ছাসেবক দলের পরিচালকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সত্য বক্সী, হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্য গুপ্ত। মেদিনীপুরে যুবসংঘ গঠনের সংবাদ পেয়ে তারা দীনেশকে একটি বৈপ্লবিক সংস্থা সুসংগঠনের জন্য মেদিনীপুরে পাঠালেন। আগে দীনেশ ছিলেন ঢাকার শ্রীসংঘের কর্মী, শ্রীসংঘ হেমচন্দ্র ঘোষ স্থাপিত ঢাকার এক বিপ্লবী সমিতি। এই দলেই ছিলেন অনিল রায়, সত্য বক্সী, লীলা রায়, সত্য গুপ্ত প্রভৃতি প্রখ্যাত বিপ্লবীরা।

সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক (B. V.) দলের শাখা খোলা হোলো মেদিনীপুরে। কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় যুবসংঘের সভাপতি পরিমলের সঙ্গে আলাপ হোলো দীনেশের। দু'জনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল; যুবসংঘ ও বিপ্লবী সমিতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা চলত প্রায়ই। মানুষ এবং মানুষের চরিত্র বুঝবার এবং যা ইচ্ছা করতেন তাই করবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল দীনেশের—তিনি খুব ভাল বক্তাও ছিলেন। তাই অতি সহজেই তিনি মেদিনীপুরের তরুণদের হৃদয় জয় করে নিলেন।

যুবসংঘের প্রথম কার্যালয় ছিল কর্ণেলগোলায়, রাজা দেবেন্দ্র লাল খানের কাছারিবাড়ীর একটি কক্ষে; পরে তা গোলকুঁয়ার চকে সরিয়ে আনা হয়। পরের বছর সংঘের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য সুভাষচন্দ্র এলেন মেদিনীপুরে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শহীদ সত্যেনের ভাই ডাঃ সুবোধকুমার বসু। সভা হোলো শহরের নিউ বেঙ্গল থিয়েটার হলে (অধুনালুপ্ত)।

প্রয়োজন হলে বৃটিশের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য দীনেশ শিক্ষা দিলেন বীরেন দাস, হরিপদ ভৌমিক, ফণী কুণ্ডু, পরিমল রায়, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, নরেন দাস, অমর চ্যাটার্জী, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, বিনয় মণ্ডল, সুধীর পট্টনায়ক, ক্ষিতি সেন

প্রভৃতিকে এবং আরো পরে বিমল দাশগুপ্ত, রামকৃষ্ণ রায়, কামাখ্যা ঘোষ, অনাথ পাঞ্জা, প্রমথ মুখার্জী, ভূপাল পাণ্ডা, শচীন দাস কানুনগো, ফণী দাস, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, প্রভাংশু পাল, বিনোদ সেন, নির্মল রায়, মৃগেন দত্ত, সুশীল সেন, ভূপতি মণ্ডল ও যতিজীবন ঘোষ প্রভৃতি এই দলে ভর্তি হন (History of Midnapore —N. N. Das)

বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক দল স্কুল কলেজগুলিতে তাঁদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করলেন। দলে দলে নূতন স্বেচ্ছাসেবক এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। দলের নেতাগণ প্রথমে ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতেন এবং নৈতিক, চারিত্রিক ও দৈহিক শিক্ষার উন্নতির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ক্রমে দেশবাসীদের দুঃখ ও দুর্দশার প্রতি তাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করা হোতো। তাদের বোঝান হ'ত দেশের দুঃখ দুর্দশা মোচনের কাজে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেকটি তরুণ তরুণীর অবশ্য কর্তব্য, আর বিপ্লবীদের দলে যোগদান ক'রে—স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ক'রে তারা অনায়াসে সেই কর্তব্য পালন করতে পারে। বক্তৃতা, প্রচার-পত্র, ইস্তাহার, পুস্তিকা প্রভৃতির দ্বারা সাধারণের আমোদ প্রমোদের স্থান, যাত্রা থিয়েটার, সভাসমিতি, হাটবাজার, মেলা এমনকি কোন কোন সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সুযোগমত এরূপ প্রচার কার্য চালান হোতো। এই স্বেচ্ছাসেবকগণ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—

১ম—স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী স্কুল কলেজ, ব্যায়ামাগার, বয়েজ স্কাউট দল, ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষাকৃত:অভিজ্ঞ ছাত্রনেতাদের কাছে এঁরা শিক্ষা পেতেন।

২য়—প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত যুবকগণ যারা স্বাধীন ভাবে ইচ্ছামত কাজকর্ম করতে পারতেন এমনকি প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও।

৩য়—বিবাহিত গৃহী পুরুষ-এদের কাজ প্রধানতঃ অর্থ সাহায্য করা।

৪র্থ—বয়স্ক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এদের কাজে পরামর্শ ও উৎসাহ দান, প্রয়োজন মত তথ্যাদি সংগ্রহ করে দেওয়া ও পরিকল্পনায় সাহায্য করা।

একটু একটু করে তরুণদের মনকে প্রভাবিত ও প্রস্তুত করে তারপর গুপ্ত সমিতির অস্তিত্বের কথা তাদের জানানো হোতো—

"...After the minds of the recruit was prepared he was gradually led to contemplate action of political characters. He was then informed of the existance of the party and that the objeet of the party was to bring about the welfare and independence of India by violent revolution if necessary. Secret societies were started in different parts of the district to propagate ideas and collect arms and rise in rebellion for independence when the time would arise."

(*History of Midnapore—N. N. Das.*)

[সদস্যের মনকে প্রস্তুত করে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা হোতো। তার পর দলের অস্তিত্ব, কর্মসূচী ও প্রয়োজন হ'লে দেশের উন্নতি ও স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব করার জন্য বলা হোতো। জেলার বিভিন্ন স্থানে এই দলের আদর্শ প্রচার ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য এবং সময় হ'লে বিপ্লবে যোগদানের প্রস্তুতির জন্য গোপন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হোলো।]

স্বেচ্ছাসেবক দলের সমগ্র কর্মসূচীকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—শিক্ষা এবং সংগঠন। বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিলেন তাঁরা; এই দলগুলির কাজ ছিল নূতন সভ্য দলে আনা, গুপ্ত সংবাদ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, নানাপ্রকার প্রচার কার্য চালানো, পুলিশ ও গোয়েন্দাদির চালচলন লক্ষ্য করা প্রভৃতি। কেউই নিজ দলের কাজ ছাড়া অন্য দলের সম্বন্ধে কিছু জানতে পারতেন না বা জানতে চাইতেন না। আর ছিল দেশের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা, মাদকদ্রব্য ত্যাগের আন্দোলন, ভাষণদান,

গ্রন্থাগার পরিচালনা, ধর্মানুশীলন, ব্যায়াম চর্চা, লক্ষ্যভেদ, ছোরা ও লাঠিখেলা, বোমা, ডিনামাইট প্রভৃতি বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার, আগ্নেয়াস্ত্র চালনা শিক্ষা প্রভৃতি।

বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের মেদিনীপুর শাখা সাইমন কমিশনের (১৯২৭ খ্রীঃ) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাল। ওদিকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে সুভাষচন্দ্রের দলের যতীনদাস তেষট্টি দিন অনশন করে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করলেন। তারই প্রতিবাদে মেদিনীপুরের জনগণ প্রফুল্ল ত্রিপাঠির নেতৃত্বে হরতাল পালন করলেন। ডিসেম্বরে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে বিরাট এক সম্মেলন হোলো মেদিনীপুর শহরে। সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক রাস্তায় রাস্তায় কুচ-কাওয়াজ করলেন।

সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে জেলার সর্বত্র একটা সাড়া পড়ে গেল। দলে দলে তরুণগণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ভর্তি হতে লাগলেন। সকলের মনেই যেন গুণগুণিয়ে উঠল একই গান—

"A soldier's life is life for me,
A soldier's death is death to me…"

সৈনিকের জীবনই আমার জীবন, সৈনিকের মৃত্যুই আমার (কাম্য) মৃত্যু…।

শহরের তিলক পাঠাগার ও কলেজিয়েট স্কুল লাইব্রেরী সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হোলো এবং তাতে নূতন নূতন বহু গ্রন্থ আনা হোলো। হরিপদ ভৌমিক শাখা-সমিতি খোলার জন্য কাঁথি গেলেন। সেখানে তিনি জ্যোতিষ বেরা, অনিল মাইতি, ভূপাল পাণ্ডা প্রভৃতিকে দলে ভর্তি করে নিলেন। গড়বেতা ও তমলুকে শাখা সমিতি খোলার ব্যবস্থা হোলো। খড়্গপুর থেকে এলেন অমল সেনগুপ্ত, বীরেন ঘোষ ও বীরেন দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

এই বছর (১৯২৯ খ্রীঃ) লাহোর কংগ্রেসে (সভাপতি-জওরলাল)

মেদিনীপুরের স্বেচ্ছাসেবকগণ আগ্নেয়াস্ত্রসহ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন কেননা জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর স্বেচ্ছাসেবকগণ নিরস্ত্র ভাবে সভাসমিতিতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে করতেন না। তাছাড়া মধ্যরাত্রে স্বাধীনতার শপথ উচ্চারণ করবার সময় পুলিশ আক্রমণের আশংকাও ছিল। এই অধিবেশনে স্বাধীনতার জন্ম চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুআরি স্বাধীনতা দিবস রূপে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোলো। ঐদিন নাড়াজোল রাজকাছারিতে বিরাট এক জনসভায় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হোলো।

১৯২৯ এর জুলাই মাসে দীনেশ গুপ্ত ঢাকায় গিয়েছিলেন, তাঁর পরিবর্তে এলেন শশাংক দাশগুপ্ত, বীরেন দাসের পরিবর্তে বরিশাল থেকে এলেন ক্ষীরোদ দত্ত। এই সময় বিপ্লবের নেতৃত্ব এবং কলকাতার কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব ছিল মনি রায়, সত্য গুপ্ত, প্রফুল্ল দত্ত, বিনয় সেন, শশাংক দাশগুপ্ত, বীরেন দাস, রসময় শূর এবং নিকুঞ্জ সেন প্রভৃতির উপর। কাঁসাই নদীর তীরে শহরের শেষ প্রান্তে এক নির্জন দেবমন্দির ছিল বিপ্লবিগণের গোপন মিলন স্থান, আর গোলকুঁয়ার চকের এক কালী মন্দিরে তাঁরা মায়ের সামনে শপথ করতেন 'সাদাপাঁঠা' বলি দেবার। এই কালী মন্দিরটি বিপ্লবীদের একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করে তাঁরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করতেন, আর মায়ের আশিস (পক্ষান্তরে দেশ মায়ের) পাবেন মনে করে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, দেশবিদেশের ইতিহাস ও গণবিপ্লবের কাহিনী, জাতীয় ইতিহাস ও প্রাচীন হিন্দু রাজাদের কীর্তি কাহিনী এবং রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী প্রভৃতির জীবনীমূলক গ্রন্থ ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় পাঠনীয় গ্রন্থ। এছাড়া ছিল নানা প্রকার পুস্তিকা, ইস্তাহার ও প্রচার পত্র যার পাতার পাতায় থাকত আগুন ঝরানো

ভাষা, রক্ত গরম করা জ্বালাময়ী আহ্বান। কয়েকটা উদ্ধৃতি দিলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"...বাঙ্গালীদের কি কোন ধর্ম ছিল না? দেশপ্রেম ছিল না? তারা মহাশক্তির দেবী কালীমাতাকে স্মরণ করুক, তারা তাদের নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করুক, তারা মারাঠা বীর শিবাজীর মহান কার্যাবলীর কথা চিন্তা করুক, বিলাতী জিনিস বয়কটের দ্বারা সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায়ে তারা বিদেশী সরকারের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করুক, তারা নিজেদের জিনিস নিজেরাই প্রস্তুত করুক ·।"

আর একটি ইস্তাহার—

"...কোথায় আজ দধীচি মুনি, যে আজ তার অস্থি দান করতে প্রস্তুত? কার অন্তরে ক্রন্দন জাগছে? কে আজ এগিয়ে যাবে মায়ের দুঃখ ঘোচাবার জন্য? কে আজ প্রাণবলি দিতে প্রস্তুত?...

মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন দাসও একজন বাঙ্গালী ছিলেন। আত্মাহুতি না দিলে জাতির মুক্তিলাভ হয় না। অনাহারে বা রোগের আক্রমণে মরার চেয়ে কর্তব্য করে মানুষের মত মর। এই দুর্ভাগা দেশের জন্মমৃত্যু নির্ভর করছে তোমাদের ওপর......।

—দেশের ডাক

অভয় বাণী—ক্রমিক নং-৯।"

আরো আছে—

"...ভারতের প্রাচুর্য্য আজ দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছেছে। এটা ভাল করে বোঝ। যদি তোমার ধমনীতে এখনো রক্তস্রোত প্রবাহিত হতে থাকে, তাহ'লে এই অবস্থা প্রণিধান করে সেইরূপ কাজে প্রবৃত্ত হও...।

বন্দেমাতরম্

ইংরেজ উচ্ছেদ সমিতি।"

এছাড়া বাংলার লালকোর্তা সমর সমিতির পরিচালক আবদুল হালিম বি. এ.-এর নামাঙ্কিত 'দেশের ডাক', 'সাবধান! সাবধান!',

'অভয়বাণী', 'অত্যাচারীর রক্ত চাই', 'একটি নারীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে একশটি ইংরেজের জীবন চাই' প্রভৃতি এবং ইংরেজ উচ্ছেদ সমিতির প্রচারিত অসংখ্য ইস্তাহার পরবর্তী কালে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রেরণা দিয়েছে, সচেতন করে তুলেছে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে। এছাড়াও ছিল সংবাদপত্রে নানাপ্রকার উত্তেজনামূলক প্রবন্ধ ও দেশের নানা অংশের খবর। প্রেস আইনকে অগ্রাহ্য করে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি বৃটিশের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করে দিত ও সেই সঙ্গে তীব্র সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় মন্তব্য করে অতিষ্ঠ করে তুলত বৃটিশ শাসকদের। এর জন্য দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে বারে বারে বহু হয়রানি ভোগ করতে হয়েছে।

১৯২৯-এর নির্বাচনে কংগ্রেস বেঙ্গল কাউন্সিলের মধ্যে কয়েকটি আসন দখল করে ও জেলা বোর্ড এবং লোক্যাল বোর্ডেও তার ক্ষমতা ও প্রভাব অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন কিশোরীপতি রায় এবং ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন অতুলচন্দ্র বোস। অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে মন্মথনাথ দাস, দেবেন্দ্রলাল খান, শৈলজানন্দ সেন, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, রামসুন্দর সিংহ, প্রমথনাথ ব্যানার্জী, মহেন্দ্রনাথ মাইতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এর পরে একবার কংগ্রেসের অনুরোধে Bengal Legislative Council-এর সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করেছিলেন ও সরকারকে অপমান করবার জন্য নাড়াজোলের এক ঝাড়ুদারকে নির্বাচিত করেছিলেন।

১৯৩০ সালের ১৯শে মার্চ শহরে এক বিরাট জনসভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তার জন্য জেলা, মহকুমা ও থানাভিত্তিক যুদ্ধ-সমিতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। এপ্রিল মাসে বিভিন্ন স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করে কয়েকটি লবণ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপিত হোলো। কাঁথিতে এরূপ একটি

কেন্দ্র হোলো, নাম 'দি প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ' এবং সাগরদ্বীপে একটি, নাম 'দি ন্যাশন্যাল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ'। সত্যাগ্রহী দল নরঘাট ও পিছাবনীতে সর্বপ্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। আটাত্তর জন সঙ্গীসহ গান্ধীজী পায়ে হেঁটে ডাণ্ডী রওনা হলেন ৬ই এপ্রিল। বাঁকুড়া থেকে সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এক বিরাট সত্যাগ্রহী দল কাঁথি এসে পৌছালেন।

বিদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দোকানে পিকেটিং চলল। পিকেটিং চলতে লাগল অফিসে আদালতে স্কুল কলেজে। হাজার হাজার লোক কারাবরণ করলেন, জরিমানা দিলেন, অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করলেন তবুও আন্দোলন ত্যাগ করলেন না। বৃটিশের পুলিশ অসংখ্য গৃহে অগ্নিসংযোগ করেছে, নারী ও শিশুর উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে, ধৃত তরুণদের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, যত্রতত্র খানাতাল্লাসী, লুঠতরাজ, গুলি ও লাঠি চালনা তো ছিলই। তবুও মেদিনীপুরের মরিয়া জনশক্তি কখনো পশুশক্তির কাছে হার মানেনি। বারবার গড়ে তুলেছে তারা বিপ্লবের নানা পরিকল্পনা, অগণিত প্রাণের বিনিময়ে তারা চেষ্টা করেছে বিদেশীদের হটিয়ে দিতে।

বিলাতী দ্রব্যের বদলে দেশের লোক ব্যাপক ভাবে দেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। সরকারী কার্যে সহযোগিতা না করে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হোলো। চারিদিকে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল; দেশের কাজে সবাই কিছু করতে চায়; আত্মদানের জন্য তরুণদের মন হয়ে উঠল উন্মুখ। কবিগুরুর ভাষায় এ যেন সেই—

"আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি..."

পরবর্তিকালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বন্দীদের যে হিসেব দেওয়া

হয়েছে তা দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায় এই আন্দোলন কিরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিতের সংখ্যা ছিল ১৯৩২ সালে—

জানুআরি মাসে	১৪৮০০	জন
ফেব্রুআরি মাসে	১৭৮০০	„
মার্চ মাসে	৬৯০০	„
এপ্রিল মাসে	৫২০০	„
মে মাসে	৩৮০০	„

এই মাসের শেষে মোট আটকের সংখ্যা ছিল ৩১১৯৪ জন। এই বছর জানুআরি থেকে ২০শে এপ্রিলের মধ্যে সারা ভারতে আশি হাজারেরও উপর লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, তার মধ্যে ৫৩২৫ জন মহিলা। মোট ১৬৩টি ছাপাখানা ও সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই তথ্য মদনমোহন মালব্যের। কিন্তু সরকারী হিসেবে দেখা যায় এই আন্দোলনে মোট ৪৪৭৫৩ জন কারাবরণ করেন। এছাড়া বিনা বিচারে আটক বন্দী যে কত ছিল তার ইয়ত্তা নেই।

সারা বাংলার বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্র এই মেদিনীপুর তখন একটি বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। এই স্তূপ পরবর্তী-কালে কিরূপে অগ্নিবৃষ্টি করেছিল তা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। মেদিনীপুরের এই ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগ পৃথিবীর ইতিহাসে মর্যাদাসহ স্থান পাবার যোগ্য। মুষ্টিমেয় কয়েকজন তরুণ প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সীমিত শক্তি ও সমর উপকরণ নিয়ে লাঠির বদলে লাঠি, হত্যার বদলে হত্যা, অত্যাচারের বদলে অত্যাচার, নিষ্ঠুরতার বদলে উপযুক্ত শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃত্যুগহ্বরে —প্রাণ তুচ্ছ করে। বৃটিশের নানা প্রকার অত্যাচারকে ক্ষমা করতে পারেনি তারা। মাঝে মাঝে তারা উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছে। ১৯৩০ সালের ৩রা জুন দাসপুর থানার চেচুয়া হাটে বিলাতী দ্রব্যের দোকানগুলিতে পিকেটিং চলছিল। থানার দারোগা

ভোলানাথ ঘোষ সকলের সামনে একজন কংগ্রেস কর্মীকে নির্মম ভাবে বেত্রাঘাত করলে সকলে তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করে। দারোগার সঙ্গে তার সহকারী অনিরুদ্ধ সামন্তও নিহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহ সরিয়ে দেওয়া হয়। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘাটালের এস. ডি. ও. ফজলুল করিম ৭ই জুন ঐ হাটে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাবার হুকুম দিলেন। ফলে চৌদ্দ জন নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হয়। দারোগা হত্যার অভিযোগে পঁয়তাল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়—এদের মধ্যে বার জনের দ্বীপান্তর ও পাঁচ জনের সাত বছর করে জেল হোলো, বাকী সব ছাড়া পেলেন। বার জন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম—

মণীন্দ্র চক্রবর্তী — শীতল ভট্টাচার্য
পার্বতী তুলে — জীবনধর পতি
যোগেন্দ্র হাজরা — কালাচাঁদ ঘাঁটি
বিনোদ বাগ — অনন্ত হাজরা
ভূতনাথ মান্না — সুরেন বাগ
ব্রজকিশোর ভূঞা — কালীপদ সামন্ত

চেঁচুয়া হাটে গুলি চলবার দিন কয়েক পরে ১১ই জুন পিংলা থানার ক্ষীরাই-এ পুলিশ গুলি চালাল (বাংলা ১৩৩৭ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, স্নানপূর্ণিমার দিন।)। এতে নিহত হলেন—

ভীমচরণ জানা (সাহাড়দা) — নরেন্দ্রনাথ দাস (ক্ষীরাই)
পূর্ণেন্দু ঘোড়ই (গোবর্ধনপুর) — ধনঞ্জয় মণ্ডল „
অদ্বৈত ধাড়া (ক্ষীরাই) — শ্রীমন্ত মাইতি (দণ্ডশীরা)
অধরচন্দ্র সিং „ — লক্ষ্মণ বেরা (মিতীবিন্দা)
বাবুলাল জানা „ — মহেশ্বর মাইতি (রাজমা)
গোপীনাথ খাঁড়া „ — জগন্নাথ ভক্ত (কুঞ্জপুর)
নরেন্দ্রনাথ পাড়ই (ক্ষীরাই) — কালাচাঁদ মাঝি (কুলতাপাড়া)
ত্রৈলক্য গুছাইত (রাত্রাপুর—আহত ও পরে মৃত্যু)

[এই তালিকাটি দিয়েছেন ক্ষীরাই-এর খাদীকর্মী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।]

বৃটিশের এই সব বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মেদিনীপুরের তরুণগণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেমস প্যাডি, পুলিশ সুপার মিঃ কিড ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঃ নর্টন জোন্সকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোলো।

বাংলার অন্যান্য অংশেও বিপ্লবীদের সক্রিয়তা এই সময় প্রবলাকার ধারণ করে। ৮ই ডিসেম্বর বিনয়, বাদল এবং দীনেশ সুরক্ষিত রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ করেন এবং জেল ইন্সপেক্টর মিঃ সিমসনকে হত্যা করেন। তিনজন মাত্র বাঙ্গালী তরুণ সরকারের সদর কার্যালয়ে সেদিন যে তোলপাড় কাণ্ড করলেন ইতিহাসে তা 'অলিন্দ যুদ্ধ' নামে খ্যাত। সরকারী সৈন্যের সম্মিলিত আক্রমণে শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরাজিত হতে হয়েছিল ঠিকই, তবুও জগতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এরূপ অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন তাঁরা যা তুলনা রহিত। বিনয় ও বাদল আত্মহত্যা করলেন সেখানেই, দীনেশের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোলো ; তাঁকে পরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

যাই হোক পরের বছর থেকেই মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে উঠেন। জানুআরি মাসেই (১৯৩১ খ্রীঃ) সদর মহকুমা শাসক শংকর সেন এবং কাঁথি মহকুমার পুলিশ অফিসার সামসুল হুদাকে হত্যার ভার পড়ল ফণী কুণ্ডু ও ফণী দাসের উপর। বিপ্লবীদের উপর অত্যাচারের জন্য এই দুই ব্যক্তি বিপ্লবীদের বিরাগভাজন হন। সদরঘাটে এই সুযোগ নিতে গিয়ে তাঁরা ব্যর্থ হলেন—পুলিশ প্রহরীদের জন্য তাঁরা কাছে যেতেই পারলেন না।

জেলা শাসক মিঃ জেমস প্যাডি ছিলেন কড়া মেজাজের লোক। গোয়েন্দা বা গুপ্তচরদের কথায় বিশ্বাস না করে প্রকাশ্যে ধমক দিয়ে, চাবুক মেরে বা 'জুতার ঠোক্কর' দিয়ে বিপ্লবীদের সায়েস্তা করতে চেয়েছিলেন তিনি। মার্চ মাসে (১৯৩১ খ্রীঃ) তিনি পাঁশকুড়া

থেকে ট্রেনযোগে মেদিনীপুরে আসছিলেন। খবর পেয়ে রামকৃষ্ণ রায় বললেন—

"It must be done. I alone will finish it and die for my country."

"এটা করতেই হবে—আমি একাই এটাকে শেষ করব ও আমার দেশের জন্য মরব।" কলেজ থেকে পটাসিয়াম সায়ানাইড সংগ্রহ করে ছোরায় মাখান হোলো এবং ফণী কুণ্ডুকে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণ খড়্গপুর রওনা হলেন। কলকাতা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র আনার আর সময় ছিল না। খড়্গপুর স্টেশনে কড়া পাহারা, তবুও তিনি ট্রেন কামরার জানালা ভেঙ্গে কামরায় ঢুকতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ফণী বাধা দিলেন—কেননা ঐ কাজে খুব বিপদের ঝুঁকি ছিল। দুজনেই ঐ ট্রেনে মেদিনীপুরে এলেন সুযোগের আশায় কিন্তু অতিরিক্ত পাহারার ব্যবস্থা থাকায় তাঁরা প্যাডির কাছে যেতেই পারলেন না। ফিরে এসে শহীদ হতে না পারার জন্য রামকৃষ্ণের সে কি কান্না ··!

পরে পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী ঘেরাও করে তাকে হত্যা করার এবং যত অল্প সময়ের জন্যই হোক স্বাধীনতা ঘোষণা করারও এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কিন্তু কলকাতার কেন্দ্রীয় সমিতি তা সমর্থন করল না। মেদিনীপুরের কর্মিগণ অন্য উপায় খুঁজতে লাগলেন।

সুযোগ আসতে দেরী হোলো না। কলেজিয়েট স্কুলে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। ১লা এপ্রিল (১৯৩১ খ্রীঃ) ম্যাজিস্ট্রেট সেটির উদ্বোধন করবেন কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসেননি। ৬ই পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল কিন্তু প্যাডি একদিনও এলেন না। বিপ্লবী সমিতি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ জানালেন প্রদর্শনী আরো দিন কয়েক রেখে দিতে ও সমাপ্তি উৎসবে মিঃ প্যাডিকে নিমন্ত্রণ জানাতে। বিমল দাশগুপ্ত ও

যতিজীবন ঘোষ প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ৭ই সন্ধ্যায় প্যাডি সাহেব এলেন প্রদর্শনী দেখতে। সঙ্গে কয়েকটি কুকুর ও জনকয়েক ইউরোপীয় অফিসার। প্রদর্শনীতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ছিল না। ম্যাজিস্ট্রেট বিভিন্ন কক্ষে ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনী দেখছিলেন। অফিসারগণ একবার একটু পিছিয়ে পড়ল। এমনি সময় একটি কক্ষে যতিজীবন ও বিমল খুব কাছে থেকেই গুলি চালালেন। উপর্যুপরি কয়েকটি গুলি চালিয়ে তাঁরা দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। সেখানে সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রাতের অন্ধকারে ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে তারা এলেন সোজা শালবনী, সেখান থেকে গোমো হয়ে কলকাতায়। ফণীবাবু বেশ কয়েক ঘণ্টা চুপচাপ থেকে ওদের পালাবার সুযোগ করে দিলেন—পরে থানায় গিয়ে জানালেন অপরিচিত দু'জন যুবক তার কাছ থেকে সাইকেল ছিনিয়ে নিয়েছে—।

ওদিকে প্যাডির সঙ্গী ইউরোপীয় অফিসারগণ দৌড়ে এসে দেখলেন আহত রক্তাক্ত প্যাডি একটা হাইবেঞ্চের উপর দেওয়ালে ঠেস দেওয়া একটা রিলিফ ম্যাপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আসেন। পরের দিন সদর হাসপাতালে প্যাডি মৃত্যু হোলো। মৃত্যুকালে আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন—

"The police were not conscious of such a potential revolutionary party."

'এরূপ একটা মারাত্মক বিপ্লবীদল সম্বন্ধে পুলিশ সচেতন ছিল না।' সত্যিই এ দেশের বৃটিশ কর্মচারীদের এ আক্ষেপ কোনদিনই গেল না…।

প্যাডি হত্যার অপরাধে পুলিশ প্রথমে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারল না। বিমল ও যতিজীবন কলকাতায় দলের কয়েক জনের বাসায় লুকিয়ে রইলেন। এদিকে মেদিনীপুরে প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর

বাড়ী সার্চ করে পুলিশ বিপ্লবীদলের স্বেচ্ছাসেবকদের নামের একটি তালিকা পায়। এই তালিকা অনুযায়ী পরে গ্রেপ্তার করা হোলো। প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, ক্ষীরোদ দত্ত, শীতল আঢ্য, বিবেক বোস, শচীন মাইতি, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, পরিমল রায়, রামশংকর চক্রবর্তী. নির্মল অধিকারী. নিমাই পাল, ফণী কুণ্ডু, বিনোদ সেন, অমর চ্যাটার্জী প্রভৃতিকে। যতিজীবন ঘোষ, বিমল দাশগুপ্ত, কামাখ্যা ঘোষ, ক্ষিতি সেন ও নরেন দাসের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হোলো। প্যাডি হত্যার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে যতিজীবনের বাড়ী খানাতল্লাসী হোলো। কেননা ইতিমধ্যে তিনি বাড়ী ফিরে এসেছিলেন, বাড়ীতে আপত্তিকর কিছু পাওয়া না গেলেও যতিজীবনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিমল দাশগুপ্ত ফিরে এসেছেন শুনে পুলিশ তার বাড়ীতে চড়াও হোলো। তার দাদা বিনয়ভূষণ তখন ছিলেন জেলা পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমানে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার) লাইব্রেরিয়ান। তিনি খিড়কির দরজা দিয়ে বিমলকে বের করে নিয়ে গেলেন ও পাঠাগারের বই-এর আলমারির পিছনে লুকিয়ে রাখলেন। পরে শহীদ সত্যেনের ভাই ভূপেন্দ্রনাথেব সহায়তায় রঘু গোয়ালা নামে এক বিহারীর সঙ্গে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে বিমল কলকাতায় পালিয়ে গেলেন। বিমল সন্দেহে পুলিশ এলোপাথাড়ি বহু লোককে গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুরে আনতে লাগল। বিমলের আত্মীয় বলে মেদিনীপুর শহরে কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হীরালাল দাশগুপ্তকে বরখাস্ত ও জেলা থেকে বহিষ্কার করার আদেশ দেওয়া হোলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্যাডি হত্যা মামলায় প্রমাণাভাবে কাউকেই শাস্তি দিতে পারা গেল না, সবাই মুক্তি পেলেন।

বিমল দাশগুপ্ত কিন্তু বেশীদিন চুপ করে থাকেন নি। ১৯৩১ সালের ২৯শে অক্টোবর সকাল সাড়ে এগারটার সময় তাঁকে আবার

দেখা গেল ৮০নং ক্লাইভ স্ট্রীটের (বর্তমানে নেতাজী সুভাষ রোড) গিলিয়াণ্ডার হাউসের উপর তলায়। চাকুরী প্রার্থী এক মুসলমান যুবক সেজে তিনি ইউরোপীয় সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্স-এর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। মাথায় ফেজ টুপি পরা চাকুরীপ্রার্থী এই মুসলমান যুবকটি কক্ষের ভিতরে ঢুকেই রিভলবার বের করে বাঘের মত টেবিলের উপর উঠে পড়লেন। সাহেব ভয়ে টেবিলের তলায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। সাহেবের বন্ধু মিঃ লকহার্ট ও অন্য দুজন ইউরোপীয় অফিসার ধস্তাধস্তি করে যুবককে কাবু করে ফেলে। পুলিশের হাতে ধরা পড়বার পর জানা গেল এই অসমসাহসী যুবক মেদিনীপুরের পলাতক বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত।

('বিপ্লবী মেদিনীপুর'—বিনয় জীবন ঘোষ, দ্রষ্টব্য।)

এই সময় বিপ্লবীদলের সংগঠন ছিল সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত, এদের কার্যাবলী এত গোপনে এবং সাবধানতার সঙ্গে সংগঠিত হ'ত যে বৃটিশের শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী ও ঝানু গোয়েন্দার দলও তার হদিশ করতে পারত না। এ প্রসঙ্গে গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জাক্সন-এর মন্তব্য পড়লে সহজেই বোঝা যায়। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—

"Terrorism in Bengal is still rather serious but······ there has been a very marked change in public opinion, on which you must depend if you want to deal satisfactorily with terrorism, you must depend also on Indian assistance."

'also on Indian assistance' কথাটি লক্ষণীয়। বিপ্লবীদের

[বাংলার বিপ্লববাদ এখন আরো বিপজ্জনক তবে বর্তমান জনমত কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, যার উপর নির্ভর করতে পার। আর সার্থক ভাবে এর মোকাবিলা করতে হলে ভারতীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করতেই হবে।]

সঙ্গে সন্তোষ জনক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে ভারতীয়দের সহযোগিতা যে চাই-ই তা তাঁরা বুঝেছিলেন ; আর সেই জন্যেই নানা প্রলোভন ও অনেক ছল-চাতুরী করে এক শ্রেণীর দেশীয় ব্যক্তিদের সহায়তায় সরকার বাংলার বিপ্লববাদ দমনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অর্থ আর পদোন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে ও ইনফরমারদের বিপ্লবীদের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে শাসক সম্প্রদায়। কেননা জাক্সনের কথায়ই বলি—

"......It is most difficult to get any information regarding terrorists, though I suppose we have the finest C. I. D. service in India."

[যদিও আমি মনে করি ভারতে আমাদের ভালো গোয়েন্দা দল আছে তবুও বিপ্লবীদের সম্বন্ধে খবরাদি সংগ্রহ করা খুব কষ্টকর।]

নানা প্রতিকুল অবস্থায় দমেনি বৃটিশ রাজশক্তি। শাসন ক্ষমতা তো তাদের হাতেই। ফলে নানাপ্রকার দমনমূলক আইন তৈরী করে যদৃচ্ছ ভাবে কাজে লাগাতে একটুও দ্বিধা করেনি সরকার। বিভিন্ন সময়ের এই সকল আইন এবং তার সুবিধামত কু-ব্যাখ্যা বৃটিশ কুশাসনকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছিল। সেটা অতি সহজেই ধরা পড়েছিল তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের চোখে—কাজেই ঐ সকল আইন সম্বন্ধে প্রায়ই নানা বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা সংবাদপত্রে লেখা হোতো। প্রয়োজন ও সুবিধা মত বৃটিশ আবার সেগুলি সংশোধন করে প্রয়োগ করত বিনা দ্বিধায়। প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বলে জেল থেকে ছাড়া পাবার অব্যবহিত পরেই আবার গ্রেপ্তার করা হোতো এবং সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি হিসেবে তাদের আটকে রাখার নিয়ম চালু হয় (১৯৩১ খ্রীঃ)। এথেকেই শুরু হয় বিনা বিচারে আটক রাখবার মত আইনের। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের উনিশ মাস ব্যাপী বিচারের পর ষোল জন

আসামী বেকসুর খালাস পান কিন্তু তাঁদের পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। মিঃ প্রেন্টিশ স্বীকার করেছিলেন ১৯৩২ সালের ২৩শে মার্চ বিয়াল্লিশ জন জেল থেকে মুক্তি পাবার পর আবার তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৭১৭ জনকে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়েছিল। গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর মামলায় ষোল জন মুক্তি পেলেও তাদের মধ্যে এগার জনকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। আরো দুশ জন বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলাকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখা হয়েছিল। এদের বিচার বা অপরাধ প্রমাণের কোন চেষ্টাই হয়নি, মাত্র পঞ্চাশ জনের বিচার হয় এবং তারা বেকসুর মুক্তি পায়। কাজেই বোঝা যায় এই আইন ছিল বৃটিশের উদ্দেশ্য-মূলক ও স্বার্থান্বেষী মনোভাবের প্রকাশ মাত্র। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শাস্তি দেবার অজুহাত মাত্র। এসম্বন্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনা যে হয়নি তাও নয়। এ প্রমাণ তৎকালীন কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির মতামত উল্লেখ করা হোলো। ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী বলেন—

"বিনা বিচারে আটক রাখিয়া গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। জুলুম হইতে প্রতিশোধের ইচ্ছা জন্মে এবং তাহা হইতে আবার জুলুমের প্রবৃত্তি আসে। এই গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ও বিপ্লবীরা ঘুরপাক খাইতেছেন। আমরা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিভীষিকা উৎপাদনের সমর্থন করিতে পারি না। আমি এই সভাকে (ব্যবস্থাপক সভা) স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে ১৯২৫ সালে স্যার হিউ স্টিভেনসন স্বীকার করিয়াছিলেন ১৯০৮ সালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতিকে বিপ্লববাদের জন্য আটক করা হয় নাই,—তাহারা বয়কটের প্রচার কার্য ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতেছিলেন বলিয়াই তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছিল। এইরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই গভর্ণমেণ্ট কাজ করিয়া থাকেন।"

দেওয়ান বাহাদুর এ. রঙ্গস্বামী মুদালিয়র বলেন—

"নৈতিক সমর্থনের পোষকতা না থাকিলে কোন আইন কার্যকরী হয় না। বোধ করি সেইজন্য বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের দ্বারা এতদিনেও বঙ্গের বিপ্লব প্রয়াস লয় পায় নাই।"

এই সমস্ত আটক বন্দীদের সঙ্গে অন্যান্যদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্য এদের বাংলার বাইরে চালান দেবার ব্যবস্থা হোলো। আজমীঢ় রেল স্টেশন থেকে সত্তর মাইল দূরে দেউলিতে পৃথক একটি জেলখানা স্থাপিত হোলো। এসম্বন্ধে সি. এস্. রঙ্গ আইয়ার বলেছিলেন—

"আমি ধরিয়া লইতে বাধ্য যে রাজবন্দীরা সকলেই নির্দোষ। বিপ্লববাদ দ্বারা যদি এদেশে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে গভর্ণমেণ্ট বন্দীদিগকে আজমীঢ়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাহা অপেক্ষাও সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি করিতেছেন।"

স্থির হয় বিনা বিচারে আটক বাঙ্গালী রাজবন্দীদের সুদূর দেউলিতেই রাখা হবে। এর প্রতিবাদে সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বললেন—

"আমি এই ব্যবস্থাপক সভাকে নিশ্চিত ভাবে বলিতেছি যে, এই বিলটি পাশ করিলে তাহারা ডেটেনুদের (বিনাবিচারে আটক বন্দী) সমাধি খনন করিবেন।"

স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর সরকারকে হুশিয়ার হতে বললেন—" আমি গভর্ণমেন্টকে সাবধান করিয়া দিতেছি এই উপায়ে ভারতবর্ষ শাসন করা চলিবে না।"

অতঃপর দেউলি জেল ও সেখানে বন্দীরা কিরূপে ব্যবহার পেত সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আগেই বলেছি স্থানটি আজমীঢ় স্টেশন থেকে প্রায় সত্তর মাইল দূরে। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ও অস্বাস্থ্যকর এই স্থানটিতে কয়েদীদের থাকতে হোতো। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমে অবর্ণনীয় অবস্থা হোতো।

এছাড়া নানা প্রকার বাধানিষেধ ও অত্যাচার তো ছিলই। জেলখানার মধ্যে যে সমস্ত অন্যায়মূলক আচরণ করা হোতো সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে—

প্রথমতঃ, এই জেলে যে সকল বন্দী ছিল তাদের মধ্যে বাঙ্গালী বিপ্লবীদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আইন সংশোধনের প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই, ফলে বিপ্লবীরা কোন আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত হিতৈষী বন্ধুর সঙ্গে সহজে দেখা করতে পারতেন না। এমনকি বাঙ্গালীদের বাঙ্গালী খাদ্য দেওয়ারও কোন ব্যবস্থা ছিল না যদিও চারশ-এর বেশী বাঙ্গালী রাজবন্দী এখানে আটক ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, আটক বন্দীরা নিজেদের অভাব অভিযোগাদি সম্পর্কে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট কোন আবেদন পাঠাতে পারতেন বটে কিন্তু এখানে এমন এক কৌশল ছিল যে হতভাগ্য বন্দীদের উপর শত অত্যাচার হলেও সেকথা প্রকাশ হোতো না। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পাঠাতে হ'লে তা জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মাধ্যমে ও তার মন্তব্য সহ পাঠাবার নিয়ম ছিল। আপত্তিকর বা অপমানজনক কিছু থাকলে তিনি তা না পাঠিয়ে নষ্ট করে দিতে পারতেন ও নিয়মমাফিক তা আবেদককে জানিয়ে দিতেন; ফলে জেলের দুর্ব্যবহার ও নির্যাতন বা প্রহার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ তাতে লেখা চলত না—তার কোন প্রতিকারের সম্ভাবনাও ছিল না।

তৃতীয়তঃ, জেলকোডের ১০ম ও ১১শ নিয়মানুসারে দেউলি জেলের কোন অফিসার ও পাহারাওয়ালা নিম্নলিখিত কারণগুলির যে কোন একটি বা একাধিক সংঘটিত হচ্ছে দেখলে বন্দীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার, সঙ্গীন, লাঠি, বন্দুক বা অন্য যে কোন অস্ত্র যতক্ষণ ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে, তার কারণগুলি এই—

ক) বন্দী পলায়নপর হইলে বা পলায়নের চেষ্টা করিলে,

খ) বন্দী বিদ্রোহ করিলে,

গ) গেট খুলিবার বা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে,

চ) তারের বেড়া বা দেওয়াল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে,

ঙ) বন্দী কোন জেল কর্মচারীর উপর বলপ্রয়োগ করিলে।

চতুর্থতঃ, বন্দীদের সংবাদপত্র পাঠ করবার অনুমতি ছিল, কিন্তু পঠনীয় পত্রপত্রিকাগুলির একটি নির্দিষ্ট তালিকা দেওয়া থাকত। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, এই তালিকায় এমন অনেক পত্রিকার নাম থাকত যেগুলি হয়ত বন্ধ হয়ে গেছে নয়ত দুষ্প্রাপ্য। (যেমন তালিকায় লিখিত জগদীন্দ্রনাথ রায়ের 'মানসী' ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মর্মবাণী' তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।)

এর উপর সামান্য কারণে বা অনেক সময় বিনাকারণেও কয়েদীদের উপর দৈহিক নির্যাতন চলত। এই সব দুর্ব্যবহারে বন্দীদের জীবন হয়ে উঠত অতিষ্ঠ, দুর্বিষহ। এরজন্যই পরে মৃণালকান্তি রায় নামে একজন বন্দী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। অনেকের মতে অতিরিক্ত প্রহারে তার মৃত্যু হয় পরে তার মৃতদেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের শাসনের এমনি নজির আরো আছে। জেলে তখন এমনি অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রায়ই হোতো। ঢাকার অনিলকুমার দাস মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মারা যান। মেদিনীপুরের নবজীবন ঘোষকে (শহীদ নির্মল জীবন-এর ভাই) বহরমপুর বন্দীশালা থেকে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের থানায় অন্তরীণ রাখা হয়। পুলিশের অত্যাচারে এবং অতিরিক্ত প্রহারের ফলে তিনি মারা যান (সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ খ্রীঃ)। প্রচার করা হয় তিনি আত্মহত্যা করেছেন। এর কয়েকদিন আগে মাণিকগঞ্জে আটক আর একজন রাজবন্দীকে হত্যা করে পুলিশ নিকটের এক বিলে তার মৃতদেহ ফেলে দেয়। এ সম্বন্ধে কংগ্রেসে সমষ্টিগত ভাবে এবং ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণমেনন, বিপ্লবী বিনয় জীবন ঘোষ প্রভৃতি প্রতিবাদ জানান, কিন্তু বিশেষ কিছু প্রতিকার

হয়নি। অমানুষিক অত্যাচারের ফলে সন্তোষ চন্দ্র গাঙ্গুলী নামে আর একজন রাজবন্দীর এরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছিল।

বৃটিশের বন্দীশালার সর্বত্রই ছিল এমনি পৈশাচিক নির্যাতনের নরককুণ্ড। যখন তখন অমানুষিক প্রহার ও নানাপ্রকার দৈহিক নির্যাতন তখনকার পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষের হাতিয়ার ছিল বিপ্লবীদের শায়েস্তা করবার ; অন্ততঃ তারা তাই মনে করত।

আন্দামানের সেলুলার জেলে অন্যায়ের প্রতিবাদে অনশন করলে ডাক্তার জোর করে নাকের মধ্য দিয়ে পেট পর্যন্ত রবারের নল চালিয়ে দিত, এতে দারুণ কষ্ট হোতো। এর জন্য মোহিত মিত্র, মোহন দাস ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মহাবীর সিং মারা যান। নিরঞ্জন সেন ও সুখেন্দু দাসের নাড়ী পাওয়া যাচ্ছিল না বলে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়—তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বরিশালের হীরামোহন চ্যাটার্জী নামে একটি ছোট ছেলে অত্যাচারের ফলে একেবারে নিষ্পন্দ হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় মেদিনীপুরের শতাধিক যুবক বিভিন্ন বন্দীশালায় বিনা বিচারে আটক ছিলেন। এতো করেও বাংলার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে পারেনি বৃটিশ। মিঃ প্রেন্টিসের দেওয়া নিচের এই হিসাবটিই তার প্রমাণ। এর থেকে কয়েক বছরের বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর হিসাব পাওয়া যায়—

	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২
হত্যা—	০	২	১১	৮	১০
হত্যার চেষ্টা	৩	২	২৩	২৩	২৭
ডাকাতি	০	৩	১৭	৪১	৫৭
অন্যান্য	০	১	২	৯	৩
মোট	৩	৮	৫৩	৮১	৯৭

(১৫/৩/১৯৩৩ এর আনন্দবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য)

'Bengal Emergency Powers' Ordinance'-এর মেয়াদ

১৯৩২ সালের মে মাসে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা—কিন্তু তার আগেই সামান্য অদল বদল করে ঐটিই পুনর্ঘোষণার দ্বারা চালু রাখা হয়। যদিও ভারত শাসন আইনের '৭২ ধারা অনুযায়ী কোন অর্ডিন্যান্স ছয় মাসের বেশী চালু থাকতে পারে না।

যাই হোক এই নূতন সংশোধিত অর্ডিন্যান্সটির দ্বারা স্থির হোলো—

[এক] তিনজন হাইকোর্টের জজের পরিবর্তে জেলা সেসন জজ বা তৎসম পদের তিনজন বিচারক নিয়ে বিশেষ আদালত গঠন করা যেতে পারে। অবশ্য এদের বিচারের পর হাইকোর্টে আপীল চলবে।

[দুই] স্থলবিশেষে এই আদালতের বিচার অপ্রকাশ্য ভাবে হতে পারবে।

[তিন] চট্টগ্রাম জেলায় এবং গভর্নমেণ্টের ইচ্ছা হইলে অন্যত্রও সামরিক কর্মচারীদিগকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা গভর্নর দিতে পারবেন, এবং

[চার] হত্যার প্রচেষ্টার জন্যও প্রাণদণ্ড হতে পারবে।

পরবর্তিকালে এই আইনের বলে বৈপ্লবিক ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার হতে লাগল এবং নিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও হত্যার চেষ্টার অপরাধে বিচারের নামে নির্বিচারে ফাঁসী ও জেল, দ্বীপান্তর প্রভৃতির ব্যাপক প্রয়োগ হতে লাগল।

দমননীতির আর এক অপকৌশল ছিল। নিজেদের কুকীর্তির কথা যাতে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল বৃটিশ কর্মচারিগণ। নির্লজ্জ ভাবে দেশের সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তারা। কোন প্রকার সরকার বিরোধী-মন্তব্য দেখলেই মামলা দায়ের করে নিজেরাই বিচার করত এবং অযথা হয়রানি করত। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে এরূপ মামলা হয়েছে। এদের নির্লজ্জতা প্রকাশ পেল এরূপ একটি মামলায়।

বোম্বাই-এর 'ডেলি মেল' একটি প্রগতিপন্থী সংবাদপত্র, প্রেস অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় সরকার আপত্তিকর বিধায় কয়েক হাজার টাকা জামিন তলব করে। এমন কি হাইকোর্টে আপীলও মঞ্জুর হয়নি। পরন্তু রায়ে বলা হোলো—

"......হাইকোর্টের মতে প্রেস আইন ও অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সরকারের বিরুদ্ধে যাই লেখা হোক তা সত্য বা মিথ্যা বিচারে প্রয়োজন নাই। সরকারের অসদাচরণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লিখিত প্রত্যেক অভিযোগ সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক বর্তমান প্রেস আইনের ৪র্থ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ......।"

আইনের অপব্যাখ্যা কি সুন্দর ভাবে সুবিধাবাদীর হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। সরকারের দুর্নীতি ও কুকীর্তির কোনরূপ সমালোচনাই করতে দেওয়া হবে না। অথচ এই প্রেস আইন চালু করবার সময় ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর বলেছিলেন—

"......The action taken against the Indian Press had been taken for one purpose only, namely, to stop incentives to disorder and terrorism and not stifle expression of public opinion......"

[ভারতীয় সংবাদপত্রের উপর এই বাধা-নিষেধ প্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল বিপ্লববাদ ও বিশৃঙ্খলা থামানো, জনমতের কণ্ঠরোধ করার জন্য নয়।]

উদ্দেশ্য ও তার প্রয়োগ ক্ষেত্র এ দুই-এর মধ্যে কত আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। শুধু দেশীয় সংবাদ-পত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল তা নয়, বিদেশে কোন সংবাদাদি আদান প্রদানের পথও রুদ্ধ করা হয়েছিল। তবুও বিদেশের কয়েকটি পত্রিকা মাঝে মাঝে ভারতে বৃটিশের কুশাসনের যে চিত্র তুলে ধরত তাতে আর কতটুকুই বা প্রকাশিত হ'ত তাদের পর্বত-প্রমাণ দুষ্কর্মের বোঝার কথা।

'হিজলী ট্রাজেডি'

আবার মেদিনীপুরের বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। সেখানে তখন আর এক অগ্নিকাণ্ডের ধূমায়িত পরিবেশ আর এক নাটকের দৃশ্যাবতারণার অপেক্ষায়। জেলা শাসক মিঃ জেমস্ প্যাডি নিহত হবার পর ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন মিঃ ডগলাস। ইনি স্বভাবে ভীতু ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিশেষ করে ক'জন ছাড়া তিনি কারো সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করতেন না। বাইরেও খুব বেশী যেতেন না। ফলে গোয়েন্দা গুপ্তচরদের কথায় তাঁকে বিশ্বাস ও নির্ভর করতে হ'ত বেশী। আর এই জন্যই তিনি বিপ্লবীদের বিরাগভাজন হন। এই সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তাঁর উপর বিপ্লবীদলের ক্রোধ আরো বেড়ে গেল।

১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩১ খ্রীঃ) রাত্রে হিজলী বন্দীশালায় এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় বন্দীশালার পাহারাওয়ালাগণ বন্দীব্যারাকে, শয্যাকক্ষে, খাবার ঘরে এমনকি হাসপাতালেও বেপরোয়া গুলি ও লাঠি চালাল। ফলে বন্দী সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেন ঘটনা স্থলেই নিহত হলেন— গোবিন্দপদ দত্তের বাম হাতে এমন আঘাত লাগল যে পরে সেটি কেটে ফেলতে হয়। আরও কুড়ি পঁচিশ জন গুরুতররূপে আহত হলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র মৃতদেহ দুটি কলকাতায় নিয়ে এলেন এবং শোক শোভাযাত্রা সহকারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হোলো। অন্যান্য বন্দীরা অত্যাচারের প্রতিকার আশায় অনশন আরম্ভ করলেন।

এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে জেলা শাসক ডগলাস বন্দীশালার বৃটিশ অফিসার ও পুলিশ কর্মচারীদের কথায় বিশ্বাস করে এই শোচনীয় ঘটনার জন্য বন্দীদেরই দায়ী করলেন। প্রহরীদের বক্তব্য ছিল রাজবন্দী যুবকগণ তনং প্রহরী চন্দ্র সিংকে আক্রমণ করবার ভয়

দেখায়, তাই তাদের নিবৃত্ত করবার জন্য উপর দিকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। তারই জন্য গোলযোগ আরম্ভ হয়ে যায়। রাজবন্দীদের মতে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ পরিকল্পিত, হিংসাত্মক এবং জঘন্য ষড়যন্ত্রের ফল। জন কয়েক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও কমাণ্ডান্ট মিঃ বেকার এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক সত্যেন মল্লিক ও রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ জে. জি. ড্রামণ্ড তদন্ত করে রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিলেন। ফলে বিপ্লবীরা মনে করলেন ডগলাসের নির্দেশেই এই সব অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে। এই সময় গুজব শোনা গেল কঠোর দমননীতির দ্বারা বিপ্লবীদের সায়েস্তা করার জন্যই কর্তৃপক্ষ ডগলাসকে ম্যাজিস্ট্রেট করে পাঠিয়েছিল।

২৮শে সেপ্টেম্বর 'নায়ক' পত্রিকায় 'হিজলীতে নৃশংস কাণ্ড' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে হিজলীর ঘটনা পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে বর্ণিত ছিল ও তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল এবং যথাযোগ্য তদন্তের দাবী করা হয়েছিল। ফলে রাজদ্রোহ-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ঐ পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহরায় ও মুদ্রাকর এবং প্রকাশক যামিনীকান্ত নাগের ছয় মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড হোলো।

ওদিকে গোলটেবিল বৈঠক থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন গান্ধীজী। ১৯৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। মেদিনীপুরে এই আন্দোলন ভীষণাকার ধারণ করল। প্রতিদিন নানা প্রকার বুলেটিন ও ইস্তাহার প্রকাশিত হতে লাগল। স্থানে স্থানে সভা-সমিতি ও অধিবেশন চলল। বিলাতী বস্ত্র, ঔষধ, চিনি, লবণ, কেরোসিন প্রভৃতির দোকানে পিকেটিং চলল। পুলিশের দমন-নীতিও বাড়তে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে অগণিত নারীপুরুষকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখা হোলো, অকারণে বন্দীদের

উপর লাঠি, বেয়নেট প্রভৃতি চার্জ করা হোলো। কাঁথি ও তমলুকে আবার লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হোলো। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাস থেকে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করা হোলো।

৪ঠা জানুআরি গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়, অন্যান্য নেতাগণও কারারুদ্ধ হলেন। বিভিন্ন সমিতিকে এবং কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হোলো। ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬ ধারা অনুসারে এই সময় বাংলার ২৭২টি কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হোলো। ১৯৩২ সালের ১৪ই জানুআরি এই প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা প্রকাশিত হোলো; জেলাওয়ারী হিসাবে—

নদীয়া	২৩টি প্রতিষ্ঠান	ত্রিপুরা	৮টি প্রতিষ্ঠান
বগুড়া	১১টি ,,	হাওড়া	১১টি ,,
ঢাকা	২২টি ,,	বর্ধমান	৮টি ,,
২৪ পরগণা	২০টি ,,	ফরিদপুর	১৮টি ,,
ময়মনসিংহ	৩৭টি ,,	রাজসাহী	৯টি ,, এবং

মেদিনীপুর জেলার ১০০টি প্রতিষ্ঠান। বাকীগুলি কয়েকটি ক্ষুদ্র সংঘ। (১৪।১।১৯৩২ এর কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য।)

এর আগের দিন অর্থাৎ ১৩ই জানুআরি মেদিনীপুরে পুলিশ কংগ্রেসকর্মী চারুশীলা দেবীকে গ্রেপ্তার করে। সকাল বেলায় তিনি স্থানীয় উকিল মন্মথনাথ দাসের বাড়ী থেকে ফিরছিলেন। এই বৎসর আইন অমান্য আন্দোলনের তিনিই প্রথম মহিলা বন্দিনী।

এরপর মেদিনীপুরের বিপ্লবিগণ স্থির করলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে ইহলোক থেকে বিদায় দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম চেষ্টা করা হোলো কাঁসাই নদীর ঘাটে। মেদিনীপুর থেকে খড়্গপুর যেতে হ'লে এখানে নৌকায় করে জীপ পার করতে হ'ত। পুলিশ ইন্সপেক্টার-এর ছেলে প্রমথ মুখার্জী (সত্য) ও হিন্দু স্কুলের জনৈক ছাত্র কাঁসাই-এর ঘাটে ডগলাসকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ডগলাস গাড়ী থেকেই নামেন নি। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হোলো তাঁদের। এরপর জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বোস দেখা করবার সুযোগে তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করলেন; কিন্তু তিনিও সফল হতে পারলেন না।

১৯৩২ সালেই দ্বিতীয় বার আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সময়ে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা হ্রাস করবার জন্য বৃটিশ সচেষ্ট হোলো। তাই জেলাবোর্ডের কর্তৃত্ব ভার কোন বেসরকারী সদস্যের উপর ন্যস্ত করতে ভরসা করেনি বৃটিশ কর্তৃপক্ষ। জেলা শাসক ডগলাস ছিলেন জেলা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। জেলা বোর্ডের কোন অধিবেশনেই তাকে হত্যা করা সহজ বলে ভাবলেন বিপ্লবীরা। কিন্তু কাজটি খুবই দুঃসাধ্য কেননা ডগলাস সব সময় রিভলবার সঙ্গে রাখতেন ও বেশ কিছুসংখ্যক দেহরক্ষী ছাড়া বাইরে বেরোতেন না। তাছাড়া বোর্ডের তেত্রিশ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন মহকুমা শাসকের সশস্ত্র দেহরক্ষী থাকত ও বোর্ডের সভাগৃহ ছিল কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। কাজেই এ কাজে যথেষ্ট দক্ষ ও কুশলী কর্মীর প্রয়োজন। বিপ্লবী শচীন কানুনগোর বাড়ীতে জরুরী মন্ত্রণা সভা বসল; ফণী দাস, প্রদ্যোৎ, প্রভাংশু, শচীন প্রভৃতির উপস্থিতিতে প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশু এই দুরূহ কাজটি সমাধা করবার জন্য নির্বাচিত হলেন। মার্চ (১৯৩২খ্রীঃ) মাসের অধিবেশনে এদের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সকলে খুব হতাশ হয়ে পড়লেন।

নিহত হবার পূর্বে ডগলাস কয়েকটি ভীতিপ্রদর্শনমূলক চিঠি পেয়েছিলেন। গুপ্ত সমিতির কর্মীদের পক্ষ থেকেও একটি চিঠি পাঠান হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল—

"ডগলাস,

আমরা জানিতে চাই যে ঝাড়গ্রাম মহকুমার সর্দ্দিয়া মাণিক পাড়া ও ইহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে স্থানীয় পুলিশ দারোগা কর্তৃক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর যে দমননীতি ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত

হইয়াছে তাহা তোমার আদেশের ফলে হইয়াছে কিনা। এই প্রকার সরকারী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের কার্য আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে আমরা নিশ্চিত হইতে চাই যে, এই সকল কার্য তোমার আদেশে অথবা তোমার জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিব এবং বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিব যে, এই দমননীতি বন্ধ করিবার জন্য তুমি কোন সন্তোষজনক আদেশ প্রদান করিয়াছে কিনা। তদন্যথায় তোমার এই দমননীতির বিরুদ্ধে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য অগ্রসর হইব এবং ইহাও স্মরণ করিয়া রাখিবে যে, অনতিবিলম্বে ইহার পরিণাম অত্যন্ত সাংঘাতিক হইবে।"

এই :সময় প্রায় প্রতিদিন নানাপ্রকার ইস্তাহার, পুস্তিকা, পোস্টার প্রভৃতি প্রকাশিত হতে লাগল। বিপ্লবীদের যেন তেন প্রকারেণ সায়েস্তা করবার জন্য বৃটিশের আইনের নানা প্রকার সংশোধন মূলক ব্যাখ্যা প্রচার করতে হোলো। ২৮শে এপ্রিল (১৯৩২) বাংলার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হোলো—

"In exercise of the power conferred by sub-section (i) of section 13 of the Bengal Criminal Law Amendment Act 1930 the government in-Council is pleased to make the following rule :

If any detenu under the Bengal Criminal Law Amendment Act 1930 disobeys or neglects to comply with any order made, direction given, or condition prescribed by virtue of any rule made under section 13 of the said Act, the authority which made the order, gave the direction or prescribed the condition, may

use any and every means necessary to enforce compliance with such order....."

[১৯৩০ সালের ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেণ্ডম্যাণ্ট অ্যাক্ট-এর ১৩ নং ধারার ১নং উপধারার সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট-ইন কাউন্সিল নিম্নলিখিত নিয়ম প্রবর্ত্তন করছেন—

'ঐ আইনে কোন আটকবন্দী যদি কোন আদেশ অমান্য বা অগ্রাহ্য করে বা কোন নির্দেশ বা শর্তপালন না করে তাহ'লে কর্তৃপক্ষ যে কোন উপায়ে বলপূর্বক তা প্রয়োগ করতে পারবে।']

এতে ভয় পাবার ছেলে বিপ্লবীরা নন। বৃটিশের অন্যায় আচরণ ও দমননীতি যতই কঠোর হতে লাগল তাদের জেদও যেন বাড়তে লাগল উত্তরোত্তর এক প্রচণ্ড গতিতে। সেইজন্যই বোধ হয় এই যুগেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়ে গিয়েছিল শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতে। পৃথিবীর সকল দেশের বিপ্লবীদের কার্য কলাপের ইতিহাসের উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি বিপ্লবীরা কখনো প্রতিপক্ষের প্রতি অন্যায় হিংসা পোষণ করে না। অকারণে কখনো তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায় না। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্রেজিয়ার-এর কথা। আয়ারল্যাণ্ডের ব্ল্যাক ও ট্যানদের কার্যের সহিত বিশেষ পরিচিত এই ভদ্রলোক তার 'গান্ধীর প্রতি একটি কথা' (আয়ারল্যাণ্ডের শিক্ষা) নামক গ্রন্থের অষ্টাশি পাতায় লিখেছেন, "বিপ্লবী চরমপন্থীরা অবিচারিত বা অকারণ হত্যা করে না। আয়ারল্যাণ্ডে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল। সমুদয় বিপ্লবী মহলে অবিচারিত হত্যা ব্যর্থ বিবেচিত হইয়া থাকে...।" (from A Word to Gandhi) :—The Lesson of Ireland by F.P. Crozier. Page-88.

কাজেই এটা নিশ্চিত যে বিপ্লবীরা যে সকল সরকারী কর্মচারীকে মেরেছিল তারা সবাই নিরীহ নির্দোষ নয়। বৃটিশের নিষ্পেষণমূলক শাসন ও শোষণ যন্ত্রের তারা একটি ক্ষুদ্রতর অংশ

বিশেষ আর সেই নিহতদের তালিকায় দেশীয় ব্যক্তিদের সংখ্যাও কম নয়।

যাই হোক মেদিনীপুরের জেলা শাসক ডগলাসকে হত্যার সব আয়োজন প্রস্তুতই ছিল। তারপর একদিন আরম্ভ হোলো আসল কাজ। ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল শনিবার বিকেল বেলায় জেলা-বোর্ডের সাধারণ অধিবেশনে ৫টা ২০ মিনিটের সময় ডগলাস এলেন। সভায় দেহরক্ষী সহ পাঁচ জন মহকুমা শাসক আর সাতাশ জন সভ্য উপস্থিত আছেন। বোর্ডের সম্পাদক বিনোদ বিহারী রায় ডগলাসের বাঁদিকে হাত দুই দূরে বসে। ক্লার্ক ভূপেন বাবু সভাপতি ডগলাসকে নথিপত্র দেখাচ্ছিলেন। সভাপতি ঘরের উত্তর দিকে বিরাট একটা ডিম্বাকৃতি উঁচু টেবিলের উত্তর দিকের কাটা অংশে বসে। তার চেয়ারের পিছনে দু'পাশে দুটো দরজা খোলা। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বোর্ডের অন্যান্য অফিস ঘরগুলির দরজা বন্ধ ছিল।

৫টা বেজে ৪৫ মিনিটের সময় কর্মসূচীর ৯নং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এমন সময় খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দু'জন যুবক রিভলবার থেকে গুলি চালাতে আরম্ভ করেন। দূরত্ব মাত্র দুই তিন হাত। একজন সভাপতির ডানদিক থেকে উপর্যুপরি গুলি চালাতে থাকেন। ডগলাস চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন টেবিলের উপর। তার দেহ থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হয়ে টেবিল ভেসে যেতে লাগল।

বোর্ডের ভীত, চকিত ও হতভম্ব সভ্যগণ যখন অবস্থার গুরুত্ব বুঝলেন ও সম্বিত ফিরে পেলেন তখন আততায়ীরা বাইরে বেরিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকের রাস্তা দিয়ে দৌড়াতে আরম্ভ করেছেন। দু'জন দেহরক্ষী গুলি ছুড়তে ছুড়তে তাদের পিছনে ছুটতে লাগল। পরে তমলুকের এস. ডি. ও. মিঃ জর্জ ও তাঁর দেহরক্ষী, ডগলাসের চাপরাশি কেনারাম মুর্মু, কাঁথির এস. ডি. ও. মিঃ ডি. এন. সেন ও

অন্য তিনজন লোকও তাদের ধরবার জন্য এগিয়ে আসে। আততায়ী দু'জনের মধ্যে একজন উপর্যুপরি গুলি চালাতে চালাতে ছুঠছিলেন, তিনি অমর লজের পাশের রাস্তা দিয়ে ঢুকে ক্ষিপ্রগতিতে আত্মগোপন করলেন। অপর একজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন ও গুলি চালাতে গিয়ে দেখলেন সর্বনাশ! রিভলবার খারাপ হয়ে গিয়ে গুলি বেরোচ্ছে না। তিনি দক্ষিণ দিকে দৌড়াতে লাগলেন। অনুসরণকারীরা নিরাপদ বুঝতে পেরে তারই পিছনে ছুটল। কিছুদূর যাবার পর সায়েন্স লজ নামে এক পোড়ে বাড়ীতে ঢুকে পড়েন তরুণ, রিভলবারটা একটু দেখতে পারবেন মনে করে। মহম্মদ আলি নামে এক দেহরক্ষী ঘরের মধ্যেই গুলি চালাল। বার বার চেষ্টা করা সত্বেও তার রিভলবার থেকে একটাও গুলি বেরোল না। ঘর থেকে বেরিয়ে একটি ঝোপের মধ্য দিয়ে পালাতে গিয়ে পায়ে একটা তারের বেড়া আটকে হঠাৎ তিনি পড়ে যান। বসির আলি নামে একজন তাকে জাপটে ধরে। ইতোমধ্যে অন্যান্য সবাই এসে পড়ায় তরুণ আর পালাতে পারেননি। সেখানেই তাকে বেশ প্রহার করা হয় ও টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হোলো। ইনি প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য, আঠার বছরের এক ছিপ-ছিপে তরুণ, মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছাত্র। মোক্তার ভবতারণ বাবুর ছোট ছেলে প্রদ্যোৎ। এদের আদিবাস ছিল ঘাটাল মহকুমার গোকুলনগর গ্রামে। যে তরুণটি পলায়ন করতে সক্ষম হলেন তার নাম প্রভাংশুশেখর পাল—ডাক্তার আশুতোষ পালের বড় ছেলে। এদেরও আদিবাস ছিল ঘাটাল মহকুমার খাঞ্জাপুর গ্রামে।

ওদিকে আহত রক্তাক্ত ডগলাসকে সদর হাসপাতালে আনা হোলো, খড়্গপুর থেকে ভাল নার্স এল। সিভিল সার্জন স্বয়ং তার দেহে অস্ত্রোপচার করেন। তার দেহে ৩৮০ বোরের রিভলবারের চারটি গুলি ছিল এবং তিন থেকে ছয় ফিটের ব্যবধানে গুলি করা

হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ধরা পড়বার সময় প্রদ্যোতের হাতে ছিল ৪৫০ বোরের রিভলবার, সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় প্রভাংশুর রিভলবারের গুলিই ডগলাসের গায়ে লাগে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে রাত্রি প্রায় ১০টার সময় ডগলাস মারা যান।

ফজলে হক, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শান্তি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামে তিনজন দারোগা ঘটনস্থলে এলেন। প্রদ্যোতের পকেটে একটি খাম, একটি রুমাল ও একটি মানিব্যাগ পাওয়া যায়। ব্যাগে মোট বাইশ টাকার মত ছিল। খামের মধ্যে দুটি কাগজ পাওয়া যায়। একটি অধ্যাপক সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ. রচিত 'আমাদের প্রাথমিক পাটিগণিত' সম্বন্ধে ইংরাজীতে ছাপান ইস্তাহার; অপর কাগজটিতে লাল কালিতে লেখা ছিল সুন্দর কয়েক ছত্র কবিতার মত—

"Feeble protest against Hijli wrongs,
Let their deaths open the eyes of the Britons
Let our self sacrifice awaken India.........
Bandemataram."

প্রদ্যোতের সঙ্গীকে ধরিয়ে দেবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হোলো। কোতোয়ালী থানার দারোগা ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হত্যার তদন্ত করতে লাগলেন। থানায় ভূপেন বাবু উপহাস করে প্রদ্যোৎকে বললেন—"ছিঃ প্রদ্যোৎ, তোমার মত একজন বুদ্ধিমান ছেলে এমন একটা রিভলবার নিয়ে গেল, যা একেবারেই সাড়া দিল না।"

উত্তরে প্রদ্যোৎ বলেন,—"Irony of fate Bhupenbabu, had my revolver spoken out I would not have been here and in this condition the story would have been otherwise….."

'অদৃষ্টের পরিহাস ভূপেনবাবু, যদি আমার রিভলবার সাড়া দিত তাহ'লে আমাকে এখানে আসতে হ'ত না এবং সেক্ষেত্রে কাহিনী অন্যরূপ হ'ত।'

এদেশেরই লোক ভূপেন বাবু তখন রেগে গিয়ে বলেছিলেন, "তোমায় ফাঁসিতে ঝুলাব, তোমার আর তিন ভাইকে জেলে পাঠাব।"

সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরের বহু বাড়ীতে খানাতল্লাসী হোলো। সশস্ত্র পুলিশ বহু লোকের বাড়ীতে প্রবেশ করে অত্যাচরে শুরু করল। বাড়ীর জিনিসপত্র তছনছ করে, নর্দমা, পায়খানা, রান্নাঘর একাকার করে খাদ্য বস্তু, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি উনুনের ছাই পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পুলিশ গুপ্তবস্তুর সন্ধান করতে লাগল। সঙ্গে চলল বেপরোয়া প্রহার ও গ্রেপ্তার এবং আটক। সারা শহরে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ক্ষিতি সেনগুপ্ত, বীরেন দাস, কার্তিক বসু, সুধীর ভট্টাচার্য, ফণীন্দ্রনাথ দাস (প্রদ্যোতের গুরু), শর্বরী ভট্টাচার্য (প্রদ্যোতের দাদা), যতিজীবন ঘোষ, বিবেকানন্দ বসু, শচীন সান্যাল, অমূল্য কুশারী, সুশীল সেন, শশাঙ্ক দাস, রাজেন্দ্র চৌধুরী, কমলা সিংহ, রাধা ভঞ্জ, কামাখ্যা ঘোষ, রামশংকর চক্রবর্তী, শীতল আঢ্য, বিনোদ সেন, মৃগেন ভগত, শৈলেন দাস ও নরেন দাস প্রভৃতি মোট বত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করল।

রাহাৎ বক্স চৌধুরী নামে নারায়ণগড়ের এক নরপিশাচ দারোগা দৈহিক নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায়ের কাজে বিশেষ কুখ্যাত ছিল। সে ওরা মে প্রদ্যোতের সামনে তার গুরু ফণীদাসের উপর দুই ঘণ্টা অকথ্য পাশবিক নির্যাতন করে। পেডি হত্যার পর থেকে ফণী পাহাড়ীপুরে স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। তিনি মেদিনীপুরের হিন্দুস্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর পিতা যতীন্দ্রনাথ দাস ছিলেন ঐ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক।

যাই হোক রাহাৎ বক্স ফণীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যা অমানুষিক অত্যাচার করল তা শুনলে শরীর রোমাঞ্চিত হায় উঠে। চারজন সিপাই ও রাহাৎ বক্স ফণীকে উলঙ্গ করে তার সর্বাঙ্গে নির্মম ভাবে প্রহার করতে শুরু করে। বড় বড় পিন ও মোটা ডাণ্ডা তার নখের মধ্যে ও শরীরের অন্যান্য কোমল স্থানে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তার উপর এলোপাথাড়ি প্রহারে ফণী মাঝে মাঝে জ্ঞান হারাচ্ছিল। তখন চোখে মুখে বরফ জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে আবার বেটন দিয়ে প্রহার চলতে লাগল। এমনি প্রায় দুই ঘণ্টা অত্যাচার চলবার পর ফণীর দেহ অসাড় ও ঠাণ্ডা হয়ে যেতে থাকে এবং খুব ঘাম বের হতে থাকে। জীবন হানির ভয়ে পুলিশের কর্তৃব্যক্তি মিঃ ইভান্স শহর থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত জমিদারী কোম্পানীর গোদাপিয়াশাল কুঠী থেকে তার বন্ধু সিভিল সার্জেন মিঃ ড্রামণ্ডকে নিয়ে এলেন মধ্য রাত্রেই। পরে ফণীকে সদর হাসপাতালে আনা হয় ও সেখানে তিনি কয়েক বার রক্ত বমন করেন। জীবনের কোন আশা না থাকায় তার মৃত্যুর পূর্বে জবানবন্দী নেওয়া হোলো ও অক্সিজেন দেওয়া হোলো। কয়েকদিন পরে তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেন, পরে সম্ভবত তাঁকে আরো প্রহার করা হয়। কেননা মামলার শুনানী চলা কালে ড্রামণ্ডের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় প্রথম দিনের চেয়ে দ্বিতীয় দিনে ফণীর দেহে জখমের চিহ্ন বেশী ছিল।

এরূপ ছিল বৃটিশ পুলিশের পাশবিক অত্যাচার। গুপ্তসমিতির খবর বা বিপ্লবীদের নাম, ধাম, কর্মক্ষেত্র বা সামান্যতম সূত্র জানবার জন্য পুলিশ ও গোয়েন্দারা যে অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন করত তা শুনলে শরীর শিউরে উঠবে। এরূপ অত্যাচারের জন্যই প্রদ্যোতের দাদা শর্বরীভূষণ পাগল হয়ে যান। দেশের কত মহাপ্রাণ বিপ্লবী যে এরূপ অত্যাচারের বলি হয়ে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন

দিতে বাধ্য হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই—কতজন আবার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন।

এই সব পশুজনোচিত অত্যাচার যারা করত তাদের অধিকাংশই ভূপেন দারোগা বা রাহাৎ বক্সের মত এদেশেরই মানুষ। শ্বেতাঙ্গ প্রভুকে খুশী করবার জন্য, সামান্য একটু পদোন্নতি বা পুরস্কারের আশায় বিদেশী প্রভুর ইঙ্গিতে চালিত ক্রীড়নক হয়ে তারা ভুলে গিয়েছিল দেশকে ও নিজেদের ভাইবোনদের। ভারতীয় পুলিশের এ কলঙ্ক কাহিনী চিরদিনই ইতিহাস পাঠকের ঘৃণা ও অশ্রুর উদ্রেক করবে।

যথা সময়ে ফণী এই অত্যাচারের জন্য আদালতে লিখিত অভিযোগ পেশ করে। কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালিউল ইসলাম সুবিচার করেননি, মেদিনীপুরের জেলা ও দায়রা জজের আদালতে আপীল টিকল না, ফলে হাইকোর্টের স্মরণ নিতে হয়। হাইকোর্ট মামলাটির পুনর্বিবেচনার জন্য আদেশ দেন। বেগতিক দেখে পুলিশ অন্য পথ ধরল, ফণীর পিতার কাছে প্রস্তাব গেল পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিলে ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা মামলায় তাকে আসামী করা হবে না। আইনজ্ঞদের পরামর্শমত মামলা তুলে নেওয়া হয়।

সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বলে প্রদ্যোতের বিচারের জন্য তিন জন বিচারককে নিয়ে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হোলো। এরা হলেন—

১। কে. সি. নাগ (সভাপতি), আই-সি-এস,
২৪ পরগণার জেলা ও দায়রা জজ ;

২। জ্ঞানাঙ্কুর দে, আই-সি-এস,
বর্ধমানের জেলা ও দায়রা জজ ;

৩। খানবাহাদুর মৌলভী মামুদ
মেদিনীপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট।

তৃতীয় বিচারক সম্বন্ধে আসামী পক্ষের আপত্তি থাকায় তার বদলে মেদিনীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ ভূজঙ্গধর মুস্তাফিকে নিয়োগ করা হয়।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।১২০ বি, ৩০২।৩৪ ও ৩০২।১১৪ এবং অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা অনুসারে প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হোলো। মামলার ত্রিশ জন সাক্ষীর প্রায় সবাই সরকারের অনুকূলে সাক্ষ্য দেন। দু'এক জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করাই হয়নি। কলকাতার তিন জন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার নিশীথচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, যোগেশচন্দ্র গুপ্ত প্রদ্যোতের পক্ষ সমর্থন করেন। ৫ই থেকে ১৫ই জুন (১৯৩২ খ্রীঃ) এই মামলার শুনানী চলে এবং শেষ দিন রায় প্রদান করা হয়।

বিচারপতি শ্রী দে এক পৃথক রায়ে আসামীর প্রতি দ্বীপান্তরের (যাবজ্জীবন) আদেশ দেওয়ার জন্য মত প্রকাশ করেন; কিন্তু দু'জন একমত হয়ে প্রাণদণ্ড দেন। হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলে আপীল টিকল না। লাটসাহেবের কাছে জীবন ভিক্ষাও ব্যর্থ হোলো; এমনকি পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য মায়ের শেষ আবেদনও সামান্য একটা অফিসিয়াল গোলযোগের জন্য স্বয়ং ভারতেশ্বরের কাছে পৌঁছাল না।

১৯৩৩ সালের ১২ই জানুআরি প্রদ্যোতের ফাঁসির দিন স্থির হয়ে গেল। তার শেষ ইচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে নির্ভীক চিত্তে তিনি বলেছিলেন, 'ইংরেজের কাছে কোন অনুগ্রহ চাই না।'

প্রদ্যোতের মা জেলে দেখা করতে গিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন —কি করলি বাবা?

স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন—

—আরো তিন ছেলে তোমার রইল মা, তাছাড়া দেশের আরো কত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে। কলেরার আক্রমণে যদি আমার মৃত্যু হোতো তাহলে কেউ কি আমার নাম উচ্চারণ করতো।

আমার যাবার পর কত লোক তোমার কাছে আমার নাম করবে। (মুখে একটু ম্লান হাসি দেখা গেল—আবার বলতে আরম্ভ করলেন।) চোখের জল ফেলে আমার অকল্যাণ কোরো না মা, আজ যে আমি হাঁসিমুখে মরণের পথে এগিয়ে চলেছি তোমার গর্ভে জন্মেছি বলে তা সম্ভব হয়েছে। তোমার প্রদ্যোতের দিকে চেয়ে দেখ মা. আজ তাকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। কি আনন্দ যে আমি পাচ্ছি মা তা তোমায় কি করে বোঝাব। তোমার প্রাণে যে দারুণ আঘাত দিয়ে গেলাম তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা কোরো......। ফাঁসির কয়েক দিন পূর্বে তিনি মাকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। নিম্নে তারই প্রতিলিপি দেওয়া হোলো—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাগো,

আমি যে আজ মরণের পথে যাত্রা শুরু করেছি তার জন্য কোন শোক কোরো না। আর আমার ভাইদের বোলো যে, আমি আমার অসমাপ্ত কাজের ভেতর আমার হৃদয় রেখে গেলাম। আমার জন্য দুদিন চোখের জল ফেলে ভুলে যাওয়ার চেয়ে আমার সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার চেষ্টা করলে আমার ঢের বেশী তর্পণ করা হবে এবং আমার আত্মাও তাতে বেশী পরিতৃপ্ত হবে। আজ যদি কোন ব্যারামে আমার মরতে হোত তবে কি আফ্‌শোষই না থাকতো সকলের মনে, কিন্তু আজ একটা আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন করছি তাতে আনন্দ আমার মনের কানায় কানায় ভরে উঠছে, মন খুশীতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফাঁসীর কাঠটা আমার কাছে ইংরাজের একটা পুরানো রসিকতা বলে মনে হচ্ছে। আমার এই অন্তরের কথাটা তোমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি।

'মা', তুমি কিন্তু আমার কাছে কাজের কোন কৈফিয়ৎ চাইতে পাবে না। তুমি হয়তো জান না তোমারই নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছো, কিন্তু তোমাকে আমি জানিয়ে যাচ্ছি আমরা হাজার বছর ধরে তোমাদের অর্থাৎ বাংলার মায়েদের মনে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই সৃষ্টি হচ্ছিলাম। আজ ধীরে

ধীরে আমরা আত্মপ্রকাশ করছি। আর আমি চিরকালই জানি যে, আমি বাঙ্গালী (বা ভারতবাসী) আর তুমি বাংলা (বা ভারতবর্ষ) একই পদার্থ—কোন দিন আলাদা করে ভেবে উঠতে পারিনি। তাই কোন বিপদাশঙ্কাই আজ আমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। যুগ যুগ ধরে তুমি যে অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করে এসেছ, মাটিতে মুখ থুবড়ে বোবা গরুর মত মার খেয়েছ, তারই বিরুদ্ধে তোমার মনে যে বিদ্রোহের ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বয়ে যাচ্ছিল, সেই পুঞ্জীভূত বিদ্রোহই আমি। সেই বিপ্লব আজ যদি আত্মপ্রকাশ করে তবে তার জন্য চোখের জল ফেলবে কেন? আমার এই কথাটা খুব সত্য বলে জেনো। আর তোমায় যদি কেউ 'খুনীর মা' বা 'ডাকাতের মা' বলে অবজ্ঞায় পরিহাস করে তবে নিজ জ্ঞানে অন্তরে নিরুপম সৌন্দর্য বহন করে নীরবে করুণ নেত্রে তার অজ্ঞতার ক্ষমা কোরো। মানুষকে আমরা খুন করি না, মানুষকে আমরা বাঁচাই। একথা বাংলা দেশকে এখনো বোঝানো হয়নি। বাংলার বিপ্লবের ইতিহাস কদিনেরই বা, তাই আমাদের আদর্শ এখনো সাধারণে প্রচারিত হয়নি। সেই জন্য লোকে হয়ত আমাদের ভুল বোঝে নতুবা জেনেও জানবার চেষ্টা করেনি। আমাদের গালি দেওয়ার লোক পদে পদেই। ইংরেজ আমাদিগকে কালিতে চিহ্নিত করে, কিন্তু যখন ভাবি তখন দুঃখ হয় অহিংসবাদীরাও হিংস্র বলে নিন্দা করে। আর মনে হয় পরাধীন দেশে এইটাই বুঝি সবচেয়ে বড় অভিশাপ। আমরা আজ যে আদর্শের সন্ধানে চলেছি তা অহিংসাবাদীদের কল্পনারও অতীত। মানবের হিংস্রতা থেকে মানবকে রক্ষা করার জন্যই আমাদের এ প্রয়াস। বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসটা প্রায় পঁচিশ বছরের শিশু, এখনো ভালো করে কথা বলতে শেখেনি। তাই অনেকের গলাবাজির চোটে হয়ত তার কণ্ঠস্বর তলিয়ে যায়। কিন্তু আজ এই শিশুকণ্ঠ হতে যে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বেজে উঠেছে, তা শিগগিরই জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেবে।

লোকে আমাদের ভাবপ্রবণ বলে উপহাস করে, কিন্তু আমি এটা ভেবে পাই না যে, এই বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলে যারা নেহাৎ ছেলে মানুষ নয়, লেখাপড়া শিখেছে, জ্ঞানলাভ করেছে এবং অনেক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছে, তারা একজোটে ভাবপ্রবণ (Sentimental) হয় কি করে।

বুড়োরা আমাদের প্রায়ই বলে থাকেন 'ভ্রান্ত যুবক', এবং করুণায় বিগলিত

হয়ে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের অনেকেই আমাদিগকে 'ভ্রান্তপথ' থেকে ফিরানোর অনেক চেষ্টাই নাকি করেছেন। এমন কি খুব নিঃস্বার্থ ভাবে কমিটিও নাকি গঠন করেছেন শুনছি। বুঝলে 'মা', এর ভিতরে কিছুই নেই, শুধুই উপর চালাকি। আসল কথাটা কি জান 'মা', যারা এরকম উঠে পড়ে আমাদের ফিরানোর চেষ্টা করছেন হয় তাঁরা অথর্ব, নয় কাপুরুষ। কাউকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই, কিন্তু এ জিনিসটা দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ।

বিপ্লব জিনিসটা কিছু আমোদের নয়, কিন্তু মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচানের জন্য যুগে যুগে এটার প্রয়োজন হয়েছে! বৃদ্ধ যাঁরা তাদের নমস্কার করি, তারা আমার পূজ্য। কিন্তু তাদের জরাগ্রস্ত দেহমন নড়ে চড়ে বসবার সাময়িক কার্যটাকে ও খুব বড করে দেখেন এবং বাহিরে তার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং নতুন জলে ভেসে আসা আগাছার মতন যখন আমাদের পিছন ছাড়তে চান না তখন বিরক্ত না হয়ে থাকতে পারি না। তখন বাধ্য হয়ে সেই তথাকথিত অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের শিশুর পর্যায়ে ফেলতে হয়। তারপর যাদের প্রত্যেক রক্ত বিন্দুটি দাসত্বের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়ে গেছে তাদের কথা ভাবি না। প্রকৃতির নিয়মে তারা নিজের ক্ষতে নিজে পচে মরে। স্বখাদ সলিলে ডুবে মরবে। কিন্তু যারা মধ্যপন্থী, আপোষ মীমাংসায় এখনো বিশ্বাসবান তাদের জন্য দুঃখ হয়, কষ্টও হয়। তাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দুইই আছে কিন্তু নাই কেবল আত্মসম্মান জ্ঞান। একথাটা জোর করে কাউকে কখনো শেখানো যায় না, বোঝানোও যায় না, এটা যৌবনের ধর্ম।

তোমাকে কেউ যদি আমার চোখের সামনে নির্যাতন করে এবং আমি যদি পাগলের মত লাফিয়ে না পড়ে বিচার করতে বসে যাই—এতে কোন সুরাহা হবে কিনা, এতে কতখানি বিপদ আসে, একলা ওর সঙ্গে পারব কিনা, কিংবা সামনে কোন থানা থাকলে এজাহার দিয়ে পরে সেই পলাতক অত্যাচারীর সন্ধান নিয়ে ব্যাটাকে জেলে দেওয়া কিংবা সম্মানজনক আপোষ মীমাংসা করা যাবে কিনা, আর অত্যাচারী যদি ধরা না পড়ে তবে কোন খবরের কাগজে তীব্র প্রবন্ধ লেখা যায় কিনা, ইত্যাদি করে আমি ধীর মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেব সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহৃদয়টা কি ছি ছি করে বলে উঠবে না—'ছেলে বেলায় বুকের দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে কেন এই ক্লেদের পিণ্ডটাকে মেরে ফেলিনি ?

এ কথাটা খুবই সত্যি, যতই অধিক বিচার করবে ততই যুক্তি ও উপপত্তি অধিকাধিক উৎপন্ন হয়ে শেষের নির্ণয় দুর্ঘট হয়ে পড়বে, যাক তোমার অপমান যথেষ্ট হয়েছে আর চোখের জল ফেলে অপমানের ভার বাড়াবো না।

কি অমৃত স্পর্শেই যে মরবার আগেই আমাদের ওজন বেড়ে যায় তা সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না বলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে, নইলে দেখতে এটা একটা হিসাব নিকাশের ব্যাপার মাত্র।

বেশী আর কি বলব। জীবনে অনেক আশাই ছিল, দেশের মধ্যেই আমাদের আদর্শটাকে অস্ত্রে অস্ত্রে ছাড়িয়ে যাব; নব যুগের কুসংস্কার মুক্ত ভাব নিয়ে জাতিকে ও সমাজকে নব রূপ দেব, একবারে আমূল সংস্কার করে একটা নব জাতি গড়ে রেখে যাব। সমস্ত গ্লানি সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে যাব; কিন্তু আশ্চর্য মানুষের জীবন, হঠাৎ একটা ডাক এলো, আমাকে যেতে হোলো। কিন্তু একথা মনেও স্থান দিও না 'মা' যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত চিন্তা সমস্ত আশাও লোপ পেয়ে গেল। সব রয়ে গেল আমার বাংলার ছেলেমেয়েদের মনে, আমার বাংলার মায়েদের অন্তরে। বাংলার ভূমি এত উর্বরা যে তার ফসল উপচে পড়ছে। এ বৎসর অগ্রহায়ণে যে ফসল অঙ্কুর না হতে হতেই শুকিয়ে গেল—আসছে হেমন্তে সে দ্বিগুণ হয়ে উঠবে, পরের ফসল দেশের মধ্যে সোনা ছড়িয়ে দেবে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার কিছু নেই—এইটুকু শুধু বলছি বড় হলে আরো ভালো করে বলতে পারতাম, কিন্তু আর কেউ এই একটু মুখের কথা বলুক বা নাই বলুক তুমি কিন্তু সম্যকরূপে বুঝবে, কেননা এটাত তোমারই অন্তরের কথা।

'মা', তোমার 'প্রদ্যোৎ' কি কখনো মরতে পারে; আজ চারিদিকে চেয়ে দেখ লক্ষ লক্ষ 'প্রদ্যোৎ' তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি বেঁচেই রইলাম মা, অক্ষয় অমর হয়ে। বন্দেমাতরম।

(বড় ভাই ডাঃ প্রভাত চন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখিত)

মেদিনীপুর সেণ্টাল জেল
বুধবার ১৩ই জুলাই, ১৯৩২

ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ

শতকোটি ভূমিষ্ট প্রণাম নিবেদনমিদং

বিশেষ পরে,

আমি এখন বেশ ভাল আছি। আপনাদের চিন্তা করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। জানি, মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে ও হবে। তাঁকে মনঃকষ্ট করতে বারণ করবেন। জগতে কেউ কখনো চিরদিনের জন্য আসে নাই এবং কেউ চিরদিন

জগতে থাকবেও না। প্রাণ বাঁচানোই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জীবন যদি জীবনের কাজেই না লাগলো, তবে সে রকম জীবনের প্রয়োজন কি? মায়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। তাঁকে বলবেন যে, তাঁর চার ছেলের মধ্যে তিন ছেলে এখনো তাঁর সামনে বর্তমান। (চার লাইন কাটা) আর আমাকে আমার এই ব্রত করতে হবে। (সাড়ে ছয় লাইন কাটা) জেলের নির্জনতা আমার এখন বেশ ভাল লাগছে; কেননা এই নির্জনতাই আমার জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে দেখার সুযোগ দেয়। আর সব অন্যান্য কারণ ছেড়ে দিলেও, আমার এই নির্জনতা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাকে অনেক খানি লাভবান করতে পারবে বা করেছে। আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ, প্রাণের অন্তরতম জ্বলন্ত পাবক শিখা। (দ্বিতীয় পাতা) আমি বেশ আনন্দেই আছি। আপনাদের কোন চিন্তা করবার দরকার নাই। জীবনে এত আনন্দ আর আমি কখনো পাই নাই। এবার যখন কেউ দেখা করতে আসবেন, তখন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—এই তিন মাসের মাসিক বসুমতী সঙ্গে নিয়ে আসবেন। মামাবাড়ীর, দাদামহাশয়ের বাড়ীর ও মহেশ্বর বাবুর বাড়ীর (প্রতিবেশী) সকলের সংবাদ দানে সুখী করাইবেন। কলিকাতার সংবাদ দিবেন। আমি কিছুদিন পরে বৌদিকে একখানা চিঠি দেব। আপনাদের এবং বন্ধুবান্ধবের এবং আরো অন্যান্য লোকের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা আমাকে অপার সুখশান্তি দেয়। আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। মাকে আমার সহস্র সহস্র কোটি কোটি প্রণাম জানাবেন। আমার জীবনের অক্ষমতার জন্য ক্ষমা করতে বলবেন। যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম ও ভালবাসা দিবেন এবং পত্র দিবেন।

ইতি—
কচি।

(কিছু দিন পরে বৌদিকে লেখা চিঠি)

মেদিনীপুর সেণ্টাল জেল
২২।১১।৩২

শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিবেদন মিদং, বিশেষ পরে,
"বৌদি",

আপনার আশীর্বাদী চিঠি পেয়েছি আজ হ'ল প্রায় দিন পনের; কিন্তু তার উত্তর দিতে পারি নাই! মনা'দা (প্রভাতবাবুর বড সম্বন্ধী) ও ঝুপির

(শহীদের বোন) চিঠিও পেয়েছি। তাঁদের আর স্বতন্ত্র ভাবে চিঠির উত্তর দিয়ে উঠতে পারব না। এবং তা দেওয়াও সম্ভবপর নয়। থাক, আপনার স্নেহ ভালবাসা পেয়ে মনটা আমার স্বতঃই বলে উঠছে যে, এ স্নেহ ভালবাসার ঋণ তুই কি করে শোধ করবি। "ভোলা দা" (প্রভাতবাবুর ছোট সম্বন্ধী) যে আমাদের এত আগেই ছেড়ে চলে যাবেন তা কে জানতো। তাঁকে বোধ হয় আজ Unhonoured ও unsungই যেতে হোলো। কিন্তু আমি যে যাচ্ছি, আমি সকলের মধ্যে নিজের আসন সুদৃঢ় ভাবে পেতে রেখেই যাচ্ছি। কার কখন কিভাবে ডাক আসে, তা' কে বলতে পারে।

আমার যাওয়ার কল্পনা যা এতদিন মনে মনে করে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে এসেছি তা সফল হতে চললো। 'এবার চলিনু তবে, সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' এমনি কত ছন্দে যে আনন্দকে ঘিরে ঘিরে উচ্ছল জল কল্লোলের মতই বেজেছে। আজকে এই আনন্দকে কোন কথাই ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না। আমার এ যে আশাতীত, ধারণাতীত লাভ। ধর্মের জন্য, দেশের জন্য, যে কোন উপাস্যের জন্য ত্যাগের এমনকি জীবন বিসর্জনের দৃষ্টান্তের জন্য পুরাণ বা ইতিহাসের পাতা উল্টাবার প্রয়োজন নাই; আমাদের চোখের সামনে আমরা প্রতিনিয়তই তা দেখতে পাচ্ছি। তাছাড়া মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে অন্য দেহ পরিগ্রহে বিশ্বাস ত আছে এবং শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণের বাণী "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" তাই, আমার জন্য কোন চিন্তা কর্বেন না। এইটুকুন দুঃখই থাকলো যে আপনার সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হয়ে উঠলো না। তারপর গীতাঞ্জলীতে আছে—

"আকাশ হতে প্রভাত আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙ্গা কারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠলরে, এই উঠলরে।"

আমার অন্তরে স্পন্দিত হচ্ছে, এইটা পড়ে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, এই দেখে যে কবির এই ছন্দটা যেন আমার জীবনেরই প্রতিধ্বনি। আমার এই জীবনের খাতায় যে তাঁর কোন অক্ষরটিই বাদ যাচ্ছে না। সবই যে সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। এত গান শোনা নয় বা কাব্য পড়া নয়, এযে একেবারে মর্মে মর্মে অনুভব। জীবনটা কী! একটা অনুভবের সমষ্টি বইত নয়।

এই অনুভবের স্মৃতিধারাই ত মানবের জীবন। এবং সেই একটানা জীবন স্রোতে যেদিন একটা প্রবল অনুভবের আবর্ত সৃষ্টি করে তারই নাম ত প্রাণের জাগরণ। তাই আমার জীবনের এই অভিব্যক্তির মধ্যেই বিশ্বকবির গানের এই আশ্চর্য মিল দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। যাক, তারপর আমার যে আত্মা এ আত্মা যে শুধু অমর তা নয়, ইহার অধিকন্তু অপরিমেয় শক্তি। ইহা যে শুধু অক্ষয় অবিনশ্বর তা নয়, ইহা বিভু, ইহা অসীম।

সেই অসীমতা সেই বিভুত্ব শুধু মায়ার আবৃত আছে। বুঝলেই মায়া ছুটে যাবে। আমি আসি; কেমন? এই বাংলার কোলেই আবার ফিরে আসব গৌরবের সহিত। অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছা করে, কিন্তু প্রাণের কথা বাহিরে প্রকাশ করবার ভাষা নেই। আমার শতশত প্রণাম গ্রহণ করে আমাকে সার্থকতার আনন্দ উপলব্ধি করতে সুযোগ দিবেন। "মোনা দা" প্রভৃতিকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাবেন। "মায়ের" প্রাণে আঘাতটা খুবই বেশী হয়ে বাজাবে তা জানি, কিন্তু আপনারা সে আঘাতটাকে লঘু করবার চেষ্টা করবেন। আমাকে আমার অযোগ্যতার জন্য 'মাকে' ক্ষমা করতে বলবেন। আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। আসি, কেমন? ইতি—

আপনারই ছোট ঠাকুরপো
শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য।

(কে বলবে এই ছেলে কারাগারে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণছে? কি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ মানসিক শক্তি, ভাবলে অবাক হতে হয়। ফাঁসির পূর্বে প্রদ্যোৎ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও নাকি দু'টি চিঠি দিয়েছিলেন তবে এ যাবৎ সেগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।)

সত্যই মৃত্যুদণ্ড শোনার পর থেকে কি যেন এক অপার্থিব আনন্দে রুগ্ন শরীর অনুপম রূপলাবণ্যে পুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে ও তার ওজনও যায় বেড়ে।, ফাঁসির কয়েক দিন মাত্র আগে মন্মথনাথ দাস মহাশয় তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন একখানা কম্বলের উপর বসে প্রদ্যোৎ গীতা পড়ছেন, নিশ্চিন্ত মনে। মন্মথ বাবুকে দেখে যুক্ত করে অভিবাদন জানালেন তিনি এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। অভিভূত মন্মথ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—গীতা পড়ছ?

—কেমন লাগছে?

—এমন আনন্দ কখনো পাইনি। যত পড়ছি ততই আমার জীবনের সকল সমস্যাগুলি দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, যেন আনন্দ সাগরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি।

উদ্গত অশ্রু মন্মথ বাবুকে রুদ্ধ বাক করে দিল—তিনি আর কিছুই বলতে পারলেন না। কি নির্ভীক ও সুস্থচিত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা—ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সত্যিই চিরদিনই এদের কাছে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য', এবং সেইজন্যই বোধ হয়, 'চিত্ত ভাবনাহীন।'

এল ১৯৩৩ সালের ১২ই জানুআরি, বাংলা ১৩৩৯ সালের ২৮শে পৌষ বৃহস্পতিবার। পূর্ব রাত্রে অনেকক্ষণ পড়াশোনা করলেন তিনি, সেই সময় মাঝে মাঝেই গেয়ে উঠছিলেন 'মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।' শেষ রাত্রে নিয়মিত ব্যায়াম শেষ করলেন ও শীতের কনকনে ভোরে কারা কর্তৃপক্ষের দেওয়া গরম জলে শেষ বারের মত স্নান করে নিলেন। গীতা পাঠ শেষ করে তৈরী হলেন ও প্রহরীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বললেন, 'ঠিক হ্যায়।' ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে রজ্জু গলায় পরেও এই বীর তরুণ উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন—

'মা, আমি যেন আবার তোমার কোলে ফিরে এসে তোমার সেবা করতে পাই। ভারত থেকে অত্যাচারী ইংরেজ উচ্ছেদ হোক, আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে বিপ্লবী সৃষ্টি করুক……।'

আর কিছু বলা হোলো না·· ···পদতলের পাটাতন সরে গেল, অন্ধকারে তলিয়ে গেল অমর বীরের দেহ। শুধু উপরের দড়িটি বার কয়েক কেঁপে কেঁপে স্থির হয়ে গেল……।

কারা প্রাচীরের পশ্চিমে একটি নির্দিষ্ট উন্মুক্ত স্থানে প্রহরী বেষ্টিত করে শবদাহ করা হয় এবং ভস্মকণা বা কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন কাউকে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। এইদিন সমস্ত শহরের রাস্তায়

রাস্তায় অতিরিক্ত পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় ও গোরা সৈন্যের দল মার্চ করে রাস্তাগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। (শহীদ প্রদ্যোৎকুমার'—৺ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র দ্রষ্টব্য।)

প্রদ্যোতের আত্মদান সম্বন্ধে পরের দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হোলো—

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি

ভোর ৫টায় সব শেষ।

মেদিনীপুর ১২ই জানুআরি—ডগলাস হত্যাকাণ্ড মামলায় প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্যের ফাঁসি অদ্য প্রত্যুষে পাঁচটার সময় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

॥ ফাঁসির পূর্বে ॥

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, প্রদ্যোৎ ভোরবেলা স্নান করে। স্নান করিবার পর সে গীতা পাঠ করিতেছিল, এমন সময় ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাইবার জন্য তাহাকে ডাকা হয়। সে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়। তাঁহার দুই ভ্রাতাকে যখন জেলের ভিতর লওয়া হইল তখন তাঁহারা গিয়া দেখেন যে, প্রদ্যোৎ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। অবিলম্বে তাঁহাকে ফাঁসির মঞ্চে উঠিতে বলা হয়। সে অবিচলিত পদক্ষেপে ফাঁসির মঞ্চের উপর গিয়া উঠে; তৎপর ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করিয়া জল্লাদের হাতে আত্মসমর্পণ করে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩।১।১৯৩৩)

পর পর দু'জন ইউরোপীয় জেলা শাসককে এই জেলায় নিহত করা হোলো এবং আরো কয়েকজন অফিসারকে হত্যার চেষ্টা করা হোলো। বাংলার অন্যত্রও এখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পুরোদমে চলছিল। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে কোন ইউরোপীয় অফিসারের জীবনই নিরাপদ ছিল না। প্রায় প্রতিদিনই এখানে ওখানে গুলি চলে—বোমা ফাটে। বিশেষতঃ এই মেদিনীপুর জেলায়

বৃটিশ কর্মচারিগণ বিশেষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। শহরের শান্তিরক্ষার জন্য একটি অতিরিক্ত পুলিশ ফৌজ নিযুক্ত করা হোলো এবং তার খরচের জন্য ৬৭,০০০ টাকা ব্যয় হলে জেলাবাসীদের নিকট থেকেই তা আদায়ের চেষ্টা করা হয়। ফলে তমলুক মহকুমায় আবার গোলযোগ দেখা দিল। কোথাও কোথাও ব্যাপক ভাবে জরিমানা আদায়ের সিদ্ধান্ত হোলো। মাসুরিয়া ও দাঁতনের প্রতিবাদ সভায় পুলিশ নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাল। বেঙ্গল পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট নামে একটি আইন সর্বত্র বলবৎ করা হোলো। বিনা বিচারে আটক করে রাখা হোলো অসংখ্য তরুণকে। নাগেন্দ্র নাথ গুপ্ত এরূপ একজন আটক আসামী ছিলেন। বিচারে তিনি বেকসুর খালাস পেলেন—তবুও গোপীবল্লভপুরের বাড়ীতে তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয় (আনন্দবাজার, ১।৩।১৯৩৩ তারিখ দ্রষ্টব্য)। শচীন্দ্র মাইতির আটকের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আগেই।

এই ফেব্রুআরি মাসেই প্রকাশ পেল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৬,৬৭,১০৮ টাকা। এ থেকেই বোঝা যায় সরকার এই সকল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাগুলিকে দমন করবার জন্য কিরূপে উঠে পড়ে লেগেছিল। এই মাসেই (১৬ই ফেব্রুআরি ১৯৩৩ খ্রীঃ) মুন্সিগঞ্জের স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা সেনকে হত্যার অপরাধে কালীপদ মুখুজ্যের ফাঁসি হোলো ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। পরের দিন সতর তারিখে পটিয়া থেকে পাঁচ মাইল দূরে গৈরালাতে মাষ্টার দা সূর্যসেন ধৃত হন। জেলখানাগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য কোন কোনটিতে ইলেক্ট্রিক তারের বেড়া দেওয়া হোলো।

কংগ্রেস অধিবেশনের অস্থায়ী সভাপতি মিঃ এম. এস. আনেকে কলকাতা যাওয়ার পথে খড়্গপুরে বোম্বে মেল থেকে গ্রেপ্তার করা হোলো। গোমো প্যাসেঞ্জারে কড়া পাহারায় তাঁকে মেদিনীপুরে

আনা হোলো ও মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে তাঁর উপর সাধারণ কয়েদীর স্থায় ব্যবহার করা হোলো (৩০শে মার্চ ১৯৩৩)। ঐদিন রাত্রে কলকাতায় যাট জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ভোরবেলায় বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতির তৃতীয় সভাপতি সুরেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে হানা দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য জে. সি. গুপ্ত, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, বাবা গুরুদিত সিং, ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, উর্মিলা দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, সজ্জন দেবী, মিথীবেন, কল্যাণী দাস, হেমন্তকুমার বসু, অমরেন্দ্রনাথ বসু, সীতারাম সাকসেরিয়া, ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতিকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

আবার আরম্ভ হোলো দমনের চণ্ডনীতি। অমানুষিক অত্যাচারের কবলে পড়লেন দেশের অগণিত তরুণ তরুণী। 'শ্যামচাঁদ' নামক বিশেষ ধরনের চাবুকের দ্বারা প্রহার, যখন তখন ইলেকট্রিক চার্জ প্রভৃতির সঙ্গে ছিল কম্বল ধোলাই। ভিজে কম্বল গায়ে জড়িয়ে তার উপর ঘটি দিয়ে মারা হ'ত। এতে শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন থাকত না বটে কিন্তু ভেতরের হাড় যেত ভেঙ্গে…।

অত্যাচারী নিষ্ঠুর রাজশক্তির এই সব অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হোয়ে উঠেছিল সবাই; তাই তো তারা হয়ে উঠেছিল এমনি মরিয়া, তাইতো এদেশের তরুণেরা নিজ হাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েছে। নিজের আঘাতে উড়িয়ে দিতে পেরেছে নিজেরই মাথার খুলি। তীব্র প্রতিহিংসায়, নিষ্ফল আক্রোশে ছটপট করে মরেছে তারা—প্রবল রাজশক্তির দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে যখন 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে' তখন আর কী বা করার ছিল…। তাইতো এদেশের কিশোর কিশোরীরা মাঝে মাঝে জ্বলে উঠেছে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত, পুড়িয়ে মেরেছেও

অনেককে, এবং এই কারণেই মাত্র আঠার বছরের তরুণ হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পেরেছে।

এই সময় অহিংস কংগ্রেসী ও বৈপ্লবিক আন্দোলন পাশাপাশি চলছিল। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন এগিয়ে গেছে অনেকটা, এই সময় হঠাৎ তিনি তা পরিত্যাগ করে হরিজনদের দিকে মনোযোগ দিলেন। অস্পৃশ্যতা দূর, সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির চেষ্টা প্রভৃতি কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর মতে স্বাধীনতার জন্য আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে: যার জন্য সমাজের প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার আলো পৌছিয়ে দিতে হবে। স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে শিক্ষাকে ও দেশের আপামর জনসাধারণকে। এই উদ্দেশ্যেই তার বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা জন্মলাভ করেছিল আরও বছর চারেক পরে। ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশের তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, অতঃপর এটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হোতে থাকে। অস্পৃশ্য সেবক সমিতি গড়ে তিনি এ সম্পর্কে এক ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে কাজে নামলেন। অসহযোগ আন্দোলন থেকে গান্ধীজী সরে আসায় জনসাধারণ অনেকটা বিভ্রান্ত হোলো—অন্যান্য নেতৃবর্গও কম বিস্মিত হলেন না। এই সময়েই ভারত শাসন সংস্কার সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হোলো—'যার নাম হোয়াইট পেপার।' এই প্রস্তাব একশত উনিশ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়ে সাধারণ্যে প্রকাশিত হোলো। এতে মোট দশটি অধ্যায় ছিল নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পৃথক পৃথক আলোচনার জন্য—

১। ভূমিকা
২। ভারতে যুক্তরাষ্ট্র
৩। গবর্নরের অধীন প্রদেশসমূহ
৪। যুক্তরাষ্ট্র ও উহার অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলির সম্পর্ক
৫। বিচার বিভাগ

৬। ভারত সচিবের উপদেষ্টাগণ
৭। সরকারী চাকুরী
৮। ষ্টেটিউটারি রেলওয়ে বোর্ড
৯। মৌলিক অধিকার
১০। উপসংহার।

এই অধ্যায়গুলির পৃথক পৃথক আলোচনা শেষ হয় ত্রিশ পৃষ্ঠায়। শাসন সংস্কারের প্রস্তাবগুলি পরে তিয়াত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ আলোচনায় স্থান পায়। বলা বাহুল্য বিষয়টি পুরোপুরি শাসনতান্ত্রিক এবং সুবিধাবাদি বৃটিশের আত্মরক্ষামূলক হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। বিপ্লব যখনই প্রবলাকার ধারণ করবার উপক্রম হয় তখনই বৃটিশ কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ এমনি এক একটা চাল চালত যে সেই চালের শিকার হয়ে আমাদের অনেক নেতা ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করতেন। ভাবতেন এই বুঝি শাসকগণ কিছুটা সুযোগ সুবিধা দিতে এগিয়ে আসছেন আমাদের…কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গতে দেরী হোতো না মোটেই…।

মেদিনীপুর এবং বাংলার অন্যান্য স্থানের বিপ্লবী সংস্থাগুলি এবং তার সদস্যবৃন্দ কিন্তু এরূপ কোন আপোষের প্রস্তাবের সঙ্গে হাত মেলাননি—কেননা কূটকৌশলী বৃটিশ শাসকদের আসল রূপ তারা হয়ত চিনেছিলেন মার খেয়ে খেয়ে। তাই তারা ধৈর্য ধরে আরও আট দশ বছর তাদের আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন অব্যাহত গতিতে। পরে বিয়াল্লিশের অগস্ট বিপ্লবে তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং যে প্রচণ্ড আক্রমণ তাঁরা আরম্ভ করেন তার ফলাফল সবাই অবগত আছেন।

এই সময় বাংলার বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তাদের কাজ চলছিল পুরোদমে। ১৬ই মার্চ (১৯৩৩ খ্রীঃ) কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রীটস্থ 'অমিয় নিবাস' বোর্ডিং থেকে অবাঙ্গালী পোশাকে ধরা পড়লেন কুমারী মায়া দেবী,

তাঁর সঙ্গে সত্তরটি ডিনামাইট খণ্ড পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে আরও ৪।৫ জন যুবক ধরা পড়েন। সরকারী কার্যালয়গুলি উড়িয়ে দেবার জন্য ঐ ডিনামাইট সংগ্রহ করা হয়েছিল। ফেরার বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীকে ধরবার জন্য এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে দুই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হোলো। ৩৫ নং শিব ঠাকুর লেন ও ১১ নং শীতলা লেনে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় অনেক। এর সঙ্গে জড়িত থাকায় খগেশ কর, রমেশ চাটার্জী, বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, সুশীল ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র গোস্বামী, জয়ন্ত দাশগুপ্ত প্রভৃতি গ্রেপ্তার হলেন। এ থেকেই বোঝা যায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও তাদের সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ তখনও চলছিল পুরোদমে। ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠক মাত্রেই এরূপ শত শত কাজ ও ঘটনার বিবরণ জানেন। এখানে সে সবের উল্লেখ হয়ত কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হবে।

আবার মেদিনীপুরের কথায় আসা যাক। এখানকার বিপ্লবী সমিতি কঠোর দমননীতিতে একটুও দমলেন না। তবে বিপ্লবের কর্মসূচীতে নেতৃত্বের হাত বদল হোলো কিছু কিছু। ঢাকায় লোম্যান হত্যা সম্পর্কে সুপতি রায়চৌধুরী, প্রফুল্ল দত্ত, কামাখ্যা ঘোষ, হরিপদ ভৌমিক, নীরদ দত্তগুপ্ত, প্রবোধ দত্তগুপ্ত ও ঢাকার কুমারী হেলেনা বলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। হিজলী জেলে বন্দী ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, পরে কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে আনা হয়।

কামাখ্যা, হরিপদ ইত্যাদি ধরা পড়ায় মেদিনীপুরের দলের নেতৃত্ব ভার পড়ল ব্রজ কিশোরের উপর, রামকৃষ্ণ ও প্রভাংশু হলেন তাঁর সহকারী। ডগলাস হত্যার পর প্রভাংশুকে বার দুই গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু প্রমাণাভাবে তাকে ছেড়ে দিতে হয়। এখন তিনি হলেন কলকাতা ও মেদিনীপুরের প্রধান যোগাযোগকারী।

ডগলাস হত্যার পর থেকে মেদিনীপুরের এই সব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে নানা পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন প্রকার সমালোচনা

প্রকাশিত হতে থাকে। বিরূপ মন্তব্যও কম ছিল না। এক কথায় বৃটিশ শাসকবৃন্দ এবং সেই সঙ্গে এদেশের এক শ্রেণীর মানুষও এই সব বিপ্লববাদী সক্রিয়তাগুলির উপর কালিমা লেপন করতে থাকে। তাদের যারা সমর্থক তাদেরও নানাপ্রকার সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ব্যাপস্থাপক সভায় জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি বক্তৃতায় এই ধারণা স্পষ্ট হয় যে, যে সমস্ত পত্রপত্রিকা বা সভা-সমিতি এই সব বৃটিশ হত্যার জন্য ঘৃণা প্রকাশ না করে তারাই বিপ্লবীদের সমর্থক। বৃটিশভক্ত কয়েকটি পত্র-পত্রিকা বাংলার এই আন্দোলনগুলির সম্বন্ধে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকে। মাদ্রাজের 'জাস্টিস' পত্রিকা জিতেন বাবুর বক্তৃতার সূত্রে লিখল—

"A prominent member of the Bengal Lagislative Council speaking in the Chamber on the assassination of Mr. Douglas last year, frankly avowed that, though there might be the most severe condemnation in public by leaders, there is quite a different kind of feeling in the hearts of most of them. It is highly imperative that this feeling should go, and that as early as possible. A strong antagonistic public opinion would result in the weeding out of terrorism wherever it has taken root. In Bengal particularly the long series of outrages lead one to the irresistible conclusion that on the whole, that province is not so wholly alive to the evil effects of terrorism as it should be........."

[মিঃ ডগলাসের নিযুক্তি সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একজন সুপরিচিত সদস্য বলেছেন, এটা স্পষ্ট যে, এ সম্বন্ধে নেতারা প্রকাশ্যে দোষারোপ করেছেন,

তাদের সকলের মনেই একটা পৃথক চিন্তা দেখা দিয়েছে। এ চিন্তা হবেই। জনমানসে একটি তীব্র অস্বস্তি বোধ বিপ্লববাদের মূল উৎসকে আঘাত হানতে পারবে ও তাকে মূলোৎপাটন করতে সহায়ক হবে। বাংলায় ক্রমাগত বৈপ্লবিক ঘটনাটি ঘটে চলেছে বলে এটা ঠিক নয় যে গোটা প্রদেশটাই বিপ্লব-বাদের অপপ্রভাবে দুষ্ট…ইত্যাদি।]

'ডেলি হ্যারাল্ড' নামে লাহোরের একটি পত্রিকা তো এর একটা মোক্ষম দাওয়াই বাতলে দিল—তার মন্তব্যের মূল কথা হোলো "অন্যান্য প্রদেশের নেতারা বঙ্গে গিয়া বিভীষিকাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন, তাহা হইলে বাঙ্গালীদের সুমতি হইবে…।"

অন্য কয়েকটি পত্রপত্রিকা অবশ্য নিরপেক্ষ ও নির্ভীক মতামত প্রকাশে দ্বিধা করেনি। এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মূল প্রতিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট সত্য প্রকাশ করে অ্যানি বেসান্ত ও মিঃ শিব রাও সম্পাদিত মাদ্রাজের 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজটি। তার সুস্পষ্ট মন্তব্য—

"Violence on the part of representatives...., provokes violence on the part of the other.....The remedy for the entire distemper of which these outrages are symptoms, is Swaraj. Unitil that comes, repression on the one side and violence on the other will go on intensifying each other, we are afraid."

[সদস্যদের আইন শৃঙ্খলাভঙ্গের নজির দেখেই অন্যপক্ষ উদ্বুদ্ধ হয়। স্বরাজ হচ্ছে ঐ সব বৈপ্লবিক কার্যাবলীর একমাত্র প্রতিশোধক যাদের লক্ষণ হ'ল বিশৃঙ্খলা। যতদিন তা না আসে ততদিন এক পক্ষ চাপ দেবে ও অপর পক্ষ প্রতিবাদ করবে, পরস্পর এই টানাপোড়েন চলতেই থাকবে, আমরা ভয় করছি…।]

ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই, কেননা এক পক্ষের অত্যাচার ও জুলুম বন্ধ না হ'লে অপর পক্ষ শান্ত থাকবে আশা করা যায় না। এ

প্রসঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের একটি কথা মনে পড়ল। বিনা বিচারে আটক আইন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন।—

"…জুলুম হইতে প্রতিশোধের ইচ্ছা জন্মে এবং তাহা হইতে আবার জুলুমের প্রবৃত্তি আসে। এই গোলোক ধাঁধার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ও বিপ্লবীরা ঘুরপাক খাইতেছেন…।"

এই কথা মর্মে মর্মে বোঝা যায় যখন বিপ্লবীদের আপ্রাণ চেষ্টার বিষয়ে আমরা মনোযোগ দিই। শত অত্যাচার ও উৎপীড়নেও এদের দমন করা যায়নি…বরং দ্বিগুণ তেজে এরা জ্বলে উঠেছে, নিজেরাও পুড়েছে অপরকেও পুড়িয়ে মেরেছে। মেদিনীপুরের বিপ্লবীরাও মরণপণ করে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন বৃটিশ শাসকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। কেশবপুর থানার করবন্ধ সত্যাগ্রহের উপর দমননীতি বিপ্লবীদের আরো ক্ষেপিয়ে তুলল। মেদিনীপুর শহরে পিটুনী পুলিশের খরচ যোগাবার জন্য বসল পিটুনী ট্যাক্স, শহরবাসী প্রত্যেককেই এই ট্যাক্স জমা দিতে হত (১৫।৫।১৯৩৩ তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য।)

এমনি যখন পরিস্থিতি তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন মিঃ বি. ই. জে. বার্জ, এক তরুণ আই. সি. এস. অফিসার। অতিরিক্ত পুলিশ ফৌজ ও গোয়েন্দা গুপ্তচর বিভাগ জেলার ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগল। পূর্বতন দুইজন বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের পরিণামের কথা ভেবে বার্জ অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করলেন। তিনি বাইরে যেতেন খুব কম, প্রায় সব কাজই সুরক্ষিত বাংলোয় বসে করতেন। গোয়েন্দা ও গুপ্তচরগণ সারা শহর ছেয়ে ফেলল। গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লবীদের সন্ধান পাবার জন্য তারা তোলপাড় আরম্ভ করল। শহরের পশ্চিম সীমায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে এক ইংরেজ সামরিক অফিসারের অধীনে গাড়োয়ালী সৈন্যশিবির বসল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দেহরক্ষীর সংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হোলো।

বাংলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন মেদিনীপুরে এক দরবার ডাকলেন। এই দরবারে দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন—"...মেদিনীপুরের সন্ত্রাসবাদীরা মনে হচ্ছে আমাদের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে; তারা মেদিনীপুরে কোন বৃটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জীবিত থাকতে দেবেন না। বেশ, সরকার তাদের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে। একটি সৈন্যদল শহরে মোতায়েন আছে; এরপর সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা কিছু সংঘটিত হলে সামরিক বাহিনী কঠোর হস্তে তার মোকাবেলা করবে ·।"

ঝকঝকে একটি নীল ব্লেজারের কোট পরে বার্জ গভর্ণরের পাশে বসে তার ভাষণে সায় দিচ্ছিলেন মাথা নেড়ে নেড়ে। ('বিপ্লবী মেদিনীপুর'—বিনয় জীবন ঘোষ।)

এর আগে মেদিনীপুর শহরে যে পিট্‌নী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল ১৯৩৩ সালের জুন মাসের বার তারিখে তা তুলে নেওয়া হয়।

এপ্রিল মাসে (১৯৩৩ খ্রীঃ) মৃগেন দত্ত ও শান্তি সেন পুলিশ সুপার মিঃ ইভান্সকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। এপ্রিল মাসটি জেলার ইউরোপীয় অফিসারদের নিকট ছিল ভয়ের সময়, কেননা এই 'বিপজ্জনক' মাসেই তুজন ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হয়েছিলেন, আরো কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা এই মাসেই সংঘটিত হয়েছিল। বার্জ ছিলেন শহরের টাউন ক্লাবের ফুটবল দলের ক্যাপ্‌টেন। এপ্রিলের পর থেকে মাঝে মাঝে তিনি বাইরে আসতে আরম্ভ করেন। ৮ই এবং ৩১শে অগস্ট তু'টি ফুটবল খেলায় তাঁকে হত্যার চেষ্টা হোলো কিন্তু অতিরিক্ত পাহারার জন্য সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফুটবল খেলায় তিনি বিশেষ দক্ষ ও আগ্রহী ছিলেন; কাজেই ফুটবলের সময় শেষ হয়ে গেলে বার্জকে আর বাইরে পাওয়া যাবে না। তাই বিপ্লবীরা চিন্তিত হলেন। স্থির হয় ২রা সেপ্টেম্বরের খেলায় যে কোন প্রকারে বার্জকে খতম করতেই হবে। এই কাজ সম্পন্ন করবার

জন্য মনোনীত হলেন অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত নামে দুটি তরুণ। অনাথ ছিলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র, বাড়ী সবং থানার জলবিন্দু গ্রামে। মৃগেন ফনী দাসের মাসতুতো ভাই, মেদিনীপুর কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। ফনীদের বাড়ীতেই তিনি থাকতেন। মৃগেনের স্বাস্থ্য ছিল বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট।

২রা সেপ্টেম্বর পুলিশ মাঠে টাউন ক্লাবের সঙ্গে মহমেডান দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা। বার্জ সাহেব টাউন ক্লাবের হয়ে খেলবেন। সারা মাঠ পুলিশ আর গোয়েন্দা দিয়ে ঘেরা : কেননা খেলার মাঠ তরুণদের প্রিয় জায়গা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঃ নর্টন জোন্স, সিভিল সার্জন ক্যাঃ লিনটন, পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ স্মিথ প্রমুখ ইউরোপীয়ান অফিসারগণও খেলা দেখতে এসেছেন।

অনাথ ও মৃগেন সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মাঠে নেমে খেলোয়াড়দের সঙ্গে বল কিক করছেন গোলে। খেলা আরম্ভ হবার কয়েক মিনিট আগে বার্জের গাড়ি ঢুকল মাঠে। দক্ষিণ দিকের গোলপোস্টের পশ্চিম দিকে বার্জ গাড়ি থেকে নামলেন। মৃগেন খুব জোরে বলটা কিক করলেন সেই দিকে। অনাথ তীব্র বেগে বলটা ধরতে ছুটলেন। কিন্তু বলের কাছে না গিয়ে তিনি একেবারে বার্জের সামনে এসে পড়লেন ও ক্ষিপ্রগতিতে রিভলবার বের করে গুলি চালালেন। তাড়াতাড়ি ও উত্তেজনায় প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হোলো। প্রাণের ভয়ে বার্জ সাহেব থরথর করে কাঁপছেন। তরুণ আজ মরিয়া, বার্জকে তিনি শেষ করবেনই। এক ধাক্কায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসলেন তিনি, রিভলবারের সব কটা গুলিই শেষ করলেন অত্যাচারী শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির বুকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কেউ কিছু বুঝবার আগেই ঘটে গেল এতবড় কাণ্ডটা ; বার্জের রক্ত সিক্ত করল মেদিনীপুরের মাঠকে। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে বার্জের দু'জন দেহরক্ষী গুলি চালাল। ফলে নিহতের বুকেই ঢলে

অনাথবন্ধু পাঁজা

মৃগেন্দ্রনাথদত্ত

পড়লেন হত্যাকারী, কিশোর শহীদ অনাথ পাঁজা। আর পালাতে গিয়ে মৃগেন ধরা পড়লেন মিঃ জোন্স-এর হাতে; তিনিও বেশ আহত হয়েছিলেন। পরদিন সকালে হাসপাতালে মৃগেন মারা যান। আবার কেউ কেউ বলেন গোয়েন্দা ও পুলিশের অমানুষিক নির্যাতনের ফলে সেই রাত্রেই মৃগেন মারা যান পুলিশ হাজতে।

সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে আরম্ভ হোলো পুলিশের তাণ্ডব। রাত্রেই বহু স্থানে হানা দিল গোরা ও গাড়োয়ালী সৈন্য এবং খানাতল্লাসী শুরু হোলো ব্যাপক ভাবে। গাড়োয়ালী সৈন্যের সাহায্যে খানাতল্লাসী ছিল এক অমানুষিক ব্যাপার। এই সৈন্যরা বেপরোয়া অত্যাচার করত, ঘরের যাবতীয় জিনিস ও আসবাবপত্রাদি ভেঙ্গে তছনছ করত বা পুড়িয়ে দিত। ব্যাপক ধরপাকড়ের ফলে নির্মলজীবন, ব্রজকিশোর ও রামকৃষ্ণ সহ প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন ধরা পড়লেন। এই মামলায় বিপ্লবীদলের শৈলেশ চন্দ্র ঘোষকে সরকার রাজসাক্ষী খাড়া করল ও এক বিশেষ ট্রাইব্যুন্যালে বার্জ হত্যা মামলার বিচার আরম্ভ হোলো। নির্মলজীবন, ব্রজকিশোর এবং রামকৃষ্ণের ফাঁসি ও নন্দদুলাল সিংহ, সনাতন রায়, শান্তি সেন, সুকুমার সেনগুপ্ত এবং কামাখ্যা ঘোষের দ্বীপান্তর হোলো। শান্তি পরে ধরা পড়েছিলেন, পৃথক বিচারে তার এই দণ্ড হয়। বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, পূর্ণানন্দ সান্যাল, মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সরোজরঞ্জন দাস কানুনগো বিচারে মুক্তি পেলেন।

এই ট্রাইব্যুন্যালের তিন জন বিচারক ছিলেন—

মিঃ এইচ. জি. ওয়েটে—আই. সি. এস.

মিঃ টি. এন. বসু ও মিঃ এস্. পি. ঘোষ।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে বি ১২০ ধারা যুক্ত করে তের জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

রাজসাক্ষী শৈলেশ ঘোষ রোগা ও বেঁটে একজন বালক মাত্র, বয়স তের বা চৌদ্দর বেশী নয়। নির্মলের সঙ্গে মাত্র মেলামেশা

করত। গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে নিজস্ব কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তার বিশেষ কিছু ছিল না। কালেক্টরীর অবসরপ্রাপ্ত কেরানী প্রভাতচন্দ্র ঘোষের ছোট ছেলে ছিল শৈলেশ। এদের আদি বাস ছিল পূর্ব-বঙ্গের ঢাকায়। ব্যারিস্টার নিশীথচন্দ্র সেন আসামীদের পক্ষ অবলম্বন করে শৈলেশের সাক্ষ্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করেন।

দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে ব্রজকিশোর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পুত্র, মেদিনীপুর কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। উকিল কেনারাম রায়ের পুত্র রামকৃষ্ণ। নির্মলজীবনও উকিল যামিনী জীবন ঘোষের পুত্র। নির্মলের জ্যেঠামশাই যোগজীবন, ভাই নব-জীবন ও অন্য ভাই বিনয়জীবনও বৈপ্লবিক আন্দোলনের অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। কামাখ্যা হোলো দেওয়ানী আদালতের হেডক্লার্ক যদুনাথ ঘোষের পুত্র, জেলাবোর্ডের হিসাব রক্ষক নৃপেন সেনগুপ্তের ভাইপো সুকুমার। উকিল মনোমোহন সিং-এর পুত্র নন্দদুলাল এবং জাড়ার বিখ্যাত জমিদার কিশোরীপতি রায়ের পুত্র সনাতন রায়, এঁরা সবাই ছিলেন মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, এরা এবং অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত, বিমল দাসগুপ্ত, যতিজীবন ঘোষ, পরিমল রায়, ফণীদাস, প্রভাংশু পাল, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য প্রভৃতি আবাস, কেঁদনবাবুর বাড়ী (সত্যেন্দ্রনাথের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নাম ছিল কেঁদনবাবু), রাজার দীঘি, সুকুমার সেনগুপ্তের বাড়ী গোলকুয়ারচক, পুরানো জেলখানা, কলেজ মাঠ, পুলিশ মাঠ ও শহরের ভিতরে বাইরে নানা যায়গায়, খড়্গপুর শহরে, কলকাতায় ও বাংলা দেশের অন্যান্য নানা স্থানে ১৯৩১ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নানা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল।

এই মামলায় সরকার পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান সাক্ষী দিল ফৌজদারী কোর্টের এক নূতন উকিল অমূল্যকৃষ্ণ দত্ত, তিনি প্রকাশ করলেন বার্জ হত্যার দিন নির্মল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল বার্জ

মাঠে খেলতে আসবে কিনা। ফলে মামলা সরকার পক্ষের অনুকূলে যায়—।

অতঃপর দণ্ডিত আসামীদের পক্ষ থেকেই হাইকোর্টে আপীল করা হোলো। ১৯৩৪ সালের ৩০শে অগস্ট আপীল বেঞ্চের রায়ে পূর্ব-দণ্ডাদেশই বহাল রইল। ('বিপ্লবী মেদিনীপুর—' বিনয়জীবন ঘোষ দ্রষ্টব্য।)

১৯৩৪ সালের ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের ফাঁসি হয়ে গেল মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের বধ্যভূমিতে। ফাঁসির দিন সম্বন্ধে বিপ্লবীদের বাড়ীর কাউকে কিছু জানান হয়নি, এবং একমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকা ছাড়া এ সংবাদ আর কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

পরপর তিন জন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হবার পর মেদিনীপুরবাসীদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য ক্ষেপে উঠল বৃটিশ সরকার। আর কোন ইংরেজ অফিসার মেদিনীপুরে আসতে চাইল না। অবশেষে গ্রিফিথ্ নামে এক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন। সারা মেদিনীপুরবাসীর জীবনে নেমে এল চরম দুর্দশা ও লাঞ্ছনার দিন।

গোটা শহর মিলিটারী সৈন্যে ছেয়ে গেল। রাস্তায় রাস্তায় পাহারা বসল। অনেক বাড়ী বাজেয়াপ্ত করা হোলো ও কতকগুলি রাস্তায় স্থানীয় ব্যক্তিদের চলাচল নিষিদ্ধ হোলো। কারণে অকারণে যে কোন বাড়ী খানাতল্লাসী ও বেপরোয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করে শহরে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হোলো। নারী ও শিশুদের উপর নানা প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন চলল। গুণ্ডাদের নিয়ে এক বিশেষ পুলিশ দল গঠিত হোলো এবং সামান্যতম সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা পরিবারের উপর তাদের লেলিয়ে দেওয়া হতে লাগল। নাগরিক জীবনযাত্রা এরূপ বিঘ্নিত হোলো যে শহরবাসীরা দলে দলে অন্যত্র পলায়ন করতে আরম্ভ করল।

ইউরোপীয় সমাজের ক্রোধ এত বেড়ে গেল যে খড়্গপুরের অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ রাজকর্মচারীরা দাবী জানাল, "অতঃপর মেদিনীপুরে লাইসেন্স ছাড়া যে কোন হিন্দুর নিকট অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ পাওয়া গেলে তাকে ফাঁসি দেওয়া হোক।" তাদের মধ্যে আবার জনৈক অফিসার আরও চেয়েছিলেন—"অতঃপর মেদিনীপুরে কোন সরকারী কর্মচারী নিহত হইলে আটক আসামীদের দুইজনকে টানিয়া আনিয়া নিকটস্থ বৃক্ষে ঝুলাইয়া হত্যা করা হইবে··· ।"

বৃটিশ অনুগৃহীত পত্রপত্রিকাগুলিতেও মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে যেন জেহাদ ঘোষণা করা হয়। 'স্টেটস্‌ম্যান' বেশ কায়দা করে সুপরামর্শ দেবার মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে সাবধান করে দিল মেদিনীপুরবাসীদের। তার ভাষায়—

"মিঃ বার্জ নিহত হইলে মেদিনীপুরের suspects-দিগকে সন্দেহক্রমে বিপ্লবী বলিয়া পরিগণিত করিয়া অনতিকাল-বিলম্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনার পর চার দিন অতীত হইলে মেদিনীপুরে খানাতল্লাসী হইয়াছিল। ইহার কারণ কি? আমাদের বিশ্বাস, যদি বার্জ হত্যার অব্যবহিত পরেই পুলিশকে সাহায্যদান করিবার জন্য সৈন্যদিগকে আহ্বান করা হইত, তাহা হইলে তাহাদের স্বহস্তে দণ্ডদানের অনুকূল কার্য করিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল এবং উহার ফলে মেদিনীপুর শহরটাকে জ্বালাইয়া দিবার সম্ভাবনা ছিল··· ।" ইত্যাদি যুক্তির দ্বারা স্টেটসম্যান একথাই বলতে চেয়েছিল যে সামান্য অপরাধে যখন গোটা শহরকে জ্বালাইয়া দিবার সম্ভাবনা আছে তখন দেশীয় ব্যক্তিদের সাবধান হওয়া উচিত। এই আলোচনার প্রতিবাদ উঠে এবং দেশীয় পত্রপত্রিকায় সমালোচনা বের হয়। পরে স্টেটস্‌ম্যানের আসল বক্তব্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে তার এই লেখায়—

"...সত্যই ২রা হইতে ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে মেদিনীপুরের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। যদি মেদিনীপুর জ্বালাইয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে নির্দোষীও কষ্ট ভোগ করিত। কিন্তু এমন সময় আসে, লোকের মনের অবস্থা এমন হয়, যখন মানুষ মনে করে যে, যাহাতে নির্দোষীদের জন্য দোষীদের মধ্যে অন্ততঃ কতক লোকেরও শাস্তি বিধানার্থে এইরূপ নির্বিচারে দণ্ড দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়...। ...যাহারা বর্তমানে বাংলার সমর, পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের কর্মচারীদের এবং ইউরোপীয় ও মুসলমান সমাজের কোনও কোনও শ্রেণীর লোকের মনোভাব অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। সরকারেরও এই কথা জানিবার সুযোগ আছে। আমরা তাই পুনরায় বলিতেছি যে, যে সরকার শাসন দণ্ড পরিহার করিতে অভিলাষী নহেন এবং যে সরকারের আপন সৈন্য ও পুলিশের উপর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার সম্ভাবনা ও প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে বাছাই করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিতে হয়, সেই সরকারকে পরিণামে প্রতিশোধ গ্রহণের পথই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়...।"

স্টেটস্‌ম্যানের এরূপ ইঙ্গিত ও প্রতিশোধ গ্রহণের উস্কানি বলা বাহুল্য দেশের লোকদের ভয় দেখাবার জন্য আর অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীদের প্রস্তাবিত 'ক্লু-ক্ল্যাক্স ক্ল্যানের' বা 'ব্ল্যাক এণ্ড ট্যানের' মত 'লিঞ্চল' অনুসারে যাকে তাকে ধরে এনে ফাঁসি দেওয়া কেবল ভীত সন্ত্রস্ত বৃটিশ কর্মচারীদের উষ্মামাত্র। রাজশক্তির দমননীতি এ সবের অপেক্ষা রাখেনি। তার বহুমুখী অন্যায় হস্ত সে প্রসারিত করল আরো জঘন্য ও ব্যাপকতর ভাবে।

জেলাবোর্ডের পরিচালন ভার এর আগেই সরকার গ্রহণ করেছিল। কতকগুলি কংগ্রেস কমিটি এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বে-আইনী বলে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এবারকার দমন-নীতি আরো কঠোর। জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হোলো যাতে করে তারা জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে না পারে। এই বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মন্মথনাথ দাস, জহরলাল অধিকারী, জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত, চারুচন্দ্র দাস প্রভৃতি প্রখ্যাত আইনজীবিগণ, তারকদাস ঘোষ, থাকপদ বিশ্বাস, বিনয়জীবন ঘোষ, মেদিনীপুর কলেজের বিশেষ জনপ্রিয় অধ্যাপকগণ এবং নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্র নাথ দাস, চারুশীলা দেবী, শতদলবাসিনী দাস, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঘোর চন্দ্র দাস, বিজয়কুমার মাইতি, শৈলজানন্দ সেন, ভূতেশ্বর পাইন প্রভৃতি শিক্ষকবৃন্দ। বিপ্লবিগণের প্রধান কর্মকেন্দ্র বলে অভিহিত করে হিন্দুস্কুল বন্ধ করে দেওয়া হোলো। প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন। এছাড়া অনেকগুলি বাধা-নিষেধ বলবৎ করা হোলো। মেদিনীপুর শহর, কাঁথি, ঘাটাল ও খড়্গপুরের মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় সান্ধ্য আইন বলবৎ রইল সাড়ে তিন বছর ধরে। পনর থেকে ত্রিশ বয়সের ব্যক্তিদের সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হোলো। চৌদ্দ থেকে ত্রিশ বৎসর বয়সের সকলকেই নিজ নিজ সনাক্তকরণ কার্ড রাখতে হোতো। যে কোন সরকারী কর্মচারী চাইবামাত্র তা দেখাতে হোতো। বাড়ীতে কোন নূতন লোক এলে বা বাড়ী থেকে কেউ গেলে সঙ্গে সঙ্গে থানায় জানাতে হোতো। সরকারী অনুমোদন ছাড়া কোন ছাত্র তার বাড়ীর চারদিকে তিন মাইলের বেশী দূরের কোন বিদ্যালয়ে পড়তে পারত না। যুবকগণ সাইকেল চড়তে পারবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোলো। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে অযথা মামলায় জড়ান হোলো এবং তাদের নানা ভাবে অসম্মান করা হতে লাগল। বন্দুকের লাইসেন্সও বাতিল করে দেওয়া হোলো অনেকের। কংগ্রেস নেতাদের যারা

সাহায্য ও সমর্থন করত তাদের নানা ভাবে বিব্রত করা হতে লাগল। সারা জেলায় সশস্ত্র সৈন্যের কুচকাওয়াজ, মহড়া ও খানাতল্লাসী চলতে লাগল। অতিরিক্ত পুলিশবাহিনীর ব্যয়ভার মেদিনীপুর-বাসীদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হোলো।

১৯৩৪ সালে গান্ধীজী ভারতীয় কাউন্সিলে দেশীয় প্রতিনিধি প্রেরণের অনুমতি পেলেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল Indian Legislative Assembly-তে জাতীয় সদস্যরূপে নির্বাচিত হলেন কিন্তু সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। মৃত্যু-কালে মেদিনীপুরের এই বীর বলে গিয়েছিলেন যে, জীবনে কখনো গুরুজন ব্যতীত কারো কাছে তিনি মাথা নত করেননি, মৃত্যুর পরও তাঁর মাথা যেন নত করা না হয়। চেয়ারে উপবিষ্ঠ অবস্থায় তাই তাঁকে দাহ করা হয়।

যাই হোক Assembly-এর সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে সরকার মনোনীত প্রার্থী দেওয়া হোলো। সরকারী প্রার্থীরা প্রচার করতে লাগল বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসপ্রার্থীকে ভোট দিলে মেদিনীপুরবাসীদের উপর আবার অত্যাচার করা হবে। বিশেষ করে দেবেন্দ্রলাল খাঁন ও কিশোরীপতি রায়ের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হতে লাগল। কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে শহীদের দেশের লোকেরা বিন্দুমাত্র ভীত হোলো না। কংগ্রেস প্রার্থী দেবেন্দ্রলাল খাঁন পেলেন ৭২০০০ ভোট, তার প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার সমর্থিত প্রার্থী পেল মাত্র ৫০০ ভোট। কংগ্রেস কমিটি এবার কাজ করবার অনেকটা স্বাধীনতা পেল। সুভাষচন্দ্র এসে সারা জেলা পরিদর্শন করে গেলেন।

শুধু মেদিনীপুরে কেন ১৯৩৫ সালে ভারত-শাসন আইনের বলে কংগ্রেস সারা দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনে অংশ গ্রহণ করবার অধিকার পায়। এই আইনের দু'টি মূলনীতি স্থির হয়েছিল—

(ক) যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা,

(খ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

প্রথম নীতিটি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কথা দেশবাসী মানল না,—ফলে কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বিরোধ বেড়ে গেল। দক্ষিণ পন্থীরা চাইলেন আপাত সুযোগ-সুবিধাগুলিতেই সন্তুষ্ট থেকে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করার। সুভাষচন্দ্র এই মতের সমর্থক ছিলেন না। তাঁর সভাপতিত্বে হরিপুরা কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রস্তাব আনা হয়, কিন্তু বামপন্থীরা সংখ্যায় কম থাকায় সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার উপায় রইল না। তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করলেন।

দেখতে দেখতে সারা বিশ্বের সংকটময় দিন এগিয়ে এলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন (সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) তখন অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। সেই অজুহাতে মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলাঞ্চলকে সরকার 'বিপজ্জনক অঞ্চল' বলে ঘোষণা করল। D. I. আইনের বলে বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের অনেককে গ্রেপ্তার করা হোলো। গান্ধীজীর জনকয়েক বিশ্বস্ত অনুচর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার হলেন। জাপানী শত্রুর ভয়ে বৃটিশ রাজশক্তি ভীত হোলো ও জেলার দক্ষিণ উপকূলাঞ্চলে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল। এই পথে শত্রু আক্রমণ করতে পারে এই আশকংায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে জেলার যাবতীয় ট্রাক, বাস, ট্যাক্সি, সাইকেল, নৌকা প্রভৃতি যাবতীয় যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হোলো।

ওদিকে অন্তরীণ অবস্থা থেকে নেতাজী পালিয়ে গেলেন ও বিদেশে প্রবাসী ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করে গঠন করলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ (১৯৪৩ খ্রীঃ) এবং বৃটিশের সঙ্গে সন্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন রাজধানী দিল্লী অধিকার করার উদ্দেশ্যে। সন্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে দেশবাসীকে তিনি একাই আহ্বান জানালেন। শুধু আদর্শ প্রচারের নেতা তিনি নন, নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে

এগিয়ে গেলেন সংগঠনের মাধ্যমে,—আক্রমণ করে অধিকার করলেন পরাধীন ভারতের কিছু মাটি। এদিকে মেদিনীপুরেও চলতে লাগল এক ব্যাপকতর আন্দোলনের প্রস্তুতি। বারবার ব্যর্থ হয়ে, অনেক রক্ত ঝরিয়ে—অনেক আত্মীয়কে বিদেশী শাসনের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েই তাঁরা হয়ত হ'য়ে উঠেছিলেন এমনি দুঃসাহসী।

———

সপ্তম অধ্যায়

শেষ আঘাত ও সাফল্য

অগ্নিঝরা বিয়াল্লিশ (অগস্ট বিপ্লব)

(১৯৪২-৪৭খ্রীঃ)

"...ফাঁসির কাঠটা আমার কাছে ইংরেজের একটা পুরানো রসিকতা বলে মনে হচ্ছে...।"—শহীদ প্রদ্যোৎকুমার।

ভারতের বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করবার জন্য বিলাতের মন্ত্রিসভা স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে পাঠালেন কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব নিয়ে ১৯৪২-এর মার্চ মাসে। ক্রিপ্‌স-এর দৌত্য ব্যর্থ হোলো। দেশে অশান্তি বেড়েই চলল। গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় দাবী জানালেন ইংরেজকে অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করতে হবে। তাঁর মতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি অতি সহজেই নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে নিতে পারবে—যদি ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যায়। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই আমাদের মিলেমিশে চলতে হবে। রাজ্য পরিষদের সেক্রেটারী Mr. L. S. Ameri এর কথার জবাবে তিনি বলেছিলেন—

"Let them (the British) withdraw from India and I promise that the congress and the Muslim League will find it to their interest to come together and devise a home made solution for the Government of India. It may not be scientific, it may not be after any western pattern but it will be durable. It may be that before we come to that happy state of affairs, we may have to fight amongst ourselves. But if we

agree not to invite the assistance of any outside power, the trouble will perhaps last for a fortnight."

[বৃটিশ যদি ভারত থেকে চলে যায় তাহ'লে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজেদের স্বার্থেই এর একটা সুষ্ঠু সমাধান করে একসঙ্গে চলবে। সেটা বিজ্ঞান সম্মত বা পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুরূপ না হতে পারে কিন্তু তা স্থায়ী হবে। সেই সুষ্ঠু অবস্থায় আসার পর আমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করতে পারি, কিন্তু তার জন্য কোন বাইরের শক্তিকে আমন্ত্রণ জানাতে ইচ্ছা করব না, সেই অসুবিধা সম্ভবতঃ পক্ষকাল স্থায়ী হবে।]

অথচ দুর্ভাগ্য এই যে, ভারতের দুই বৃহত্তর দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কোনদিনই সে বিরোধ মেটাতে পারেনি। বর্তমান দ্বিখণ্ডিত ভারতে হিন্দুস্থান পাকিস্থান সম্পর্ক ও উভয় দেশেই রাজনৈতিক দলগুলির মতানৈক্য যে কি জঘন্য পরিস্থিতির উদ্ভব করেছে তা দেখে মহাত্মাজীর বিদেহী আত্মা হয়ত অনবরত দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর তারই বিষবাষ্পে সারা দেশ আজ কলুষিত।

১৯৪২ সালে ৮ই অগস্ট বোম্বাই কংগ্রেসে 'ভারত ছাড়' বা কুইট ইণ্ডিয়া' ধ্বনি তুলবার প্রস্তাব গৃহীত হবার পর সারা ভারতে যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন দেখা দিল, ভারত ইতিহাসে এটিই বিয়াল্লিশের অগস্ট বিপ্লব। অধিবেশনের বক্তৃতায় গান্ধীজী বললেন—

We shall do or die, we shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see perpetuation of slavery . ."

আমরা করব না হয় মরব, হয় ভারতকে স্বাধীন করব না হয় সেই চেষ্টায় প্রাণ দেব, চির পরাধীনতা দেখবার জন্য আমরা বাঁচতে চাই না। সেই সঙ্গে সারা ভারত গর্জে উঠল 'do or die,' 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে', 'করব না হয় মরব।'

চিরবিদ্রোহী মেদিনীপুরে এই আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ

করে। মেদিনীপুরের বিপ্লবিগণ মরণপণ করে প্রচণ্ড বিক্রমে বিদেশী শাসকের সঙ্গে শেষ বারের মত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। ফাঁসির দড়ি, দ্বীপান্তরের দুঃসহ নির্বাসন বাস, বৃটিশ জেলের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও পুলিশের অকথ্য নির্যাতন আর তাদের দাবিয়ে রাখতে পারল না। এই জেলার সর্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অংশ গ্রহণ করল এই জনজাগরণে, এমনকি জেলায় বৃটিশ কর্তৃত্ব বানচাল হবার উপক্রম হোলো।

সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হোলো ক্ষমতাদৃপ্ত বৃটিশ রাজশক্তির কঠোর দমননীতি। সারা দেশে স্বেচ্ছাচার ও পুলিশের অত্যাচারের বিভীষিকার বান ডাকল। কোন ন্যায়, নীতি ও আইন শৃঙ্খলার বালাই ছিল না, কে প্রকৃত দোষী? কে তার বিচার করবে? এরূপ চণ্ডনীতির যূপকাষ্ঠে পরাধীন দেশবাসীর অসহায় কান্না ও মরিয়া সংগ্রামের আকুলতা মিশে সৃষ্টি করল এক অবর্ণনীয় অবস্থার—। 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে' দেশে দেশে সর্বকালেই আমরা জানি 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে⋯।'

বৃটিশের মাতৃভূমিতে তখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে ডিক্টেটারের বেশেই সমাসীন মিঃ চার্চিল, তিনি যেমন নাটকীয় সমারোহের সমর্থক, এদেশে তাঁদেরই প্রতিনিধি লর্ড লিন্‌লিথগোর কর্মসূচীও সেরূপ মহা সমারোহে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করল।

বোম্বাই অধিবেশন চলাকালেই বৃটিশ রাজশক্তি আসরে অবতীর্ণ হোলো। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন তখনো শেষ হয়নি, পরবর্তী আন্দোলনের কোন নির্ধারিত কর্মসূচীও প্রকাশিত হোলো না। গান্ধীজী লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগও পেলেন না; ৯ই অগস্ট তাঁকে এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হোলো এবং কোন অজ্ঞাত স্থানে আটক রাখা হোলো। প্রচণ্ডবিক্রমে বৃটিশ সরকারের 'ব্লিৎসক্রিগ' শুরু হলে দেশের সর্বত্র হাজার হাজার নেতা ও কর্মী ধৃত এবং কারারুদ্ধ হলেন।

মেদিনীপুরবাসিগণ স্বেচ্ছাচারী শাসকের এই চণ্ডনীতি নীরবে মেনে নিলেন না। ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর রাত্র প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জননেতা অজয়কুমারের নেতৃত্বে ক্ষিপ্ত জনতা সরকারী থানা, ডাকঘর, অফিস, আদালত, ডাক বাংলা প্রভৃতি আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল। সারা শহর তখন গোরা ও দেশী সৈন্যে সুসজ্জিত যেন একটি সুরক্ষিত কেল্লা। সব বিপদ অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসতে লাগল নিরস্ত্র জনতা থানা, ট্রেজারী ও সরকারী দপ্তর দখল করতে। কণ্ঠে সবার অভয় মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'—অন্তরে তাদের দুর্জয় শপথ 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'।

শহরের প্রবেশ পথে সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে তাদের শুরু হয়ে গেল মুখোমুখি সংগ্রাম। অমর শহীদের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হ'তে লাগল। তবুও জনতা বিন্দুমাত্র দমেনি।

এমনি একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। গুলিবর্ষণে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি জাতীয় পতাকা নিয়ে উত্তর দিক থেকে শহরে প্রবেশ করবার জন্য অগ্রসর হলেন। অমনি পশুশক্তির আক্রমণে বৃদ্ধার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—হাতে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরা জাতীয় পতাকা—মুখে শেষ আওয়াজ বন্দেমাতরম্।

এই ভাবে সেদিন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হোলো একচল্লিশ জন এবং আহত হোলো তিনশ জনের উপর। সংগে সংগে জনসাধারণের উপর নির্যাতন শুরু হোলো।

এদিন মেদিনীপুরের বাঙালী মেয়েরাও বিদেশী শাসনের অবসানে দল বেধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন—পুরুষের সঙ্গে রণসাজে সেজেছিলেন—এগিয়েছিলেন মৃত্যুর তালে তালে।

দেখতে দেখতে সেদিন মেদিনীপুরের ভিতরেও বিপ্লবীদের সঙ্গে সরকারী সৈন্যের প্রকাশ্য সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। সেনা-

বাহিনীর অত্যাচারের নির্মমতা বুঝি সেদিন মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

অবিলম্বে তমলুকেও বিপ্লবীরা জাতীয় সরকার ঘোষণা করলেন —এই সরকারের উপদেষ্টা হলেন অজয়কুমার। জাতীয় সরকারের সর্বপ্রথম সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত। এই সময় শ্রীসুশীল ধাড়া—শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত এবং শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারে পুলিশ, ডাক, তার, খাদ্য, সরবরাহ, অর্থ, যোগাযোগ সব রকম বিভাগই ছিল। জাতীয় সরকারের টাকা থাকত ব্যাঙ্কে, আর তার রক্ষী ছিলেন অজয়কুমারের বিধবা বৌদি শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবী।

এ সময় সুতাহাটা থানার বিদ্যুৎবাহিনার কাজও চলছিল পুরা দমে! এই বাহিনীকে রীতিমত সামরিক মর্যাদায় গড়ে তোলা হয়েছিল। এতে তিনটি বিভাগ ছিল—(১) সমর বিভাগ, (২) গোয়েন্দা বিভাগ এবং (৩) এম্বুলেন্স বিভাগ। এম্বুলেন্স বিভাগে ডাক্তার এবং নার্সও ছিলেন। এই সব বিভাগীয় কার্য এত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছিল যে পরবর্তিকালে বিদেশী শাসক তাঁদের সরকারী বিবরণে লিখেছিলেন—"মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা যে ভাবে তাঁদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনা করেছিলেন তাতে উন্নত ধরনের নৈপুণ্য এবং শৃঙ্খলা বোধের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁদের গোয়েন্দা বিভাগের কার্যকলাপও ছিল অতি দক্ষতাপূর্ণ।

অতঃপর বিদ্যুৎবাহিনীকেই অন্যান্য দলের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিলেন অজয়কুমার। তখন তার নাম হয়েছিল জাতীয় বাহিনী। জাতীয়বাহিনী গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে উঠে ভগ্নীবাহিনী ও আইন বিভাগ। বিদ্যুৎবাহিনী এবং ভগ্নীবাহিনী— এ দু'টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সুশীল চন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তাঁরই উৎসাহে এবং কর্মদক্ষতায় বাহিনী দু'টি সুশৃঙ্খল ভাবে গড়ে ওঠে।

জাতীয় সরকারের সমস্ত বিভাগের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার বিচার বিভাগ। মেদিনীপুরের প্রত্যেক থানার অধীনে জাতীয় সরকারের একটা আলাদা বিচার বিভাগ ছিল। সেখানকার আদালতে কোন মামলা দায়ের করতে হলে মাত্র এক টাকা ফি নেওয়া হোতো। এই সব আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী দুটি বিভাগই ছিল। সর্ব শেষ বিচারের জন্য তিন জন বিচারক নিয়ে একটা ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল। তাছাড়া জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত ছিল। ছোট বড় অসংখ্য মামলা জাতীয় সরকারের এই আদালতে মীমাংসিত হয়েছিল।

জাতীয় সরকারের একটি বিভাগের নাম ছিল যুদ্ধ বিভাগ। এই বিভাগের কাজ ছিল—সরকারী নির্যাতনের প্রতিরোধ করা। যুবক ও নারীদের হাতে অস্ত্র দিয়ে তাদের সংঘবদ্ধ করা ছিল তাদের একটি প্রধান কাজ।

গোয়েন্দা বিভাগের কাজ ছিল গোপনীয় খবর সংগ্রহ করা। তাছাড়া মহকুমার আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজও তারা করত।

বিপ্লবীরা ক্রমাগত চেষ্টায় মেদিনীপুরের সরকারী শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দিল—বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে গড়ে উঠল জাতীয় সরকার। সাধারণত এই সব অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কর্তা হিসেবে একজন সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হতেন। তাঁর অধীনে একটা মন্ত্রণা পরিষদ থাকত। কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত করে প্রত্যেকের উপর এক একটি বিভাগের ভার দেওয়া হোতো।

জাতীয় সরকারের শাসনাধীন সমস্ত অঞ্চল কয়েকটি ছোট ছোট এলাকায় ভাগ করা হয়েছিল। এই এলাকাগুলিতে জনসাধারণের নির্বাচিত পঞ্চায়েত শাসন কাজ চালাত। এই সব কাজে সহায়তা করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

অন্যদিকে অপরাধীকে শাস্তি দেবার জন্য জেলখানা তৈরী হয়েছিল। জাতীয় সরকারের শত্রু বলে বিবেচিত হলে তাকে গ্রেপ্তার করে এনে রীতিমত বিচার হোতো।

জাতীয় সরকার সব চেয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল তমলুকে। সেখানকার কার্য পরিচালনার পরিচয় পেয়ে ইংরেজ সরকার তার প্রশংসা না করে পারে নি। সংক্ষেপে এই হোলো মেদিনীপুরের জাতীয় সরকারের রূপ এবং পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাসে এইরূপ গঠনমূলক কাজের নিদর্শন হয়ত বিরল।

অন্যদিকে ইংরেজ শাসকের আদেশে সারা মেদিনীপুরে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী যে নির্যাতনের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল তা শুনলে শরীর শিউরে উঠে। পুলিশ ও সৈন্যরা নির্যাতনের যে সব উপায় নিত্য নূতন উদ্ভাবন করত তা বর্বর যুগের অত্যাচারের কাহিনীকে ছাড়িয়ে যেত। অত্যাচারের আর একটি প্রধান নমুনা ছিল ঘর পুড়িয়ে দেওয়া। এমনি করে কত নিরীহ গৃহস্থ আর গরীব চাষীর ঘর যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার সীমা নেই। এতো অত্যাচারেও মেদিনীপুরের অধিবাসীদের মুক্তি আন্দোলনে ভাঁটা পড়েনি। আঘাতের পর আঘাতে তারা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। সুশীলচন্দ্র হয়েছিলেন ইংরেজ শাসকের চোখে এক বিভীষিকা স্বরূপ। তাঁর মাথার জন্য ইংরেজ সরকার দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

মেদিনীপুরে বিশেষ ভাবে কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় যখন বৃটিশের চণ্ডনীতি ঘোষিত হোলো সেই সময় মহাসপ্তমীর দিন এল ঘূর্ণীঝড় ও প্লাবন। সেই প্লাবনে কত হাজার লোক যে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই প্লাবনের পর বৃটিশ আর দমননীতি চালাতে সাহসী হোলো না। ঘূর্ণীঝড়ই মেদিনীপুরকে বৃটিশ অত্যাচার থেকে শেষ রক্ষা করেছে।

সারা ভারতে অগস্ট বিপ্লবের রূপ দেখে ইংরেজ সরকার
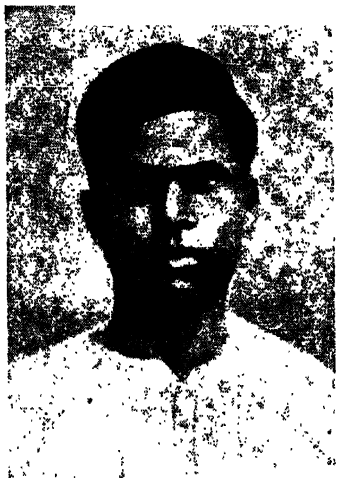
রামকৃষ্ণ রায়
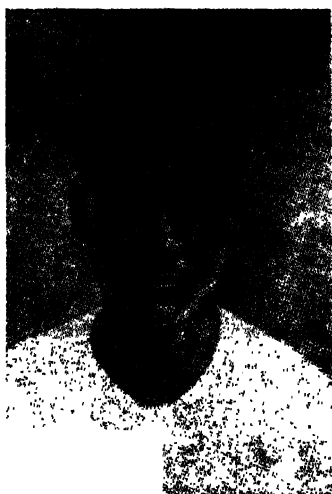
ব্রজকিশোর চক্রবর্তী

মাতঙ্গিনী হাজরা

নির্মলজীবন ঘোষ

আতঙ্কিত হয়ে উঠে। অতঃপর গান্ধীজীকে মুক্তি দিয়ে ইংরেজ সরকার তাঁর সঙ্গে একটা আপোষ রফা করতে চাইল। গান্ধীজীর আবেদনে মেদিনীপুরে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ হোলো। জেলার নেতৃবর্গ গান্ধীজীর নির্দেশে আত্মসমর্পণ করলেন। ইংরেজ-সরকারের বিচারে তাদের দীর্ঘ ছয় সাত বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড হোলো।

এবার শহীদ মাতঙ্গিনী প্রসঙ্গে আসা যাক। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনীর জন্ম ১২৭৭ বঙ্গাব্দে তমলুকের হোগলা গ্রামে। নিকটবর্তী আল্যান গ্রামের ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে অল্প বয়সেই তাঁব বিবাহ হয় কিন্তু মাত্র আঠার বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। শেষ জীবনে গান্ধীজীর জীবনাদর্শ ইনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন বলে স্থানীয় লোকদের কাছে তিনি 'গান্ধীবুড়ি' নামে পরিচিতা ছিলেন। বিপ্লবীদলের তরুণ তরুণীদের তিনি খুব ভাল-বাসতেন। বাড়ীব পাশ দিয়ে কোন শোভাযাত্রা গেলে শাঁখ বাজাতে বাজাতে তিনি বেরিয়ে আসতেন। বাতের জন্য কষ্ট পেতেন বলে মাঝে মাঝে তাঁকে আফিম খেতে হ'ত, কিন্তু গান্ধীজীর 'মাদক দ্রব্য বর্জন' আন্দোলনের কথা শুনে তিনি একদিনেই সে অভ্যাস ত্যাগ করেন। ১৯৩৩ সালের জানুআরি মাসে বাংলার গভর্ণর যখন তমলুকে গিয়েছিলেন তখন কালো পতাকাসহ শোভা-যাত্রা করার জন্য তাঁকে একবার গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁর সঙ্গে ছিলেন মোক্ষদা মঠ, বসন্ত দেবী, কামিনীবালা বর্মন, শৈলবালা বর্মন এবং মুক্তকেশী সামন্ত। থানায় কিছুক্ষণ আটকে রাখার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।• (১৩।১।১৯৩৩ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। পরে কিছুদিনের জন্য তাঁকে কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছিল।

'অগস্ট বিপ্লবে' মেদিনীপুরের সকল শ্রেণীর, সকল সমাজের লোক, স্ত্রী-পুরুষ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে।

এই গোলযোগ আয়ত্তে আনতে বৃটিশ রাজশক্তিকে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এই বিপ্লবের শেষে স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল হিসাব দেন যে, ১৯৪২ এর অগস্ট থেকে ঐ বৎসরের শেষ পর্যন্ত 'প্রকাশ্য বিদ্রোহ' দমনার্থে ৫৩৮ বার গুলি বর্ষণের প্রয়োজন হয়েছে, পুলিশ আর মিলিটারীর গুলিতে নিহত হয়েছে ৯৪০ জন, আর আহত হয়েছে ১৬৩০ জন, মোট বন্দীর সংখ্যা ৬০২২৯ জন। অগস্ট বিপ্লবে মেদিনীপুরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অত্যাচারের নিখুঁত চিত্র ১৭৯-১৮০ পৃষ্ঠার তালিকা দেখুন।

এই বিপুলসংখ্যক নিহত, আহত আর বন্দীর সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায় সেদিন সেই গণআন্দোলনকে দমন করবার জন্য কি কঠোরতম দমননীতির আশ্রয় নিয়েছিল বৃটিশ রাজশক্তি। বেসরকারী হিসেবে এই সময় লক্ষাধিক লোক কারারুদ্ধ হয়েছিল এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল অন্তত পঁচিশ হাজার জন। সত্যিই জওহরলাল নেহেরুর ভাষায়,…"সিপাহী বিদ্রোহের পরে এতবড় ব্যাপার ভারতবর্ষে আর কখনো ঘটে নাই।"

কিন্তু বেয়নেট, বুলেট আর গোলাগুলির ভয় দেখিয়ে ভারতের মত বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ শাসন করা যায় না। শাসিতের সমর্থন ও সহযোগিতাই যে শাসন ক্ষমতার আয়ু একথা বোঝেনি বৃটিশ রাজ শক্তি; ফলে দেশীয় জনগণের সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া দূরে থাক এদেশের প্রত্যেকটি মানুষ যেন বৃটিশের জাত শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। এর জন্য শাসক সমাজের কঠোর অত্যাচার ও অমানুষিক দমননীতিই যে মুখ্যতঃ দায়ী একথা বলাই বাহুল্য। তাই এই প্রচণ্ড বিদ্রোহে হয়ত কিছুটা টনক নড়ল এদেশের শাসনকর্তাদের; আর বড় কর্তাদের চৈতন্য হোলো সুদূর গ্রেটবৃটেনের পার্লামেণ্টে বসে।

অগস্ট বিপ্লবের সময়কার তমলুক মহকুমায় দমননীতির চিত্র (অগস্ট-ডিসেম্বর '৪২)

			সুতাহাটা	মহিষাদল	নন্দীগ্রাম	তমলুক	মোট
গুলিচালনা	নিহত	—	৩	১৮	১২	৮	৪১
	আহত	—	৬	৫২	১৩	১৬	৯৭
মহিলাদের উপর অত্যাচার	ধর্ষণ ও তার চেষ্টা	—	৫	৬	১০	৮	২৯
	দৈহিক নির্যাতন	—	১৬	৭	৯	৮	৪০
বেআইনী আটক		—	২০	১৬৮	১	৯	১৯৮
গ্রেপ্তার		—	৪৩২	১৭৬	১৭৫	৬১	৮৪৪
দৈহিক নির্যাতন		—	১২৬	১৭৮	১১৬	৯৫	৫১৫
গৃহে অগ্নিসংযোগ, লুঠ ইত্যাদি		—	২০১	২১৯	৩২১	৪৭	৭৮৮
মোট আর্থিক ক্ষতি		—	১৮৫৬৭৫ টা.	৪৮০২৫ টা.	৭৪২০০ টা.	১৬১০০ টা.	৩ লক্ষ ২৪ হাজার
যৌথ জরিমানা আদায়		{	সমগ্র থানায় ৫০,০০০ টাকা	৯টি ক্ষেত্রে ৫০,০০০	১২টি ক্ষেত্রে ৫০,০০০	৬টি ক্ষেত্রে ২৫,০০০	১,৭৫,০০০
গৃহ তল্লাসী		—	২১৪	৩৪৩	৩৩১	৫৩৬	১,৪২৪
পুলিশ পরোয়ানা		—	৯	৩৫	—	২৩	৬৭
বেআইনী ঘোষণা (সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি)		—	২	৩	৫	২	১২
১২৯ নং ডি. আই আইনে আটক		—	৩	—	—	২	৫

অগস্ট বিপ্লবের সময় জেলার অন্যান্য স্থানে সরকারী দমননীতির চিত্র। (জানুআরি '৪৩)

	রাননগর থানা	খেজুরী	কাঁথি	এগরা	ভগবানপুর	পটাশপুর	কাঁথি
গুলিতে নিহত	৯	—	৭	২	১৬	৩	—
আহত	২৪	—	১৬	১	৮৩	৯	—
ধর্ষণ ও চেষ্টা নারী নির্যাতন*	৮	১২	৬	১৭	২৯	৬৮	৬৮
গ্রেপ্তার	৮৫	৮২	১৫৩৭	২১৩ (হাজত ৮২)	১৬২৬	৪৮৩	১৮৯৪
গৃহদাহ	৩১৩	২০	৪৫২	১৪২	৪৫২	—	৯
লুঠ	২১৭	৬৬	১৮৫	২৫৪	১৮১	৪৬১	৭৬৬
নির্যাতন	৭৩	১৯২	৩১০	৩১৭	৩১০	—	১১০০
মোট ক্ষতি (টাকার)	২,২৯,১৪৩	৪২,৭৭৯	—	১,২৬,২৩২	—	৭৯,২৫৪	—

(*এই সব ঘটনায় নাবালিকা, আসন্নপ্রসবা এবং সদ্যপ্রসূতা মহিলাগণও বাদ যান নাই)

'৪২ এর আন্দোলনে দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সক্রিয় ভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেশবাসীর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ পাবার আশায়। এই সময়ই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি হয়ে উঠল নড়বড়ে, যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এই বাংলারই মাটিতে ১৭৫৭ সালে পলাশীতে। তার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে এদেশের মানুষকে শোনানো হয়েছে 'ভেতো বাঙ্গালী,' সামরিক শক্তি ও বুদ্ধিতে পশ্চাদ্‌পদ, সৈন্যদলে তাদের স্থান নেই, যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাঙ্গালী অচল, তারা অসামরিক জাতি, হিন্দু দুর্বল চিত্ত, ধর্মপরায়ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই অপপ্রচারের অন্তরালে বাঙ্গালীকে চিরদিন নিরস্ত্র করে রাখবার চক্রান্ত কিন্তু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সত্যিই বাঙ্গালী দুর্বল চিত্ত, অসামরিক জাতি কি না। কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বাঙ্গালীর সামরিক প্রতিভা অক্ষুণ্ণ এমন কি স্বাধীনোত্তর যুগেও স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীতেও সে প্রতিভার স্বাক্ষর অব্যাহত। অথচ সিপাহী বিদ্রোহের পর পিল কমিশন তার রিপোর্টে নির্লজ্জ ভাবে লিখল "....হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণ ও মুসলমানদিগকে সৈন্য বিভাগে আর যেন গ্রহণ করা না হয়....।"

বাঙ্গালীর সামরিক অযোগ্যতার কথা বৃটিশ যতই তারস্বরে প্রচার করুক তাদের সাম্রাজ্যের বিপদের দিনে জার্মান যুদ্ধকালে এই 'ভেতো বাঙ্গালী' নিয়েই গঠিত ৪৯নং পল্টন মেসোপোটেমিয়া ও কুর্দিস্তানের যুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ফরাসীর বাঙ্গালী প্রজারাও গোলন্দাজ সৈনিকরূপে ভার্দুনের যুদ্ধে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেয় (মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৪০ দ্রষ্টব্য)।

আর এই বিংশ শতাব্দীতেই চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ও উড়িষ্যার বুড়িবালামের তীরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙ্গালী সৈনিকের আক্রমণে সচকিত হতে হয়েছিল প্রবল পরাক্রান্ত

বৃটিশ শক্তিকে····। নজরুলের যে লেখনী তীক্ষ্ণধার তরবারি অথবা অগ্নিস্রাবী রাইফেলের চেয়েও তীব্র আঘাত হানত বৃটিশের বুকে তিনিও বাঙ্গালী পল্টনের সৈনিক ছিলেন এক সময়ে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাই তাঁকে পশুশক্তির বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহী' করে তোলে।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের আর এক প্রধান অস্ত্র ছিল সাম্প্রদায়িক উস্কানি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তারা মাঝে মাঝে প্রচার চালাত কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস শিক্ষিত মানুষের সংগঠন ইত্যাদি। এই অপপ্রচারে কিছুসংখ্যক লোক বিভ্রান্ত হোতো। না হ'লে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে হিন্দু মুসলমান কোন ভেদাভেদ ছিল না। বঙ্গভঙ্গের সময়ও আমরা দেখেছি আন্দোলনের মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না। হিন্দু মহাসভার ভাই পরমানন্দ বলেছিলেন—

"····কংগ্রেসে প্রথমে কোন সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ ছিল না, কংগ্রেস ছিল প্রথমে অসাম্প্রদায়িক। যে দিন হইতে স্যার সৈয়দ আমেদ কংগ্রেস ছাড়িয়া দিলেন সেই দিন হইতেই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদজ্ঞান আরম্ভ হইল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ভেদনীতির পাল্টা জবাবে ঢাকায় মুসলিম লীগ জন্ম নিল। আর মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে রাজ প্রতিনিধির নিকটে মুসলিম ডেপুটেশন গিয়া ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে মুসলিম স্বতন্ত্র প্রতিনিধি প্রেরণের দাবী করিলেন।" (সাময়িক প্রসঙ্গ, মাসিক বসুমতী কার্তিক ১৩৪০, দ্রষ্টব্য)।

আর গান্ধীজীর চেষ্টায় ধর্মীয় খিলাফৎ আন্দোলন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়। তুরস্কের সুলতান মুসলমানদের ধর্মনেতা বা

"এত রক্ত, এখনো এত রক্ত রয়ে গেছে! ভাগ্যবান আমি, এর প্রতিটি বিন্দু উৎসর্গিত হয়েছে আমার মাতৃভূমির অর্চনায়···।"—বাঘা যতীন।

(বালেশ্বর সরকারী হাসপাতালে মৃত্যুশয্যার বাণী, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫)

খলিফা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে জার্মানী পক্ষে যোগ দেয়। যুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হয়ে তুরস্কে খুব অত্যাচার করে, এই হোলো খিলাফৎ আন্দোলনের পটভূমিকা। ভারতের মুসলমানগণও এই আন্দোলন করেন। তাই তাদের মধ্যেও বৃটিশ বিরোধী মনোভাব জেগে উঠে। তাই পরবর্তী কালে দেখা যায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষের দিকে মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র মনোভাব। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে····। কৌশলী ইংরেজ এই আত্মকলহকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির কাজে অনেকটা সফল হতে পেরেছিল এবং অবশেষে যাবার সময় শেষ আঘাত হেনে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল খণ্ডিত ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে।

স্বাধীনতা লাভ

"কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে···"

—বিদ্রোহী নজরুল।

অগস্ট বিপ্লবে বৃটিশের কঠোর দমননীতির ফলে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। নেতাদের বন্দী করে রাখলেও জনসাধারণ শান্ত হোলো না। জিন্নার পৃথক রাষ্ট্রের দাবীও চলতে লাগল পুরোদমে। নেতৃত্বহীন জনসাধারণের ব্যাপক গণআন্দোলন শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি করল। নিরুপায় হয়ে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের জুন মাসে নেতাদের মুক্তি দিলেন। সিমলা অধিবেশনে আপোষ আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলির কোন স্থির সিদ্ধান্ত পৌছাতে পারল না। শাসন পরিষদে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সদস্য পদ নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা চলল কিন্তু মীমাংসা হোলো না। দিল্লীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের

বিচারে কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের প্রশংসনীয় উদ্যম ও প্রচেষ্টার কথা প্রচার করল। ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেস কেন্দ্র ও প্রদেশগুলিতে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করল।

এর মধ্যে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুআরি মাসে বোম্বাই-এ ভারতের নৌবাহিনীর কর্মচারীরা বিদ্রোহ করেন। পরিস্থিতি ক্রমশঃই জটিল হতে চলেছে দেখে মার্চ মাসে ভারত সচিব পেথিক লরেন্স, এ. ভি. আলেকজাণ্ডার ও স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ নিয়ে গঠিত মন্ত্রীমিশন ওয়াভেলের মধ্যস্থতায় দেশীয় নেতৃবৃন্দের সহিত শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করলেন। ১৬ই মের ঘোষণার দ্বারা স্থির হোলো কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত হ'লে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গণপরিষদ গঠন করতে ও অস্থায়ী ভাবে কেন্দ্রীয় শাসন কার্য পরিচলনার জন্য বড়লাটের অধীনে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (Interim Government) গঠন করতে পারবে। এর পর ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জওহরলালকে প্রধান মন্ত্রী করে এক অস্থায়ী অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হোলো। ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদ ও সংবিধান সভার অধিবেশন বসল দিল্লীতে। এদিকে মুসলিম লীগ সন্তুষ্ট ছিল না তার উপর আবার আগের জুলাই-এর নির্বাচনে কংগ্রেস দল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবকে পুরোপুরি সমর্থন না করলেও নেহেরু মন্ত্রীসভায় মুসলিম লীগ যোগ দিয়েছিল কিন্তু পরে সমর্থন প্রত্যাহার করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগস্ট মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন স্থির করল, এই দিনই কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়ে গেল এবং তারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল নোয়াখালি, বিহার, বোম্বাই এবং অন্যান্য অঞ্চলে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বীভৎস আকার ধারণ করল। গান্ধীজী দ্রুতগতিতে দেশের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে গিয়ে সাম্প্রদায়িক হিংসাকে প্রশমিত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি বার বার বলেছিলেন 'Vivi section

of India is a sin' বা 'India could only be partitioned over my dead body alone.' কিন্তু তার আপ্রাণ চেষ্টাকে ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারেনি তৎকালীন নেতৃবর্গ। তাই আচার্য কৃপালনী পরে বলেছিলেন—

"Mahatma was saying that he was solving the problem of Hindu-Mushlim unity for the whole of India in Bihar. It might be but it was difficult to see how that was being done. There was no definite steps in non-violent, non-co-operation that led to his desired goal."

[মহাত্মা বলছেন সারা ভাবতেব জন্য বিহারে হিন্দু-মুসলমান ঐ স্থাপনের সমস্যাব সমাধানে তিনি চেষ্টা করছেন, কিন্তু কি উপাযে সেটা হবে তা জানা কষ্টকর। আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি।]

গান্ধীজীর মানসপুত্র জওহরলালও পরে স্বীকার করেছেন—

"....he might be hopelessly in the wrong in many matters. What after all he was aiming at? Inspite of the closest association with him for many years, I am not clear in my own mind about his objectives. He is an extraordinary Paradox....."

[...তিনি হয়তো শোচনীয় ভাবে ভুল করছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁব লক্ষ্য কি? তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গতা সত্বেও তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি এখনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারিনি। তিনি অসাধারণ বৈপরীত্যে ভরা।]

দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর মতামতকে কেউই গ্রাহ্য করল না। নিজের জীবনের এই শোচনীয় পরিণামের কথা তিনি বুঝেছিলেন বলেই নোয়াখালিতে জীবন সিংহকে বলেছিলেন, 'আমার তপস্যা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।'

আপাতপ্রাপ্তির নেশায় তৎকালীন নেতাদের অনেকেই বুঝতে পারেন নি দেশ বিভাগের শোচনীয় পরিণামের কথা। বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করার দাবী তাই অনেকের সমর্থন পেতে লাগল। মার্চ মাসে (১৯৪৭) মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন। ৩রা জুন তিনি দেশবিভাগের এক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাব আনলেন। লীগ, কংগ্রেস ও শিখগণ এই প্রস্তাবকে সমর্থন করল। ফলে জাতীয় পরিষদে মাত্র ১৫৭ জনের ভোটে কংগ্রেস ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। চাপে পড়ে বাধ্য হয়েই গান্ধীজী এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে জানালেন 'সংগ্রাম করার ঝুঁকি নিতে আর তাঁরা পারবেন না।' তাঁর উপস্থিতিতে এবং আবেদনেই ৩রা জুনের ঐ পরিকল্পনা গৃহীত হোলো। কিরূপ চাপে পড়ে তাঁকে এতে সম্মত হ'তে হয়েছিল তা তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়—
"Today I find myself all alone. Even the Sardar, and Jawharlal think that my reading of the situation is wrong and peace is sure to return if partition is agreed upon..."

আর একজন দেশপ্রেমিক নেতা দেশবিভাগ সম্বন্ধে সকলকে সাবধান করে দিয়েছিলেন অনেক আগেই; কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে তিনি তখন দূরে—বহুদূরে! তিনি নেতাজী। তাঁর ভাষায়—

"I have no doubt that if India is divided, she will be ruined, I vehemently oppose the Pakistan scheme for the vivi section of our motherland, our devine motherland shall not be cut up..."

[...আমার কোন সন্দেহ নাই যে ভারত বিভক্ত হলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। পাকিস্তান পরিকল্পনার আমি ঘোর বিরোধী। আমাদের মাতৃভূমি, পবিত্র মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করা চলবে না।]

আর গান্ধীজী তো তখন পটের ঠাকুর, তাই বলেছিলেন—

"Everybody is eager to garland my photo and salute and not to follow me..."

একথা বুঝতেন বলেই শেষ জীবনে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন, এমনকি চার আনার সদস্যপদ পর্যন্তও এবং মৃত্যুর ঠিক পূর্বে কংগ্রেসের ন্যায় রাজনৈতিক দলের অবলুপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

যাই হোক বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের দলিল প্রস্তুত করলেন এবং এক সীমান্ত কমিশন দেশকে দুই ভাগে ভাগ করে দিল।

অবশেষে জুলাই মাসে (১৯৪৭খ্রীঃ) বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ করল (The Indian Independence Act July 1947)। এই আইনের বলে ১৫ই অগস্ট হতে দ্বিধা-বিভক্ত ভারত স্বাধীন হোলো, মুসলমান প্রধান এলাকাগুলি নিয়ে জন্ম নিল পাকিস্তান।

অবশ্য বাংলা দেশকে ভাগ করার ইচ্ছা লীগ ও লীগের নেতাদের অনেকেরই ছিল না (১৩ই ভাদ্র, ১৩৭৮ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় বাসুদেব সেনগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

১৪ই অগস্ট মধ্যরাত্রে দিল্লীর লালকেল্লা থেকে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামিয়ে নিলেন আর সেখানে আমাদের জওহরলাল তুলে দিলেন ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। যে স্বাধীনতার ধ্বজা একদিন বিপ্লবীরা উড়িয়ে দিয়েছিলেন মেদিনীপুরে —'সেই স্বাধীনতার ধ্বজা উড়তে লাগল দিল্লীর লাল কেল্লায়' স্বাধীন ভারতের প্রতীকরূপে। দুঃসহ আঁধার রাতের অবসান হোলো। কারাগারের অন্ধকারে যে সব দেশসেবক প্রহরের পর প্রহর মুক্তির দিন গুণে যাচ্ছিলেন তাঁদেরও প্রহর গণনার শেষ হোলো। সফল হোলো মেদিনীপুরবাসিগণের অক্লান্ত বিপ্লব, শত

শহীদের আত্মোৎসর্গের আকুলতা, অবসান হোলো বৃটিশ শাসন ও শোষণের নিষ্ঠুর ইতিহাসের…। অবশেষে এল ১৫ই অগস্টের সেই চির প্রতীক্ষার দিনটি। শতশত দেশবাসীর এত কষ্টের, এত প্রাণের, এত রক্তের বিনিময়ে এল স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার জন্য শহীদদের সংগ্রাম শেষ হয়েছে, কিন্তু দেশবাসীর সংগ্রামের কি শেষ আছে? শতশত মহাপ্রাণ ও রক্তস্রোতের বিনিময়ে তাঁরা আমাদের জন্য এনেছেন স্বাধীনতা, সেই সঙ্গে রেখে গেছেন বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা। দুঃখ দুর্দশাপীড়িত দেশ বাসীর সমস্যাময় আধুনিক জীবনে স্বাধীনতার বিকৃতরূপ ও ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক নগ্ন অসন্তোষ দেখে তাঁদের বিদেহী আত্মা-হয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলবে কোন স্বর্গ লোক থেকে! স্বাধীন দেশেব আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে যে সংগ্রাম তার কি কোনদিন শেষ আছে। অন্নবস্ত্র, জীবিকা, শিক্ষা আর শুধুমাত্র 'বাঁচার' মত বাঁচবার জন্য তাই আজও লড়তে হচ্ছে, লড়তে হচ্ছে ভাষা কৃষ্টি-সংক্রান্ত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। আগ্রাসী বিদেশীর লোলুপ দৃষ্টি থেকে দেশ আর দশকে বাঁচাবার জন্য অবিবত চলছে প্রাণপণ লড়াই। অনাগত যুগের কোন ঐতিহাসিক হয়ত আবার লেখনী ধরবে জীবনযুদ্ধের এই সব অমর শহীদদেব কীর্তিকাহিনীকে অমর করে রাখতে—নাম না জানা সেই সব নেতাদের সংগ্রামের কথা উৎকীর্ণ থাকবে কালের ইতিহাস পটে। সকল সমস্যা ও সকল দুর্যোগ কাটিয়ে স্বাধীন 'ভারত আবার জগত সভায়' শ্রেষ্ঠ আসন লাভের পথে এগিয়ে যাবে ধীরে ধীরে। আমাদের এই জীবন সংগ্রামের শেষ পরিণতির শুভ ইঙ্গিত হয়ত আছে অদূরেই….। সেদিনের জন্য আসুন আমরা আমাদের প্রস্তুত করি—প্রস্তুত করি উত্তর সূরীদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে….। দেশের জন্য সবাইকে প্রস্তুত করার এই 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক….।'

"কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙ্গা
বন্দীশালা ঐ শিকল ভাঙ্গা।
তাবা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে
কত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে
ঐ মুক্তির মন্দিব সোপান তলে
কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে…।

ঘটনাপঞ্জী

।। প্রাচীন ও মধ্যযুগ ।।

প্রাচীন ও নব্য প্রস্তরযুগ ও তাম্রযুগে জনপদের অস্তিত্ব।

মহাকাব্যের যুগে—মহাভারতের অনেক স্থানে মেদিনীপুরের কয়েকটি অঞ্চলের উল্লেখ।

তৎপরবর্তী প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাম্রলিপ্ত ও অন্যান্য স্থানের বর্ণনাদি।

খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী—কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মেদিনীপুর অঞ্চলে আগমন ও বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতি। ফা-হিয়েন, বোধিধর্ম প্রভৃতি কয়েক জন চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ।

সপ্তম শতাব্দী—গৌড়রাজ শশাংক কর্তৃক এতদঞ্চলের কিয়দংশ অধিকার।

অষ্টম-নবম শতাব্দী—কয়েকটি প্রাচীন জনপদের সৃষ্টি।

দশম শতাব্দী—দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে জৈন ধর্ম প্রচার প্রসংগ। পাল ও সেন যুগে এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানের উল্লেখ।

একাদশ শতাব্দী—মাহিষ্য রাজক্ষমতা বিস্তার।

দ্বাদশ শতাব্দী—কাঞ্চীরাজ রাজেন্দ্র চোলের অধিকার বিস্তৃতি।

ত্রয়োদশ শতাব্দী—রাজনৈতিক অস্থিরতা, নানাস্থানে বিভিন্ন শক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

চতুর্দশ শতাব্দী—বগড়ীর রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে কিছু রাজ্যের পত্তন।

পঞ্চদশ শতাব্দী—শীলদার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। মঙ্গলকাব্য রচনার যুগেও মেদিনীপুরের নানা অঞ্চলের খ্যাতি। মোগল অধিকার বিস্তার।

ষোড়শ শতাব্দী—ঝাড়গ্রাম ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে সংহত রাজ্য প্রতিষ্ঠা। কয়েকটি বাণিজ্য কুঠী স্থাপন।

সপ্তদশ শতাব্দী—বরদারাজ শোভাসিংহের উত্থান, মারাঠা প্রভাব বিস্তার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসার। আঞ্চলিক জমিদারশ্রেণীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। মারাঠা শক্তির উপদ্রব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ—সিরাজের মেদিনীপুরে আগমন। আলিবর্দীর সঙ্গে মারাঠা সন্ধি। ফরাসী শক্তির সাহায্য লাভ। বর্গী হাঙ্গামা। পলাশীর যুদ্ধের পটভূমিকা।

(বৃটিশ যুগ)

১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৬০—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মালিকানায় মেদিনীপুর, খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত জনস্টন।

১৭৬৭—ঘাটশীলার সংঘর্ষ।

১৭৬৮—জামবনী ও হলুদপুকুর সংঘর্ষ।

১৭৬৯—দুর্ভিক্ষ।

১৭৭০—বঙ্গ সিং ও লাল সিং ধৃত।

১৭৭২—ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী বগড়ীর শেষ স্বাধীন রাজা যাদব সিংহের মৃত্যু।

১৭৮১—কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক ফৌজদারী প্রথা লোপ।

১৭৮৩—দশশালা বন্দোবস্ত।

১৭৮৯—ক্ষীরপাই-এ রেসিডেণ্ট নিযুক্তি (রবার্ট গসলিং)।

১৭৯২—বিনানুমতিতে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ। রাধানগরে রেসিডেণ্ট এণ্ড্রু সিটন।

১৭৯৩—পাইকদের জমি বাজেয়াপ্ত।

১৭৯৪—পাইক (চুয়াড়) বিদ্রোহ।

১৭৯৭—বগড়ী নিলাম।

১৭৯৮—আনন্দপুর ও অন্যান্য সংঘর্ষ (বলরামপুর, ফুলমপুর, শালবনী, রাইপুর প্রভৃতি)।

১৭৯৯—বিদ্রোহের প্রসার, মলঙ্গীদের বিভিন্ন অভিযোগ দাখিল।

১৮০০—বিদ্রোহ প্রশমিত, জেলার উত্তরাংশ বর্ধমান থেকে মেদিনীপুর জেলাভুক্তি।

১৮০২—খেজুরিতে প্রথম ডাকঘর স্থাপন।

১৮০৩—মারাঠা অধিকৃত পটাশপুর কোম্পানীর দখলে।

১৮০৪—মলঙ্গীদের বিক্ষোভ।

১৮০৬—অচল সিংহের নেতৃত্বে নায়ক বা লায়েক বিদ্রোহ।

১৮১২—বিদ্রোহের নেতা যুগল ও কিশোরের ফাঁসি।

১৮১৫—বগড়ী অভিযান।

১৮১৭—বগড়ীর ছত্র সিংহ বন্দী।

১৮২৩—নেতা বিশ্বনাথ হত্যা, ছত্র সিংহের শর্তাধীনে মুক্তি, প্রথম প্রেস আইন।

১৮২৫—ছত্র সিংহের মৃত্যু।

১৮২৮—পাইকদের তালিকাভুক্তি।

১৮৩০—জমিদারদের প্রতিজ্ঞাপত্র দাখিল।

১৮৩১—কৃষক ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

১৮৩৩—জঙ্গলমহলের কতকাংশ নিয়ে মানভূম ও সিংভূম জেলা গঠন।

১৮৩৫—মেদিনীপুরে হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা।

১৮৩৭—জমিদারদের ধর্মঘট।

১৮৫১—রাজনারায়ণ বসুর মেদিনীপুরে আগমন। খেজুরীতে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন।

১৮৫২—খালাসীদের বিদ্রোহ।

১৮৫৪—সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ, ফস্টারের চেষ্টায় মেদিনীপুর অনেকটা শান্ত।

১৮৭২—প্রথম আদমসুমারি।

১৮৭৮—ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট।

১৯০১—মেদিনীপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন।

১৯০৫—জেলা শহরে চারিটি বিপ্লবী সমিতির কেন্দ্র স্থাপন।

১৯০৬—মেদিনীপুর শহরে মাঘোৎসবের মেলা।

১৯১৯—গান্ধীজীর মেদিনীপুর ভ্রমণ।

১৯২০—বীরেন্দ্র শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলন।

১৯২১—প্রিন্স অব ওয়েলস্ এর আগমন দিনে সারা জেলায় হরতাল।

১৯২৫—গান্ধীজীর দ্বিতীয় বার মেদিনীপুর ভ্রমণ।

১৯২৮—টাউন স্কুলের সভা পুলিশ কর্তৃক ভঙ্গ, যুবসংঘ প্রতিষ্ঠা, দীনেশের আগমন। বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের শাখা গঠন।

১৯২৯—সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে বিরাট সম্মেলন।

১৯৩০—নাড়াজোলের বিরাট জনসভায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতা দিবস পালন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। জেলা, মহকুমা ও থানা যুদ্ধ সমিতি গঠন। চেচুয়া হাটে দারোগা হত্যা, চেচুয়া ও ক্ষীরাই-এ গুলি চালনা।

১৯৩১—ম্যাজিস্ট্রেট প্যাডি হত্যা, হিজলী বন্দীশালার হত্যাকাণ্ড।

১৯৩২—চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন। ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস হত্যা।

১৯৩৩—প্রদ্যোতের ফাঁসি, ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যা।

১৯৩৪—নির্মল, ব্রজকিশোর ও রামকৃষ্ণের ফাঁসি।

১৯৩৯—সমুদ্র উপকূলাঞ্চলকে বিপজ্জনক ঘোষণা।

১৯৪২—অগস্ট বিপ্লব, বিভিন্ন থানা আক্রমণ। মাতঙ্গিনীর আত্মত্যাগ। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৭—স্বাধীনতা লাভ।

—o—

যাঁদের কাছে ঋণী

Chuar Rebellion—*W. Price*
Memorandum of Midnapore—*W. Price*
Notes on the History of Midnapore—*W. Price*
History of Midnapore—*Mr. Belley*
Early History of Midnapore—*Mr. Hunter*
History of Bengal—*Mr. Stewart*
Hindusthan—*Mr. Hamilton*
India Struggles for Freedom—*H. N. Mukherjee*
India to-day—*R. P. Dutta*
Archological Report of the District of Midnapore
—*H. L. Harrison.* (Report No. 207, 20. 8. 1873)
History of Midnapore (Vol. I & II)—*N. N. Das*
শালফুল—প্রবোধচন্দ্র সরকার
মেদিনীপুরের ইতিহাস—ত্রৈলক্যনাথ পাল
বকদ্বীপ—মতিলাল বিশ্বাস
সিরাজদ্দৌল্লা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
বাংলা দেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার
শহীদ প্রদ্যোৎকুমার—ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র
মেদিনীপুর কাহিনী—প্রবোধকুমার ভৌমিক
মেদিনীপুরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি— " "
নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত—অধরচন্দ্র ঘটক
সমসাময়িক নারায়ণগড—কেদারনাথ পাহাড়ী
অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম—অনন্ত সিংহ
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস—সুকুমার রায়
অগ্নিদিনের কথা—সতীশ পাকড়াশী
বিপ্লবী মেদিনীপুর—বিনয়জীবন ঘোষ
স্বদেশের কথা—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শারদীয়া মেদিনীপুর পত্রিকা—১৩৬২
মাসিক বসুমতী—বিভিন্ন সংখ্যা
মাসিক প্রবাসী—বিভিন্ন সংখ্যা
আনন্দবাজার পত্রিকা—বিভিন্ন দিনের
তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয় পত্রিকা—১৯৫১
মেদিনীবাণী পত্রিকা—বিভিন্ন সংখ্যা।

॥ পরিশিষ্ট—এক ॥

নারায়ণগড়-লাটের স্পেশালে অগ্ন্যুৎপাতের আয়োজন

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

৬ই ডিসেম্বর ১৯০৭ সাল। সন্ধ্যার অন্ধকার। সবেমাত্র বিহঙ্গক জনমুখর ধরিত্রীর বুকে ঘনাইয়া আসিতেছে। উষা ও সন্ধ্যা—উদয় ও অস্তকালে দিবা ও রাত্রের সংযোগস্থল—এক প্রাণ-মন উদাস করা মোহময় সন্ধিক্ষণ। পূর্ব পাণ্ডুর আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ ম্লান আলোর মায়ায় পথঘাট, বন-বাদাড়, উচ্চ রেল লাইন ঢাকিয়া আনিতেছে। নিজ নিজ ক্ষুদ্র চিন্তায় সদা ব্যতিব্যস্ত ছন্নছাড়া মানুষের সেদিকে লক্ষ্য নাই। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ, ধরিত্রীর শ্যামল রস-হরিত বক্ষস্থল, সে সকল জুড়িয়া বিশাল বিপুলের নিঃশব্দ আয়োজন ও সমারোহ চাহিয়া চাহিয়া দেখিবার কয়জনের আছে অবসর? সেই ঐতিহাসিক উজ্জ্বল দীপ্ত যুগ-সন্ধিক্ষণটিতে রেলপথ বাহিয়া অলস মন্থরগতিতে নারায়ণগড়ের অভিমুখে গতিশীল তিনটি মানুষের সে সান্ধ্য শোভা দেখিবার অবসর ছিল না। তাহারা নূতন জীবন্ত অগ্নিমুখ ভারতের ইতিহাস রচনায় ছিল ব্যস্ত। তাহাদের যুবসুলভ উদ্দাম বে-হিসাবী গতিবিধিতে যে এক নূতন ভারতের ইতিহাস রচিত হইতেছে তাহার সুস্পষ্ট জ্ঞান এই তিনটি মানুষের ছিল না। প্রাণের কি এক আবেগে দেশমাতার বন্ধন মুক্তির প্রেরণায় তাহারা চলিতেছে এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটাইতে।

মেদিনীপুরের নারায়ণগড়? খড়্গপুর রেল স্টেশনটির পরে ঐ নারায়ণগড় ছিল এই ত্রিমূর্তির লক্ষ্য। এর কিছু আগে কলিকাতা হইতে আগত এক আপ ট্রেনে এই অপরিচিত তিন মূর্তি আসিয়া বালতী বোঁচকা কাঁধে খড়্গপুর জংশনে নামিয়াছে। কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত স্টেশনের বাহিরে

---

* দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সৌজন্যে। রবিবাসরীয় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বাংলা ১৩৬৫। ইংরাজী ৮ই জুন ১৯৫৮ তারিখে প্রকাশিত।

রেল লাইন হইতে অদূরে এক গাছের তলায় খবরের কাগজ পাতিয়া তাহারা পুরী, তরকারী মিষ্টান্নের সদ্‌গতি করিতেছে। তখন সবেমাত্র ঘনায়মান সন্ধ্যা। তাহাদের কাজ নিশীথ রাত্রের গভীর অন্ধকারে। কাজেই এখন সবেমাত্র সন্ধ্যা বলিয়া কোন তাড়া নাই; বোঁচকা, বালতী, লাঠি, শাবল, খন্তা হাতে তাহারা নিম্নস্বরে আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল নারায়ণগড় অভিমুখে। একজন রোগা ছিপছিপে, বয়স সাতাশ বৎসর, মাথায় বাবরী চুল, পায়ে সাদা কটকী নাগরা, চোখে চশমা। সে চলিয়াছে আগাইয়া, চাপা গলায় কথা বলিতে বলিতে পথ দেখাইয়া।

দ্বিতীয় মূর্তি বেঁটে, গৌরবর্ণ, ১৭।১৮ বৎসর বয়স, নাম নিরাপদ রায়, মৌন মানুষটি, বেশি কথা বলে না, নির্বাক মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসি লাগিয়াই আছে। কাঁধে করিয়া সে লইয়া যাইতেছে র‍্যাপারে জড়ানো ঢাকা একটি বড় ড্রাম।

তৃতীয় যুবকটির কিশোর বয়স, শ্যামবর্ণ, বলিষ্ঠ, হাসি হাসি মুখ, কেমন যেন আধো আধো ভাষায় কথা বলে। বাঁকুড়ায় বাড়ী, নাম বিভূতি সরকার। তাহার হাতে ছিল চটের থলে, পুঁটলী, একটা বেশ বড় লম্বা টর্চ, একটি ছোট দূরবীণ। চাপা গলায় অনুচ্চ স্বরে কথা বলিতে বলিতে ইহারা উচ্চ রেল লাইন ধরিয়া চলিতেছে নারায়ণগড়ের দিকে। রেল লাইন কোথাও উচ্চ হইয়া ক্রমশঃ নামিয়া ঢালু হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝাউ, খেজুর, তুঁত কত অজানা গাছের মেলা, কাঁটা গাছের ঝোপ, শুষ্ক খাদ, ঝরণা লালমাটির খানা গর্ত। কোথায়ও কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি কয়েকটি মাটির ঘর, আশেপাশে ছাগল চরিতেছে, দাওয়ায় কুকুর ঘুমাইতেছে, উলঙ্গ কৃষ্ণকায় ধূলি-মলিন শিশুর দল কৌতূহলী হইয়া এই তিনজন পথিকের দিকে চাহিয়া আছে।

চলিতে চলিতে শ্যামায়মান সন্ধ্যা ঘনাইয়া নিশায় গা ঢাকা দিল। পথিকত্রয়ের আকার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিতে পরিণত হইল। আকাশের মলিন অঙ্গনে জোনাকীর ন্যায় অসংখ্য তারা জ্বলিতে লাগিল। প্রায় এমনিভাবে কয়েক ঘণ্টার পথ অতিবাহিত হইলে যেখানে রেল লাইন ত্রিতল অট্টালিকার মত উচ্চ হইয়া একটি পার্বত্য ঝরণার উপর নির্মিত সেতুর মুখে খাড়া হইয়া মিলিয়াছে সেইখানে এই ত্রিমূর্তি থামিল। কাঁধের ঝোলা বালতী শাবল টর্চ নামাইয়া পার্শ্বে ঢালু ঝোপের মাঝে লুকাইয়া রাখিল। তিনজন একবার

সমস্ত স্থানটা ঘুরিয়া পরীক্ষা করিল। তাহার পর চশমাধারী ছিপছিপে নাগরাধারী লোকটি রেল লাইনের উপর সেতুর মুখে সতর্ক পাহারায় রহিল এবং অন্য দুইজন সঙ্গী সেই রেল লাইনের পাথর সরাইয়া রেলের তলায় গর্ত খুঁড়িতে লাগিয়া গেল। তাহাদের খনন কৌশল অভিনব, খননের সঞ্চিত মাটি তাহারা ওখানে রাখে না, দূরে ঝরণার মাঝে বহিয়া লইয়া ফেলিয়া আসে। রেল লাইন ধরিয়া দু-চারজন রেলের কুলি গ্রামের পথিক ভজন গাহিতে গাহিতে আসিয়া পড়িলে তিনজনই ঝোপে-ঝাড়ে গা ঢাকা দেয়, অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার মানুষ-জন চলিয়া গেলে স্বস্থানে আসিয়া স্বকার্যে নিযুক্ত হয়। তখন লাইনের নীচের খনিত গর্তটি কৌশলে একটি তক্তার ঢাকা অবস্থায় মাটির ঢেলার নীচে আত্মগোপন করে।

দূরে কোথায় কুকুর ডাকছে, শুষ্ক ধানের ক্ষেত্রে অড়হরের বনে শিয়াল দল বাঁধিয়া মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে। কোমর প্রমাণ গর্ত কাটা হইলে তাহাবা দু'জন ভারী ড্রামটি সন্তর্পণে তাহাতে নামাইয়া দিল, নামাইয়া তক্তায় মাটির স্তূপে ও পাথরের নুড়িতে স্থানটি রেল লাইনের সহিত মিশ খাওয়াইয়া লইল। কোন আগন্তুক বা রেল কুলি কিংবা ট্রলি বাহিত পরিদর্শক সে পথে আসিলেও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নজর দিয়াও বুঝিতে পারিবে না যে, সেখানকার রেলপথে কোন বিপজ্জনক বস্তু ট্রেন ধ্বংসের উদ্দেশ্যে লুকানো বা প্রোথিত আছে। তখন রাত মাত্র দশটা, আরও দুই ঘণ্টা পরে এই পথে আশিজন উচ্চপদস্থ শাসক দলসহ বাংলার ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার সাহেবকে লইয়া স্পেশাল ট্রেনটি যাইবে। যাহারা এইসব প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ বিপ্লবী অগ্নি-শিশুদের সরবরাহ করিত তাহার মধ্যে ছিল খুরদা রোডের কবি মণি; সেদিনও সে বহুকাল পরে তাহার বর্তমান ঠিকানা হইতে সাড়া দিয়া পত্র দিয়াছে। মণি এখনও রেলের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অফিসার। আমাদের ভারত সরকার ও রেল সচিব এই অগ্নিযুগের গুপ্ত নির্লোভ কর্মীকে ও দেশসেবককে উপযুক্ত পদোন্নতির দ্বারা পুরস্কৃত করুন। মণির ন্যায় দু'চার জন তার ও রেল বিভাগে ছিল, তাহারা ছিল দুর্বার ধ্বংসের কাজে ও বৃটিশ শাসক বধের যজ্ঞের উদ্যোগে আমাদের গোপন সতর্ক চক্ষু। মণি গাঙ্গুলীর শেষ চিঠি সরদার শঙ্কর রোড হইতে লিখিত চিঠি যথাস্থানে উদ্ধৃত করিব।

আমরা তিনজনে যখন নিস্তব্ধ রেল লাইনের ছোট সেতুটির মুখে দশ পাউণ্ড

ডিনামাইটপূর্ণ ল্যাণ্ডমাইনটি ভূগর্ভে কোমর প্রমাণ মাটির নীচে পুঁতিয়া ঘর্মাক্ত দেহে নিশ্বাস লইতেছিলাম তখন ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বরের সেই স্মরণীয় দিনটির রাত্রি যাহা সুপ্ত পরাধীন ভারতের স্নায়ুতে স্নায়ুতে জলন্ত অগ্নিধারার ন্যায়—নিস্তব্ধ রণাঙ্গনে সহসা উত্থিত তূর্য নিনাদের ন্যায় এই অভাবনীয় অভূতপূর্ব সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেল যে, ভারত ও বিপ্লবী বাংলা জাগিয়াছে, আর সে তামস নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িবে না। আমি বার বার আসিয়া নারায়ণগড় স্টেশনে ছোটলাটের স্পেশালটির ও তাহার ঠিক পূর্ববর্তী কলিকাতা যাত্রার ডাউন ট্রেনটির সন্ধান লইতেছিলাম। স্থির হইল ঐ ল্যাণ্ডমাইনের উপর দিয়া আমি ঠিক পূর্ববর্তী ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিব, বিভূতি সরকার ও নিরাপদ রায় স্পেশাল আসিবার পূর্বক্ষণে বারুদের পলতেটি লাইনের উপর তুলিয়া ল্যাণ্ডমাইনের সহিত যোগ করিয়া দিবে। তাহার পর দু'জনে ছুটিয়া দূরে গাছ-পালার মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়া ভীম নিনাদে সেই বিস্ফোরণ দেখিবে এবং তাহার পর মাঠ-ঘাট, ধান-ক্ষেত দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইবে।

মানুষ পরিকল্পনা করে, বিধাতা তাহার পরিণতি সাজায়—Man proposes, God disposes! এ ক্ষেত্রে ঘটিল তাহাই! যথাসময়ে স্পেশাল সশব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল। আমি তাহার পূর্বের ডাউন ট্রেনে অকুস্থল দিয়া চলিয়া গিয়াছি; গাছ-পালার ঝোপে দাঁড়াইয়া বিভূতি ও নিরাপদ রুমাল নাড়িয়া All O.K. সঙ্কেত দিয়াছে। আমাদের আশা ও পরিকল্পনা ছিল যে, মাইনটি ট্রেনের মাঝামাঝি ফাটিয়া যাত্রীসহ সমস্ত স্পেশালটিকে লাইনচ্যুত করিয়া নদী * গর্ভে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে সাহায্য করিবে। আমরা পিক্রিক বিস্ফোরক না ব্যবহার করিয়া দশ পাউণ্ড ডাইনামাইটে ল্যাণ্ডমাইনটি প্রস্তুত করিয়া ভুল করিলাম। ডাইনামাইট বিস্ফোরিত দ্রবকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে না, মাটির তলের দিকে হয় তাহার গতি। ল্যাণ্ডমাইনটি তীব্র চোখ-ধাঁধানো জ্যোতি সহ দশ দিক কাঁপাইয়া ফাটিল ঠিকই, কিন্তু রেলের তলায় পাঁচ ফুট ব্যাসের পাঁচ ফুট গভীর খাত সৃষ্টি করিয়া রেল লাইনকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিল। ফলে স্পেশালটি সেই ধনুকের বাঁকে আটকাইয়া থামিয়া

* আসলে উহা নদী নহে, বিরাট খাল বিশেষ। ভহরপুর মৌজায় মুণ্ডা পাড়ায় অবস্থিত।

গেল, নদী গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল না। যদি তাহা হইত, তবে বৃটিশ বাংলার শাসককুলের আশীজন হয়তো সিংহাসন শূন্য করিয়া প্রাণ হারাইতেন ও জখম হইতেন।

বলা-বাহুল্য পত্রপাঠ দুই যুবক বন-বাদাড়, ধান-ক্ষেত, জলা, খাল-বিল ভাঙ্গিয়া মেদিনীপুর অভিমুখে ছুটিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঐ স্থান পুলিশ অফিসারে ও মিলিটারীতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বৃটিশ-পদানত বাংলার সে এক অভাবনীয় কাণ্ড! সেই ট্রেন ধ্বংস প্রয়াসের টুকরাগুলি উচ্চ মূল্যে পর দিবস স্মরণীয় পদার্থ হিসাবে ইংরাজরা ক্রয় করিয়াছিলেন। কে যে এই কাণ্ড ঘটাইল তাহার হদিশ আমরা মুরারিপুকুর বোমার মামলায় ধরা পড়া অবধি পুলিশ ও বৃটিশ সরকার পান নাই। সরকারী তাড়নার বশে পুলিশ একটি সাজানো মোকদ্দমার জোরে চৌদ্দ জন রেল কুলিকে চালান দিল, বিশ বৎসর কালাপানি সাজা দিয়া। আমি ধরা পড়ার সময় আমার স্বীকারোক্তিতে প্রমাণ করিয়া দিলাম তাহারা একেবারে নির্দোষ।

স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার ছিলেন বড় সাধু প্রকৃতির সদাশিব ন্যায়বান রাজপুরুষ। তিনি ফোনে বাংলার পুলিশকে জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় নাজেহাল করিলেন, "বারীনের কথা সত্য, না, পুলিশের কথা সত্য"? তদানীন্তন বাংলার পুলিশ হইলেন লজ্জায় হেঁটবদন, আন্দামানের উদর হইতে চৌদ্দ জন নির্দোষ কুলি মুক্তি পাইল, কোন খেসারত পাইল কিনা জানি না। গরীবের প্রাণটা বাঁচিল এই যথেষ্ট, কে তাহাদের হইয়া খেসারত আদায় করিবে? নারায়ণগড় বিপ্লবী ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল, আর একবার জীবনে প্রমাণ হইল, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" আমাকে পুলিশ এবং সি. আই. ডি. নারায়ণগড় ও চন্দননগরে টানাটানি করিয়া প্রমাণ চাহিল এই কীর্তির। আমি আরও দুই এক স্থানে অর্ধ খনিত গর্ত ও গর্তের মধ্যে প্রোথিত কাপড় ও খবরের কাগজ দেখাইয়া দিলাম। ইহার পূর্বে হেমচন্দ্র ও আমি চন্দননগরে আর একবার ট্রেন উড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহারও স্থানটি সি. আই. ডি. বিভাগ দেখিল। সেবার যে ডাইনামাইট লাট স্পেশালের নীচে ফাটিয়াছে তাহা কেহ বিন্দুবিসর্গ টের পায় নাই, নৈশ নিস্তব্ধতার বুকে সে কীর্তি অলক্ষে মিলাইয়া গিয়াছে। কারণ সেবার এত যত্নে গড়া ফালমিনেট অব মার্কারীর পলিতা ও ডিটোনেটার-যুক্ত বিরাট ল্যাণ্ড

মাইন তৈয়ারী করিয়া ট্রেন ধ্বংসের কাজে নামি নাই। শুধু একটি পার্শেলে কিছু ডিনামাইট রাখিয়া ফাটাইয়াছিলাম।

এই সব বিস্ফোরণ ও ট্রেন ধ্বংসের কাজের জন্য ডিনামাইট যোগাইত মাইকা ব্যবসায়ী শ্রীমনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের অভ্র-খনি। মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন আমাদের গুপ্তচক্রের একজন মাথা। তিনি এক সময়ে অর্থ দিয়া আমাদের দুর্গম পার্ব্বত্য পথে ডিব্রুগড ও সাইদা কেল্লার পথে বিদেশের সহিত অস্ত্রাদি সংগ্রহের পথ খুলিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। সে আয়োজন আমাদের আলিপুর বোমার মামলায় হঠাৎ সংঘটনে ব্যর্থ হইয়া গেল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় বদনামী হইয়া বাহিরে সি. আই. ডি'র কড়া নজরে পড়িয়া রহিলেন। আমরা রাজদ্রোহের বিচারে কালাপানির যাবজ্জীবন দণ্ড পাইয়া আন্দামান ও বিভিন্ন জেলে আয়ুক্ষয় করিতে চলিলাম। "না হইতে মাগো বোধন তোমার, ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট।"

আমাদের নানা ধ্বংসাত্মক কাণ্ডের শ্যেন-চক্ষু খুরদা রোডের মণি এতদিন হারাইয়া গিয়াছিল। গত সাতান্ন সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে মণি গাঙ্গুলীর পত্র পাইলাম।

Mani Ganguly
Sardar Sankar Road
Calcutta-29
9-9-57.

প্রিয় বারীন দা,

দীর্ঘদিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার চিঠি পেয়ে খুবই আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আর চিনতেই পারবেন কি-না জানি না!

খুরদা রোড ছাড়বার পর থেকেই আপনার সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তারপরে কত জায়গায় বদলী হলুম—অবশেষে কলকাতা এলুম। তাও অনেক দিন হয়ে গেল। গত কয়েক মাস থেকে আপনার কথা কেবলই মনে হচ্ছে—তাই আজ আপনাকে চিঠি লিখলুম। আপনি বিরক্ত হবেন কিনা জানি না। যদি আমাকে আজও মনে রেখে থাকেন—জবাব দেবেন। আমি ওপরের ঠিকানায় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে পেইং গেস্ট হিসাবে আছি; চিঠি দিলে খামে দেবেন—তা' না হলে চিঠি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আপনার বাড়ীর ঠিকানা জানি না। তাই বসুমতী অফিসেই চিঠি দিলুম। আপনার চিঠি পেলে আমার খবর জানাবো। আপনি ও বৌদি আমার প্রণাম নেবেন।

আপনার স্নেহের ভাই
মণি

অতীত কথার স্মারক মাত্র এই চিঠিখানির পর দু'একবার পত্র লেখালেখি হয়েছে কিন্তু আমার ঝড়ো জীবনের ঘটনার আবর্তে মণির সঙ্গে দেখাশোনা হয় নাই। ক্রমশঃ সেই ইতিহাস রচনার আবর্ত-সংকুল দীপ্ত দিনগুলির সংগীরা স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে দূরে বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে। এই এক মণি! আরও এক মণি—রংপুর হইতে যুগান্তর কাগজখানি সৃষ্টির রসদ যোগাইবার "মণি লাহিড়ী—বোমা পিস্তল হাতে সার ব্যামফিল্ড ফুলারকে তাড়া করিয়া শিলঙে ভূপাল বসুর বাসায় পিস্তলের গুলীতে আহতকারী মণি লাহিড়ী পর্যন্ত সকলেই যাইতেছে আমার জীবনের সূত্র হইতে হারাইয়া। এই সূত্রে মণি গনা হইব" কত উজ্জ্বল মণি মুক্তাই না আজ পর্যন্ত আসিল গেল, সাহিত্যিক পরিচ্ছেদে, রাজনীতিক পর্যায়ে পারমার্থিক যোগ সাধনার খণ্ডে আমার বিচিত্র জীবনটিকে সমৃদ্ধ ও মনোজ্ঞ মধুর করিয়া চলিয়া গেল। এই শেষ পর্যায়ে অতীন্দ্রিয় শক্তি জ্ঞান আনন্দের রহস্যময় পর্যায়ে এখনও এই জীবন প্রাঙ্গণে তাহারা আনাগোনা এবং চিত্তাকর্ষক অভিনয় করিয়া চলিতেছে—দেশ ও জাতি গঠনের অমূল্য উপাদানরূপে। বাস্তব জীবনের রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত এই চিত্রমালা ভবিষ্যতের জন্য গুছাইয়া রাখিবার কখনও কখনও সাধ যায় কিন্তু তরঙ্গসংকুল আবর্তের ঘাত-প্রতিঘাতে সে সুযোগ আসিয়া আসিয়া চলিয়া যায় অবিচ্ছিন্ন অবসর মিলে না সেগুলি স্মৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া মণিহার রচনার। আজ বসুমতীর কাজ হইতে ছুটির সুযোগে খুরদা রোডের কবি ও আমাদের সন্ত্রাসবাদী দিনের সন্ধানী মণির কথা একটি চিত্রে আঁকিয়া রাখিলাম। এখনও বহু আবর্ত ও ঝড় ঝঞ্ঝার কুটিল আবর্তে এই দীর্ণ-বিদীর্ণ মাতৃভূমি আমাদের উঠিবে পড়িবে···ভরিবে জাগিবে বিশ্ব মহারাষ্ট্র রচনার উপকরণ যোগাইবে এবং কত না নব নব যুগ পাল্টাইতে সহায়তা করিবে। দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ, অরবিন্দ বিরচিত বিশ্বের সৃষ্টির কখনও

সম্ভব হইবে না। অগণ্য সাধকের জলন্ত ধুনীও যোগাসনে বেষ্টিত হইয়া জলিতেছে এই মহা যজ্ঞকুণ্ডে—কি নূতন বিশ্বরচনার উদ্দেশ্যে কে জানে।

মানুষের স্মৃতির সূত্র এক চন্দ্রলোকের চরকা-কাটুনী বুড়ীর খাম-খেয়ালী রচনা! স্মৃতির ঠাকুর প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই কালের খরস্রোতে ভাসাইয়া দেয় আমরা অপ্রয়োজনীয় অনেক খুঁটিনাটি ঝুড়ির মধ্যে সঞ্চয় করিয়া কুড়াইয়া রাখি। নারায়ণগড়ের পথে যাত্রায় সেই দিন-রাত্রিটির কত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন স্মৃতির রঙিন টুকরা এখনও অন্তত স্মৃতিপটে জলজল করিতেছে। ভুলি নাই খড়্গপুরের মাঠে গাছের তলায় বসিয়া পুরী, তরকারী, হালুয়া খাওয়ার সেই কাগজ ও শালপাতার স্মৃতি, ভুলি নাই সন্ধ্যার ধূসর আবেশে ও নিশার গাছপালা ঢাকা রেল লাইনে উদ্বিগ্ন ব্যগ্র দৃষ্টির মুহুর্মুহু সঞ্চালন, ভুলি নাই তুইটি তরুণ সঙ্গীর মধুর সাহচর্য ও মৃত্যু তুচ্ছ করা ঐকান্তিক সহযোগিতা। কল্পনা ও মানস-পূজার দেশমাতা বঙ্গ-জননীর বাস্তবতা ছিল এই সব অন্তরঙ্গ তরুণ সাথী ও সক্রিয় আত্মবিসর্জনের মুহূর্তগুলির সঞ্চয়ে।

বহুদিন—পঞ্চাশ বৎসরের অধিক পার হইয়া গিয়াছে কালচক্র, তথাপি অপূর্ব অরুণিমায় রাঙা করিয়া রাখিয়াছে ইতিহাস ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির অতীতের অস্তাচল কি এক মনোমুগ্ধকর বর্ণচ্ছটা ও গরিমায়। নূতন এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ আসিতেছে যাইতেছে জীবনের রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইতেছে তথাপি সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া আছে সেই কালের অস্তাচল চূড়ায়। অনন্ত বিহঙ্গমের মুগ্ধ কাকলী থামিতেছে না সেই বর্ণসুলভ অস্তাচল চূড়া ঘিরিয়া। যতদিন কালচক্রের আবর্তনে মানুষ আসিবে যাইবে অন্তত নিরন্তর ধারায় ততদিন জাগিয়া থাকিবে মানব ইতিহাস ও কৃষ্টির এই বর্ণগরিমা। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, প্রতাপাদিত্য, পৃথ্বীরাজ মুছিয়া গিয়াছে আজ নশ্বর জীবনের যবনিকা হইতে—তথাপি গৌতমের ত্যাগ, শঙ্করের ক্ষণজন্মা জীবনের ভারত বিজয়ী জ্ঞানচ্ছটা, চৈতন্যের অপরাজয়ী প্রেম, রাজপুতনার অসির ঝলক ও মৃত্যুঞ্জয়ী নারীর জহরব্রত আজও যুদ্ধ করিয়া রাখিয়া নূতন বঙ্গে ও ভারতের জীবনের চক্রে গতি যোগাইতেছে, জন্ম দিয়া, হাতছানি দিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে আত্মত্যাগের ও মানব দিগ্বিজয়ের নব নব অফুরন্ত অভিজাত আজ লজ্জিত জীর্ণ তুর্নীতি-লিপ্ত বংগে ও এই তুস্তর কলঙ্কসাগরে পড়িয়াও মরিয়া তুরাশা-দগ্ধ মানুষ—বাঙালী চাহিয়া আছে ঐ অস্তাচল চূড়ারই দ্রুত বিলীয়মান রক্তিমতার

দিকে। এ কি শুধু দুরাশা, না অফুরন্ত কালজয়ী মানব অভিযানের অমর আহ্বান? ইহা যদি মরে তবে থাকিবে কি?

এই ছোট লাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি সে সময়ে দর্পান্ধ ইংরাজ শাসকের মধ্যে দুর্লভ ছিলেন। তথাপি তাঁহার বধের আদেশ শ্রীঅরবিন্দ প্রতিম 'বিগ জি' দিয়াছিলেন। রাজপুরুষদিগের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ তাহা বিচার করিয়া চলিবার কাজ আমাদের ছিল না। আমরা বৃটিশ শাসকের উচ্চাসনগুলি পারিলে নিঃশেষে শূন্য করিবার কাজে লাগিয়াছিলাম ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নীতি হিসাবে। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ, সুতরাং লঙ্কাপুরীকে রাবণ শূন্য করিতে হইবে। বিদেশীর শাসন সুশাসন হইলেও নিন্দনীয় ও বর্জনীয়, স্বদেশী শাসন কুশাসন ও দুর্নীতিপূর্ণ হইলেও তাহাই শ্রেয় এই ছিল সে যুগে আমাদের মুক্তি-যোদ্ধাদের নীতি। আজ দুর্নীতিপূর্ণ বলিয়া কংগ্রেসী রাজ্যের উচ্ছেদ অনেকে হয়তো চাহেন কিন্তু তাহার পরিবর্তে কোন নিখুঁত বৈদেশিক শাসনচক্র ভারতবাসী কামনা করে না।

ঠিক এইরূপ ভাবেই ইহার পরবর্তী কালে বঙ্গভঙ্গের পর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের প্রাণনাশের জন্য তাঁহাকে বরিশাল হইতে অনুসরণ করিয়া আমরা বোমা ও পিস্তল হস্তে তাঁহাকে নৈহাটী পার করিয়া দিই—সে অপূর্ব কাহিনীও সবিস্তারে বলিবার আছে। জর্জ কিংসফোর্ডকেও এমনই ভাবে কলিকাতা হইতে মজঃফরপুর অবধি আমরা অনুসরণ করিয়াছিলাম তাঁহাকে নির্দয়ভাবে ইহলোক হইতে অপসারণের মানসে। সে যুগের বিপ্লবচক্রের মূল কেন্দ্র "বগড়ির রাজা সুবোধ মল্লিক, আই. সি. এস. চারু দত্ত ও অরবিন্দ যে রাজপুরুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন তাহার আর রক্ষা ছিল না। ভাগ্য যাহাকে রক্ষা করিত প্রফুল্ল চাকী প্রভৃতি বিপ্লবীর হাত হইতে, হাউণ্ডের হাত হইতে, কেবল দৈব কৃপায় তিনি রক্ষা পাইতেন। কালিকার নিকট শ্বেত ছাগলই ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ বলি। দিল্লী দরবারে প্রবেশমুখে ভাইসরয়ের হস্তী হাওদায় বোমা পড়ে, বড়লাট হার্ডিঞ্জ্ ভীষণ ভাবে আহত হন। তাঁহার স্কন্ধের সে বৃহৎ ক্ষতে একটি বদ্ধমুষ্টির স্থান হইত, এতবড় আঘাতের পরও সুচিকিৎসার গুণে তাঁহার প্রাণ রক্ষা সম্ভব হইয়াছিল। বল বল দৈববল, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

তখন ভারতে বিশেষতঃ বাংলা দেশে অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি,

সুহৃদ সমিতি ও আমাদের দলের ন্যায় বহু দল নানাভাবে বিপ্লবের আয়োজনে রত ছিল কিন্তু তাহাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ-বারীন্দ্র পরিচালিত দলই ছিল কেন্দ্রীয় দল। পরবর্তী যুগে তাহার নাম যুগান্তর পার্টি দেওয়া হয় তাহাদের বিপ্লববাদী যুগান্তর পত্রিকার নামানুসারে। আসলে এই কেন্দ্রীয় সুনিয়ন্ত্রিত দল কোন বিশেষ নামে পরিচিত ছিল না। আমরা ধরা পড়িয়া আলিপুর বোমার মামলায় কালাপানিতে যাত্রার পরও রাসবিহারী, বাঘা যতীন সকলেই এই মূল বিপ্লবীচক্রের নামেই কাজ করিতেন, মুক্তি সংগ্রামী বাংলার অভিযান চালাইয়া যাইতেন। দেশ মাতৃকার দীক্ষিত সমর্পিত সন্তানদিগের সে ছিল অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড এক অভিযান। *

---

* মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ ডহরপুর গ্রামে একটি শহীদ স্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা লইয়াছেন ভারতের প্রথম বিপ্লবের বহ্নি-ভূমির স্মৃতিরক্ষার জন্য।

॥ পরিশিষ্ট—দুই ॥

ভারতের আদি টেলিগ্রাফ কেন্দ্র

ভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

[আনন্দবাজার পত্রিকা—২১শে ফেব্রুআরি, ১৯৭১]

কলকাতার প্রায় সত্তর মাইল দক্ষিণে, মেদিনীপুর জেলায় গঙ্গার মোহনার কাছে অবস্থিত খেজুরী ইংরেজ শাসনের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। খেজুরীর বয়স বেশী নয়,—পার্শ্ববর্তী হিজলীর সঙ্গে এই দ্বীপটি গঙ্গার পলিমাটি দিয়ে গঠিত হয়ে প্রায় পাঁচশো বৎসর আগে জলের উপর মাথা তুলেছিল। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দী ছিল নৌ-বাণিজ্য ও নৌ-যুদ্ধের প্রাধান্যের যুগ। একদিকে সাগর দ্বীপ এবং অন্য দিকে খেজুরী-হিজলী যে শক্তির অধীনে থাকবে তারা শুধু বাংলা নয়—দিল্লী থেকে, ডিব্রুগড় পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। তাই সমুদ্র থেকে গঙ্গায় প্রবেশ-দ্বারের এই দুটি দ্বীপের অবস্থান তাদিগকে অপরিসীম বাণিজ্যিক ও সামরিক গুরুত্ব দিয়েছিল। তাই ইউরোপ থেকে ভারতের সমুদ্রযাত্রার পথ খুলে যেতেই এই দুটি দ্বীপের অধিকার নিয়ে ক্ষমতায় আসীন মোগল এবং ক্ষমতাভিলাষী পর্তুগীজ ও ইংরেজের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইউরোপ থেকে আগত বড় বড় জাহাজগুলি বঙ্গোপসাগরের তীরে বালেশ্বর পর্যন্ত এসে স্লুপ নামক ছোট ছোট জাহাজে মালপত্র নামিয়ে দিত। তারা গঙ্গায় ঢুকে সপ্তগ্রাম বেতোর হুগলী প্রভৃতি নদীবন্দরে সেই সব মালপত্র বহন করে নিয়ে যেত। ক্যাপ্‌টেন স্টাফোর্ডের অধীনে ক্যানকন নামক সমুদ্রগামী জাহাজটি ১৬৭৯ সালে সর্বপ্রথমে গঙ্গায় প্রবেশ করে (উইলসনস আর্লি এনালস্)। এর ফলে টেমসের সঙ্গে গঙ্গার যোগ সম্পন্ন হোলো। মোহনার কাছে অবস্থিত হিজলী বালেশ্বরের স্থান অধিকার করল।

তারপর পলাশীর যুদ্ধের পর সমগ্র ভাগীরথীর উপরই ইংরাজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হোলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা নগর ও বন্দরের

বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোহনার কাছে সমুদ্রগামী জাহাজেব অবস্থান এবং তা থেকে মাল ও যাত্রী নামানোর উপযোগী একটি স্থানেব প্রয়োজন অনুভূত হোলো। এই কাজের জন্য সম্ভবতঃ ১৭৮০ খৃঃ অব্দে খেজুরীতে এক শহর বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হোলো।

খেজুবীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল ইউরোপ থেকে আগত সংবাদের বিতরণ কেন্দ্র হিসাবে। তখনও টেলিগ্রাফ লাইন হয়নি। ইউবোপের সমস্ত সংবাদ ও চিঠিপত্র জাহাজে খেজুরী আসত এবং তা খেজুরী থেকে কলকাতায় এবং পূর্ব-ভাবতের অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হোতো। কলকাতাব ইংরেজ অধিবাসীরা দেশের খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করত। এই সব সংবাদের মধ্যে থাকত ইউরোপ থেকে আগত মালের অর্ডারপত্র। তার ফলে প্রতিটি জাহাজেব আগমনেব সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা বাজাবে মালপত্রের দাম উঠানামা করত। এই সব সংবাদের শুধু ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক নয় রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল খুব বেশী। ইউরোপে হয়ত ইংরাজের সঙ্গে ফবাসীর যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। এই সংবাদ কলকাতায় পৌঁছতে ২।৩ মাস অতীত হযে যেত। বিশেষতঃ কলকাতায সংবাদপত্র স্থাপিত হওয়ায় এইসব সংবাদ আগে সংগ্রহ কবে ছাপাবাব জন্য তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এই সব চিঠিপত্র ও সংবাদ প্রেরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্যই খেজুরীর ইতিহাস বিখ্যাত পোস্টঅফিসটি স্থাপিত হয়েছিল। এই বৃহৎ পোস্টঅফিসটি সেকালেব এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িযেছিল। প্রথমে দ্রুতগামী ডিঙি নৌকায় এইসব চিঠিপত্র ও সংবাদ কলকাতায প্রেরিত হোতো। কিন্তু জোয়ার ভাঁটা এবং অন্যান্য বাধাবিপত্তির জন্য এইসব ডিঙির যাতায়াত ব্যাহত হোতো। নদীপথে বাঘ ও ডাকাতেব উপদ্রব ছিল। ১৮০৬ সালের ডাক বিভাগীয় এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় যে একখানা ডাক নৌকা সাগর দ্বীপের নিকট বাঁধা ছিল। একটি বাঘ তীর থেকে লাফ দিয়ে এসে একজন মাঝিকে ধবে নিয়ে যায়। ফলে নোকাখানি উল্টে যায় এবং সমস্ত চিঠিপত্র নষ্ট হয়। ডাক নৌকার উপব ডাকাতের আক্রমণও প্রাযই হোতো—এজন্য ডাক নৌকার সঙ্গে গার্ড বোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সে জন্য কোনও সমুদ্রগামী জাহাজ খেজুরীতে পৌঁছতেই তাব সংবাদ কলকাতায় পাঠানো এক বৃহৎ ব্যাপাব হয়ে দাঁড়াতো এবং এ জন্য পোস্টঅফিসে তীব্র কর্মব্যস্ততা পড়ে যেত।

এই সংবাদ নিরাপদে অথচ দ্রুতগতিতে কলকাতায় পাঠবার জন্য অধুনা বিলুপ্ত এক অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হোলো—তা হচ্ছে সেমাফোর বা সাংকেতিক অক্ষর দিয়ে সংবাদ পাঠানো। এই সংবাদ প্রেরণ ব্যবস্থা আজকার রেডিও ও টেলিগ্রাফের দিনে আশ্চর্য মনে হবে। এই ব্যবস্থায় একজন মানুষ একটি উঁচু মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে দু' হাতে দুটি নিশানের সাহায্যে নানা অঙ্গভঙ্গী করে দূরে আর একটি মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান আর একটি মানুষের কাছে সংবাদ পাঠাতো। সেও আবার ঠিক সেইভাবে সেই সংবাদ আর একটি মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান আর একটি মানুষের কাছে পোঁছে দিত। এইভাবে সংবাদ কলকাতায় গিয়ে পোঁছত। নিশান ও হাতের এক একটি ভঙ্গী ছিল ইংরাজীর এক একটি অক্ষর। যেমন বাঁ হাতের নিশানটি নীচের দিকে সোজাসুজি ঝুলিয়ে ডান হাতের নিশানটি নীচের দিকে কোণাকুনি ঝুলালে হোতো ইংরাজী A অক্ষর। ডান হাতের নিশানটি ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল করে রাখলে হ'ত ইংরাজী B অক্ষর। ডান হাতের নিশানটি ঘাড়ের উপর কোণাকুনি তুলে ধরলে হ'ত C অক্ষর এবং নিশানটি ঘাড়ের উপর সোজাসুজি তুলে ধরলে হ'ত D অক্ষর। এইরূপে ইংরাজী ছাব্বিশ অক্ষরের প্রত্যেকটিই পৃথক পৃথক নিশান সঞ্চালন এবং অঙ্গভঙ্গী করে প্রকাশ করা হোতো। টেলিগ্রাফেরই মত তবে টেলিগ্রাফে সংবাদ যায় টরে টক্কা ধ্বনির সাহায্যে আর সেমাফোরে যেত দৃশ্যমান সঙ্কেতের সাহায্যে। সংবাদ প্রেরণের মঞ্চগুলি হোতো প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু। এবং তারা প্রায় কুড়ি মাইল দূর দূর স্থাপিত হোতো। বলা বাহুল্য নিশানের সংকেতগুলি দেখবার জন্য টেলিস্কোপ ব্যবহৃত হোতো। এখনও কলকাতা থেকে খেজুরীর পথে বড়ুল ধজা ও হুগলী পয়েন্টের নিকট এই সব মঞ্চের ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে।

১৮৪৪ সালে টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা মর্স তাঁর ডট ও ড্যাসের বর্ণমালাযুক্ত টেলিগ্রাফে ওয়াশিংটন থেকে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী বাল্টিমোরে প্রথম তারবার্তা পাঠান। তার সাত বৎসরের মধ্যেই ১৮৫১ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ডাঃ ও'শাংনেশী কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার হয়ে খেজুরী পর্যন্ত ভারতের সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করবার অনুমতি পান। ১৮৫২ সালে খেজুরী কলকাতার সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবার হয়ে টেলিগ্রাফ লাইন সংযুক্ত হোলো। ফলে খেজুরী থেকে সেমাফোরে সংবাদ প্রেরণ বন্ধ হয়ে গেল।

এইরূপে কলকাতা, ডায়মণ্ডহারবার ও খেজুরী—এই তিনটি স্থানে ভারতের আদি টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপিত হয়েছিল।

ইউরোপ থেকে আগত বড় বড় জাহাজের মাল উঠানো নামানো এবং সংবাদ প্রেরণের কেন্দ্ররূপে খেজুরীর সমৃদ্ধি বেড়ে চলল। খেজুরীর পাশে কাউখালিতে একটি লাইট হাউস নির্মিত হোলো। বহু জাহাজ খেজুরী বন্দরে কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত নোঙ্গর করে থাকতে বাধ্য হোতো। সে জন্য এখানে ইউরোপীয় নাবিকদের জন্য টেভার্স, কফিখানা, হোটেল ইত্যাদি এবং তারই আনুষঙ্গিক হাটবাজার, নাচঘর এবং গণিকালয় গড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজী এজেন্টদের কুটি, যাত্রীদের বিশ্রামাবাস, গীর্জা ইত্যাদির জন্য বড বড় বাড়ীঘর নির্মিত হোলো। খেজুরী একটি কর্মব্যস্ত এবং জনকোলাহলপূর্ণ শহরে পরিণত হোলো।

খেজুরীর এই সমৃদ্ধি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি—এর প্রথম কারণ গঙ্গার নাব্য খালের পশ্চিম তীর থেকে পূর্বতীরে অপসারণ এবং দ্বিতীয় কারণ ড্রেজিং-এর ফলে গঙ্গার নাব্যতার উন্নতির জন্য সমুদ্রগামী জাহাজের কলিকাতা পর্যন্ত বরাবর পৌঁছবার ব্যবস্থা। এর ফলে এখানে যাত্রী ও মালের জাহাজ পরিবর্তনের প্রয়োজন দূর হয়ে গেল। কিন্তু শহরটির ধ্বংসের প্রধান কারণ বাংলার এই সমুদ্রোপকূলে ঝড় ও বন্যায় প্রকোপ এবং নদীর ভাঙ্গন। সরকারী তথ্য অনুসারে উনবিংশ শতাব্দীতেই এই শহরটি তের বার বিধ্বংসী ঝড় ও বন্যার কবলিত হয়েছিল। ১৮২৩ সালের এক ঝড়ে খেজুরীর বহু ক্ষতি হয় এবং লিভারপুল, হেলেন, কটক প্রভৃতি কয়েকখানি জাহাজ ডুবে যাওয়ায় বহু প্রাণহানি হয়। ১৮৩৩ সালের ঝড়ে জলোচ্ছাস হয়ে বহু বাড়ী-ঘর ও মানুষ ভেসে যায়। ১৮৬৪ সালেও এক ঝড় ও জলোচ্ছাস হয়। এই ঝড়ে খেজুরীর ইউরোপীয় পোস্টমাষ্টার মিঃ বর্টেলহো প্রাণ হারান। তারপর ১৯৬৬ সালের ঝড় ও প্লাবনে খেজুরীর ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়। খেজুরীর ডাক বাংলায় এই প্লাবনে বন্যার জলের উচ্চতা সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি আছে। তাতে দেখা যায়, এই জলোচ্ছাসে ডাকবাংলো গৃহে বন্যার জলের উচ্চতা ১২ ফুট পর্যন্ত হয়েছিল। তা জলপাইগুড়ির সাম্প্রতিক বন্যার জলের উচ্চতা থেকে চার ফুট বেশী।

এখন খেজুরীর সাবেক গৃহগুলির মধ্যে আছে ডাকবাংলো, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসের ধ্বংসাবশেষ, আর আছে গোরস্থানটি। পোস্টঅফিসের

অদূরে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ঘেরা একটি সেমাফোর মঞ্চের ধ্বংসাবশেষও আছে। গোরস্থানটি ডাকবাংলোর সম্মুখেই অবস্থিত। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হলেও সুরক্ষিত নয়, অধিকাংশ কবরের মার্বল ফলকই অপহৃত হয়েছে। এর প্রথম কবরটি ছিল ১৮০০ সালে মৃত একজন নাবিকের। ১৮২২ সালে দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ম্যাক্‌সওয়েলের পত্নী এমেনিয়া বায়ু পরিবর্তনের জন্য এখানে এসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর কবরের স্মৃতিস্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য।

খেজুরীর পূর্বপ্রান্তে গঙ্গায় এক বিরাট চর পড়েছে। ভাঁটার সময় তীরের সংলগ্ন কয়েক মাইল চওড়া চর মাথা তোলে। এই চরের মধ্যেই খেজুরীর হাট বাজার, ঘড়বাড়ী, টৈভার্স, কফিখানা চাপা পড়েছে। ভাঙ্গন ঠেকাবার জন্য নদীর ধারে সরকার থেকে ঝাউগাছ সার করে লাগানো হয়েছিল। তাতেও ভাঙ্গন রোধ হয়নি। নদীর অপর পাড়ে প্রায় আঠার মাইল দূরে সাগরদ্বীপের একটি নীল রেখা দেখা যায়, আর দক্ষিণে অপার সমুদ্র ধূঁ-ধূঁ করেছে।

———○———